অনশ্বর বঙ্গবন্ধু

তথ্য অধিদফতর

অনশ্বর বঙ্গবন্ধু

তথ্য অধিদফতর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

বঙ্গবন্ধুর ছবি : শিল্পী অধ্যাপক শাহজাহান আহমেদ বিকাশ

অনশ্বর বঙ্গবন্ধু

অনশ্বর বঙ্গবন্ধু

মুজিববর্ষ উপলক্ষে তথ্য অধিদফতরের বিশেষ প্রকাশনা

তথ্য অধিদফতর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

অনশ্বর বঙ্গবন্ধু

প্রধান সম্পাদক
সুরথ কুমার সরকার, প্রধান তথ্য অফিসার

সহযোগী সম্পাদক :
মো. শাহেনুর মিয়া, অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার
ইয়াকুব আলী, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার

সম্পাদনা সহকারী
মো. শাহীন শিকদার
সেলিনা আক্তার
লাভলী বিশ্বাস

প্রকাশকাল
১৪ জুন ২০২১ খ্রি.

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রচ্ছদের ছবি
শিল্পী অধ্যাপক শাহ্জাহান আহমেদ বিকাশ

মুদ্রণ
মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

Anashwar Bangabandhu
Published by Press Information Department
Ministry of Information and Broadcasting
Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000
Ph : 9549190, 9546091
e-mail : piddhaka@gmail.com

Price : Tk. 400.00/-

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সূচিপত্র

প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
ঐ মহামানব আসে রফিকুল ইসলাম	১১
বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন ও অনশ্বর বঙ্গবন্ধু ড. অনুপম সেন	১৭
মহামানবের জন্মজয়ন্তীতে সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ আবেদ খান	২৪
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে আমির হোসেন আমু, এমপি	৩২
বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী : বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু অবিনাসূত্রে গাঁথা ড. অনুপম সেন	৩৭
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামের পরম্পরা ড. আতিউর রহমান	৪৪
একটি মানুষ যখন একটি দেশ মুহম্মদ জাফর ইকবাল	৪৯
বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ : লক্ষ শিশুর প্রেরণার দিন সেলিনা হোসেন	৫৪
উচ্চ যেথা শির আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক	৫৮
৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ : তাত্ত্বিকতা, বাস্তবতা ও প্রাসঙ্গিকতা অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী	৬৫
আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধুর মানবসেবার সিদ্ধান্ত ও ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের পথচলা লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির	৭১
বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশ ইমদাদুল হক মিলন	৭৬
জন্ম যদি তব বঙ্গে জাফর ওয়াজেদ	৮১
ছয় দফা থেকে স্বাধীনতা সেলিনা হোসেন	৮৭
ছয় দফা : স্বাধিকার ও স্বাধীনতার সেতুবন্ধ মনজুরুল আহসান বুলবুল	৯২
ছয় দফার সঙ্গে তৈরি ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের ছকও অজয় দাশগুপ্ত	১০৩
৭ জুন ১৯৬৬; ৭ জুন ২০২০ সুভাষ সিংহ রায়	১০৮
আওয়ামী লীগের জন্ম অনিবার্য ছিল প্রফেসর আবদুল মান্নান	১১৪
আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা ও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ	১১৯

প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
১৫ই আগস্ট : নেপথ্য জানতে কমিশন চাই মনজুরুল আহসান বুলবুল	১২৮
জুলিও কুরি বঙ্গবন্ধু সুভাষ সিংহ রায়	১৩৫
'শান্তির পায়রা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নাসরীন জাহান লিপি	১৪১
বঙ্গবন্ধু ও জুলিও কুরি শান্তি পদক রিপন আহসান ঋতু	১৪৬
শেখ মুজিব কেন স্বাধীনতার ঘোষক ও জাতির পিতা মুহাম্মদ শামসুল হক	১৫০
মুজিববর্ষে বিজয় দিবসের স্বপ্ন মুহম্মদ জাফর ইকবাল	১৫৫
মহামানবের জন্মশতবার্ষিকী গৌরাঙ্গ নন্দী	১৫৯
বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও তাঁর জন্মশতবর্ষের ক্ষণগণনা মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান	১৬৩
শতবর্ষে আরও উজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু ড. হারুন রশীদ	১৬৬
বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন যদি না হতো সুভাষ সিংহ রায়	১৭০
মুজিব জন্মশতবর্ষ : জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশন মুহ. সাইফুল্লাহ	১৭৮
বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় শিক্ষার গুরুত্ব পাশা মোস্তফা কামাল	১৮৪
২৬ মার্চ : বাঙালির স্বাধীনতা, বাঙালির বন্ধনমুক্তির দিন ড. অনুপম সেন	১৮৯
হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে একজন মহান পুরুষ ঝর্না রহমান	১৯৫
কবিতা	
বঙ্গবন্ধুর একটি অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার নির্মলেন্দু গুণ	২০১
স্বাধীনতার জন্মকথা মহাদেব সাহা	২১০
অনন্ত মুজিব জন্ম মুহম্মদ নূরুল হুদা	২১১
কোটি মানুষের অনুভবে কামাল চৌধুরী	২১২
কবিদের কবি তুমি মিনার মনসুর	২১৩
আলোকচিত্রে মহামানবের মহাজীবন	২১৫

ভূমিকা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহিমান্বিত জীবন ও কর্মের ওপর সংগৃহীত নিবন্ধ ও কয়েকটি কবিতার সংকলন 'অনশ্বর বঙ্গবন্ধু'। এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলো ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ তারিখের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিবসে জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত সরকারি ক্রোড়পত্র থেকে সংকলন করা। মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রকাশের জন্য তথ্য অধিদফতর কর্তৃক সংগৃহীত ও পিআইডি ফিচার হিসেবে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত কিছু নিবন্ধও এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুকে নিবেদন করে লেখা কয়েকটি কবিতা, যেগুলো উল্লিখিত সময়কালে সরকারি ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো এবং বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের সংগৃহীত কিছু আলোকচিত্র এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুজিববর্ষের বিশেষ প্রকাশনা হিসেবে তথ্য অধিদফতর সংকলনটি প্রকাশ করল।

বাঙালির জাতীয় জীবনে বঙ্গবন্ধু চিরন্তন আলোকবর্তিকাবাহক। তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ এই জাতিকে পথ দেখাবে অনন্তকাল ধরে। সেই মহামানবের জীবন ও কীর্তিগাথার ওপর রচিত নিবন্ধগুলো পাঠকের নতুন চিন্তার খোরাক জোগাবে বলে আমাদের স্থির বিশ্বাস। মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ,এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান, এমপি, মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সাবেক সচিব জনাব খাজা মিয়া ও বর্তমান সচিব জনাব মো. মকবুল হোসেনের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা আমাদের পাথেয় হিসেবে ছিল। সংকলনটি প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ।

কোভিড-১৯-এর কারণে উদ্ভূত বিরূপ পরিস্থিতিতে সংকলনটি প্রকাশ করতে গিয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। সেগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ রইল।

সুরথ কুমার সরকার
প্রধান তথ্য অফিসার

ঐ মহামানব আসে

রফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় দিন ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ, যেদিন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় শেখ বংশে জন্ম নিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান নামে এক শিশু। সেদিন কে জানত যে এই শিশুই একদিন বড় হয়ে যুগ যুগ ধরে পরাধীন বাংলার মুক্তিদাতা বঙ্গবন্ধু রূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। প্রসঙ্গক্রমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৪১ সালে রচিত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, 'পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই।' প্রবন্ধটি তিনি শেষ করেছেন এই কবিতাটি দিয়ে :

'ঐ মহামানব আসে,
দিকে, দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
... ...
জয় জয় জয়রে মানব-অভ্যুদয়'

রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল যখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন জাতি ও ভাষা রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল ১৯৭১-এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে।

শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরে স্কুলজীবন এবং কলকাতায় কলেজজীবন শেষে ১৯৪৭ সালে আগস্ট মাসে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের অন্তর্গত পূর্ব বাংলা প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন, তখন ৪৮ সালে বাংলাভাষা

আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে এই সময় থেকেই তাঁর সুদীর্ঘ কারাজীবনের সূচনা। ৪৯ সালে পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার ও গ্রেফতার হন, যা চলেছিল ১৯৫২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের ভাষা আন্দোলনের সময় পর্যন্ত।

বস্তুতপক্ষে, ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত তিনি বারবার আন্দোলন, কারাবরণ, অনশনের মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রথম ৫ বছরের মধ্যে ৪ বছর অতিবাহিত করেন। এরই মধ্যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৪৯ সালে কারাগারে বন্দি অবস্থাতেই তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালে ২১ দফার ভিত্তিতে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু সে সরকার দুই মাসের বেশি টেকেনি। ১৯৫৪ সালে আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। যার নেপথ্য নায়ক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তখন তাঁকে দেখি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রূপে।

১৯৫৫ সালে তিনি পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ সরকার এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। তিনি আতাউর রহমান মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়েছিল। যার ফলে পূর্ব পাকিস্তান-পশ্চিম পাকিস্তান দুই ইউনিটে পরিণত এবং পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লোপ পায়। প্রতিবাদস্বরূপ শেখ মুজিবুর রহমান এই সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। প্রথমে জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এবং পরে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক হন। এই সময় থেকে এক দশকের ওপর পাকিস্তানে সামরিক শাসন চলতে থাকে। ১৯৫৮ সালে শেখ মুজিব গ্রেফতার হন। ইতিপূর্বে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ

করেন। পূর্ব বাংলার দুর্ভাগ্য যে ষাটের দশকের প্রথমার্ধে প্রথমে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও পরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুবরণ করেন। তখন পূর্ব বাংলায় সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অন্য কোনো রাজনীতিবিদ ছিলেন না। ১৯৬৪ সালে গভর্নর মোনায়েম খানের আমলে পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে প্রতিরক্ষা বিষয়ে পূর্ব বাংলা সম্পূর্ণ অরক্ষিত। এই প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। যার মাধ্যমে পাকিস্তানকে একটি কনফেডারেশনে পরিণত করার পরিকল্পনা ছিল। শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর থেকে বারবার গ্রেফতার করা হতে থাকে। তাঁকে ১৯৫৮ সালে গ্রেফতার করে ১৯৫৯ সালে মুক্তি দিয়ে আবার জেলগেট থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৯৬০-এর সেপ্টেম্বরে ২ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে পুনরায় ১৯৬২-এর ২ ফেব্রুয়ারিতে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৪ সালে তিনি আবার গ্রেফতার হন। তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করা হয়। ১৯৬৬ সালে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও জননিরাপত্তা আইনে তাঁকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালে তিনি যে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন তার সারমর্ম নিম্নরূপ :

সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার; প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র ছাড়া সকল ক্ষমতা প্রদেশের; পূর্ব ও পশ্চিমাংশের জন্য পৃথক মুদ্রা; প্রদেশের রাজস্ব ও কর আদায়ের ক্ষমতা; প্রদেশকে পৃথক বৈদেশিক বাণিজ্য চালানো ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের অধিকার এবং প্রদেশের আঞ্চলিক সেনাবাহিনী বা আধা সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা–এগুলো ছিল ছয় দফার মূল দাবি।

১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ মুজিবুর রহমানকে সভাপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সহসভাপতি ও তাজউদ্দীন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এই নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ছয় দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। শেখ মুজিব ছয় দফার পক্ষে জনসভা শুরু করেন। প্রথমে খুলনা থেকে ফেরার পথে যশোরে গ্রেফতার ও জামিন। ৭ মে নারায়ণগঞ্জ থেকে আসার সময় গ্রেফতার। তাঁকে দেশরক্ষা

আইনে ৩ মাসের আটকাদেশ দিয়ে ঢাকা জেলে বন্দি করা হয়। ৭ জুন ব্যাপক হরতালে মনু মিয়াসহ সমগ্র দেশে ১১ জন নিহত হয়। ১৯৬৭ সালে আপত্তিকর ভাষণের দায়ে শেখ মুজিবকে ১ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। ১৯৬৮ সালে নববর্ষের প্রথম দিনই 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জন সামরিক ও বেসামরিক নাগরিকের বিরুদ্ধে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। ২১ এপ্রিল বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে ঢাকা সেনানিবাসে বিচারকার্য শুরু হয়।

১৯৬৯-এর ১৮ জানুয়ারি থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মিছিল হয়। ২০ তারিখে আসাদের ও ২৪ তারিখে মতিউরের মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে। আন্দোলন 'গণঅভ্যুত্থানে' রূপান্তরিত হয়। ঢাকায় ২৫ জানুয়ারি থেকে কারফিউ জারি করা হয়। শেখ মুজিবের মুক্তি ও 'আগরতলা মামলা' প্রত্যাহারের দাবিতে সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৫ ফেব্রুয়ারি মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা সেনাবাহিনীর হাতে শহিদ হলে বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির বিস্ফোরণ ঘটে। ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে কারফিউ ও ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকল বন্দিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সামরিক প্রশাসন।

২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন। সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করে সামরিক শাসন জারি করেন এবং ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীক নিয়ে ৩০০ সাধারণ আসনের মধ্যে ১৬২ আসন লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদের ২৯৮ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮ আসন পায়।

১৯৭১-এর ১ মার্চ বেতার ভাষণের মাধ্যমে আসন্ন গণপরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। ২, ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল। বঙ্গবন্ধুর ডাকে এক অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩ মার্চ পল্টনে বঙ্গবন্ধুর সভায় 'আমার সোনার বাংলা'

জাতীয় সংগীত ঘোষিত হয়। রেসকোর্সের জনসমুদ্রে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে শত্রুর মোকাবিলায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার এবং 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঘোষণা দেন। ৭ই মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত একদিকে অসহযোগ আন্দোলন, অন্যদিকে পাকিস্তানের সামরিক অভিযান ও গণহত্যার প্রস্তুতি চলতে থাকে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার প্রহসন চালাতে থাকেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন।

২৫ মার্চ অপরাহ্নে ইয়াহিয়া খান পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযান ও গণহত্যার নির্দেশনা দিয়ে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁকে অনুসরণ করেন। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ২৫ মার্চ মধ্যরাতের আগেই সামরিক অভিযান ও গণহত্যা শুরু করে। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে (১২টা ২০ মি) বঙ্গবন্ধু ইপিআরের ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যায় এবং ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাত থেকে বাংলাদেশে সামরিক অভিযান গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে শুরু করে। বাঙালি রুখে দাঁড়ায়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর আম্রকাননে শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকে। ১ কোটির অধিক শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। অন্যদিকে পাকিস্তানি কারাগারে সামরিক আদালতে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বঙ্গবন্ধুর বিচারকার্য সমাপ্ত করে বঙ্গবন্ধুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সুপারিশ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে প্রেরিত হয়। ইয়াহিয়া খান সেই মৃত্যুদণ্ডাদেশে স্বাক্ষর করার আগেই বাংলাদেশে যুদ্ধরত ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ঢাকায় ১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্নে রেসকোর্স ময়দানে মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ইয়াহিয়ার পতন ঘটে। জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত এবং তিনি আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিন্ডি থেকে করাচি বিমানবন্দর হয়ে লন্ডনে গমন করেন। এরপর নয়াদিল্লি হয়ে ১০ জানুয়ারি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। দিল্লিতে তাঁকে অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বঙ্গবন্ধু ঢাকায় এসে ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্ব দেন এবং ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চের বক্তৃতায় তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের ঘোষণা দেন। ওই সভাতেই আসন্ন মুক্তিযুদ্ধের সব দিকনির্দেশনা দিয়ে যান। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দৈহিকভাবে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর দিকনির্দেশনাতেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে তিনি ১৯৭১ সালের ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে বজ্রকণ্ঠ অনুষ্ঠানে প্রতিদিন বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ ও নির্দেশনা বাঙালির চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছে। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং ৭১-এর যুদ্ধে ধ্বংসস্তূপে পরিণত বাংলাদেশের পুনর্বাসনের কাজটি সম্পন্ন করেন। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন। যুদ্ধাহত ও বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা প্রদান করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ে সমর্থ হন। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান এবং বাংলা ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর অবদান সুগভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। বাংলাদেশের জন্য বঙ্গবন্ধু সপরিবারে আত্মাহুতি দিয়ে গেছেন যে ঋণ এ দেশ ও জাতি কোনোদিন পরিশোধ করতে পারবে না। আমরা ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের বঙ্গবন্ধু পরিবারের শহিদ সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো আলজেরিয়ায় জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। পরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি'। নজরুলের ভাষায়–'শির নেহারি আমারই নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির'।

লেখক : জাতীয় অধ্যাপক

বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন ও অনশ্বর বঙ্গবন্ধু

অনুপম সেন

বাংলা ভাষাভাষী বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় দিনগুলো হলো ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর ও ২১ ফেব্রুয়ারি–এই তিনটি দিন বাঙালিকে চিরকাল চরম গৌরবে উদ্ভাসিত করবে। আর ১৫ই আগস্ট দিনটি স্মরণ করা হবে বাঙালি জাতির ইতিহাসের অনপনেয় কলঙ্কের দিন হিসেবে। এই দিনটিতে চরম দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, নিষ্ঠুর কিছু মানুষ, যারা পশুর চেয়েও অধম, তারা তাদের রাজনৈতিক পরাজয়ের গ্লানি ঢাকার জন্য কেবল জাতির পিতাকেই হত্যা করেনি, তাঁর শিশুসন্তান এবং নবপরিণীতা পুত্রবধূদের হত্যা করতে দ্বিধা করেনি, তাদের বিবেক কম্পিত হয়নি।

বিশ্ব জানে, বাঙালি জানে, উপরে উল্লিখিত মহৎ দিনগুলো সৃষ্টির মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুই বাঙালির জন্য সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর নিজের রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের সংবিধানে সর্বপ্রথম ঘোষণা করা হয় সে-ই রাষ্ট্রের মালিক; অর্থাৎ এই রাষ্ট্রে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এবং তাদের মুখের ভাষা বাংলাই এই রাষ্ট্রের ভাষা। বঙ্গবন্ধুই সৃষ্টি করলেন বাঙালির ইতিহাসের প্রথম জাতি রাষ্ট্র। বাঙালিকে তার প্রথম নিজস্ব সংবিধানও বঙ্গবন্ধুই অর্পণ করেন ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর। এই সংবিধানের মূল ভাষাও বাংলা। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বরের আগে বাঙালি দুটি প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনে ছিল–১৯০ বছর ইংরেজের অধীনে, ২৩ বছর পাঞ্জাবি ও উর্দুভাষী সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের অধীনে। এই দুই ঔপনিবেশিক শাসন পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশটিকে (বার্নিয়ার, টের্ভার্নিয়ার প্রমুখ পরিব্রাজকের বর্ণনা অনুযায়ী) পরিণত করেছিল পৃথিবীর দরিদ্রতম রাষ্ট্রগুলোর একটিতে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের ২৩ বছরের মধ্যে ১৩ বছরই কাটিয়েছিলেন কারান্তরালে বাঙালিকে পরাধীনতামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, অর্থনৈতিকভাবে ঋদ্ধ একটি অস্তিত্ব বা জীবন

প্রদান করতে, যে জীবন হবে ক্ষুধামুক্ত, স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঋদ্ধ। তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র পাতায় পাতায় এই ঐকান্তিক ইচ্ছা বা আকুলতা বারবার ফুটে উঠেছে। তিনি ১৯৫৩ সালেই লিখেছেন : 'এদিকে পূর্ব বাংলার সম্পদকে কেড়ে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে কত তাড়াতাড়ি গড়া যায় একদল পশ্চিমা তথাকথিত কেন্দ্রীয় নেতা ও বড় বড় সরকারি কর্মচারী গোপনে সে কাজ করে চলেছিল।... আওয়ামী লীগ যখন হিসাব-নিকাশ বের করে প্রমাণ করল যে, পূর্ব বাংলাকে কী করে শোষণ করা হচ্ছে তখন তারা মরিয়া হয়ে উঠল এবং আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ নেতাদের ওপর চরম অত্যাচার করতে আরম্ভ করল' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)। তিনি আরো লিখেছেন : "অন্যদিকে পূর্ব বাংলার বৈদেশিক মুদ্রা থেকে প্ল্যান প্রোগ্রাম করেই পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠতে সাহায্য করতে লাগল। ফলে একদল শিল্পপতি গড়ে তুলতে শুরু করল, যারা লাগামছাড়া অবস্থায় যত ইচ্ছা মুনাফা আদায় করতে লাগল জনসাধারণের কাছ থেকে এবং রাতারাতি কোটি কোটি টাকার মালিক বনে গেল। করাচি বসে ইমপোর্ট ও এক্সপোর্ট ব্যবসার নাম করে লাইসেন্স বিক্রি করে বিপুল অর্থ উপার্জন করে আস্তে আস্তে অনেকে শিল্পপতি হয়ে পড়ছেন। এটাও মুসলিম লীগ সরকারের কীর্তি...। বাঙালি তথাকথিত নেতারা কেন্দ্রীয় রাজধানী, মিলিটারি হেডকোয়ার্টারগুলি, সমস্ত বড় বড় সরকারি পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য পাঞ্জাবি ভাইদের হাতে দিয়েও গোলাম মোহাম্মদ ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে খুশি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। গণপরিষদে বাঙালিরা ছয়টা সিট পশ্চিম পাকিস্তানের 'ভাইদের' দিয়েও সংখ্যাগুরু ছিলেন। তাঁরা ইচ্ছা করলে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে পারতেন। তাঁরা তা না করে তাঁদের গদি রক্ষা করার জন্য এক এক করে সকল কিছু তাঁদের পায়ে সমর্পণ করেও গদি রাখতে পারলেন না।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধু 'পূর্ব পাকিস্তান ভাষা সংগ্রাম পরিষদের' আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে যে প্রথম হরতাল আহ্বান করেন তার জন্য তাঁকে হরতালরত অবস্থায় গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় প্রায় ৭০ জন সহকর্মীসহ। সে সময় তিনি কারাগারে ছিলেন পাঁচ দিন। ১৯৪৮ সালের প্রথমার্ধে এই পাঁচ দিনের কারাবাস দিয়ে তাঁর যে কারাজীবনের শুরু হয় 'বাঙালির অধিকার আদায়ের' জন্য, তা ১৯৫৩ সালের মধ্যেই তিন বছরব্যাপী দীর্ঘ হয়েছিল। এই তিন বছরে বারবার

তিনি কারাগারে গেছেন। এই তিন বছরের মধ্যে একটা সময় তিনি সশ্রম কারাদণ্ডও ভোগ করেছেন। যেহেতু তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে কখনোই কোনো আপস বা নমনীয়তা দেখাননি, তাই পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি ও সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র সবসময় তাঁকে পাকিস্তানের 'শোষকদের বিরুদ্ধে ত্রাস' হিসেবেই বিবেচনা করেছে, জেলের কুঠুরিতে রাখাই তাদের শ্রেণিস্বার্থের পক্ষে নিরাপদ মনে করেছে। যেহেতু জনগণের স্বার্থকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য করেছিলেন, সেহেতু তাঁকে কমিউনিস্ট আখ্যাও দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৩ সালে গণচীন সফরে গিয়ে তিনি সেখানে রাষ্ট্রকে মানুষের কল্যাণে নিবেদিত দেখে লিখেছিলেন : 'আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসাবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে, ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাসী হলেও তিনি জনগণের সব অধিকার আদায় জনগণকে নিয়েই করতে চেয়েছেন। তিনি যে সমাজতন্ত্র চেয়েছিলেন সেটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর মতো, বিশেষভাবে সুইডেনে ওলাফ পামের নেতৃত্বে প্রায় তিন দশক ধরে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, অনেকটা তারই আদলে। তিনি ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের গণপরিষদে সংবিধান উপস্থাপন করার সময় তাঁর অন্তরে সব গণমানুষের কল্যাণে সমাজতন্ত্রের যে রূপ অবয়ব পেয়েছিল, সেই সমাজতন্ত্রেরই বর্ণনা করেছেন এবং তাই সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান যখন সৃষ্টি হয়, সেই পাকিস্তানের ৫৬ শতাংশ জনগণ ছিল বাঙালি; পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বেলুচ ও পশতু মিলিয়ে বাকি ৪৪ শতাংশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বাঙালি হলেও পাকিস্তানের রাজধানী হয়েছিল প্রথমে করাচি, পরে রাওয়ালপিন্ডি ও সবশেষে ইসলামাবাদ। ফলে কেন্দ্রীয় শাসনের কেন্দ্র হলো পশ্চিম পাকিস্তান এবং শাসকরা হলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ হলো একটি প্রদেশ (পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের মতো) তার রাজধানী ঢাকা হলো একটি প্রদেশের রাজধানী; কেন্দ্রীয় রাজধানী নয়, যদিও এই সম্মান ঢাকারই প্রাপ্য ছিল। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রায় ৫০-৬০ শতাংশ ব্যয় হতো সামরিক খাতে এবং সামরিক খাতের এই

ব্যয়ের প্রায় ৯০ শতাংশই ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের জেনারেল, লে. জেনারেল, মেজর জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, কর্নেল, লে. কর্নেল, মেজর, ক্যাপ্টেন ইত্যাদি অফিসারদের ৯০ শতাংশই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি, অধিকাংশই পাঞ্জাবি। বাঙালি অফিসারের সংখ্যা ছিল নগণ্য। ১৯৭০ সালে ছিল মাত্র একজন ব্রিগেডিয়ার, একজন কর্নেল, আঙুলে গোনা কয়েকজন মেজর ও ক্যাপ্টেন। বেসামরিক অন্যান্য খাতের সব ব্যয়ও হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সেক্রেটারি, অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি প্রভৃতি পদের ৭৫-৮৫ শতাংশই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের দখলে। যে সামান্য কয়েকজন বাঙালি সেক্রেটারিকে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল তাঁদেরও কোনো ক্ষমতাই ছিল না। পাকিস্তানের ২৩ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনকালে পাকিস্তানের মুখ্য বৈদেশিক অর্থ উপার্জনকারী খাত ছিল (আজ বাংলাদেশে যেমন গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি বা তৈরি পোশাক শিল্প) পাট ও পাটজাত দ্রব্য। পাট ও পাটশিল্প থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রাই ব্যবহৃত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়নে, কৃষি উন্নয়নে এবং সেবা খাতের প্রবৃদ্ধিতে। এই একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের প্রতিটি খাত, কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত চরমভাবে অবহেলিত হয়েছে, শোষণের শিকার হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জিডিপি ছিল ১২৩৭.৪ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ১২০৯.১ কোটি টাকা। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের জিডিপি পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে সামান্য বেশি ছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক দুই দশকের শোষণের ফলে ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জিডিপির পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৭১.৩ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৩১৫৬.৩ কোটি টাকা। এ থেকেই বোঝা যায়, দুই দশকে পূর্ব পাকিস্তান কী নির্মম শোষণের শিকার হয়েছিল! বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে এই অমানবিক শোষণের বন্ধনজাল থেকে মুক্ত করতে ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দিয়েছিলেন। এই ছয় দফাই ছিল বাংলাদেশের শোষণমুক্তির দলিল, বাঙালির মুক্তির সনদ। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র বাংলাদেশ তাদের শোষণের জাল থেকে বেরিয়ে যাক, এটা কোনোমতেই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। তাই ১৯৭০ সালে গণপরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও গণপরিষদের বা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশনই ডাকা হলো না। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাংলাদেশজুড়ে অসহযোগ আন্দোলন

শুরু হল। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন, তিনি বাঙালির অধিকারের বিনিময়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চান না। বাঙালিকে অধিকার-সংগ্রামের জন্য ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলারও আহ্বান জানালেন। বিশ্বের ইতিহাসে স্বাধীনতার এই শ্রেষ্ঠ ভাষণের শেষ বাক্যে ঘোষণা করেছিলেন : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এই বাক্যটি মহাকাব্যিক দ্যোতনা বহন করে। কারণ এই অসাধারণ বাক্যে মূর্ত হয়েছে বাঙালির হাজার বছরের মুক্তির স্বপ্ন, জাতিগত আকাঙ্ক্ষা।

৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ প্রাণ ও দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের মূল্যে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করলাম। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এলেন সম্পূর্ণ এক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে। বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেই এই বিধ্বস্ত দেশকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে, এর অর্থনীতিকে প্রাণদান করে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হলেন। ১০ মাসের মধ্যেই জাতিকে উপহার দিলেন এক অসাধারণ সংবিধান। অবিলম্বে প্রণয়ন করলেন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। মাত্র এক বছরের মধ্যেই হাজার হাজার ধ্বংসপ্রাপ্ত কালভার্ট ও বৃহৎ সেতু পুনর্নির্মাণ করে যোগাযোগব্যবস্থাকে সচল করলেন। এক কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসিত করলেন। দেশের মধ্যে গৃহহারা বাস্তুচ্যুত প্রায় দুই কোটি মানুষের জন্য আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করলেন। নির্যাতিত মা-বোনদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হলো। তাঁর অনুরোধে মাত্র তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্রবাহিনী প্রত্যাহৃত হলো। মিত্রবাহিনীর এই ধরনের প্রত্যাহার বিশ্ব-ইতিহাসে প্রায় একটি বিরল ঘটনা। আজও জাপানের ওকিনোয়ায় আমেরিকান সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রয়েছে, রয়েছে জার্মানিতেও–যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে ১৯৪৫ সালে। বঙ্গবন্ধু মাত্র সাড়ে তিন বছর ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন তখন বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার কোনো রিজার্ভ ছিল না, কোনো বিমানবাহিনী ছিল না, রেল ও স্থল যোগাযোগ ছিল বিধ্বস্ত। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঘটেছিল আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ। যার ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয় ওপেক এবং এক ব্যারেল জ্বালানি তেলের মূল্য ওপেক এক ডলার থেকে প্রায় সতেরো-আঠারো ডলারে উন্নীত করে, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে সৃষ্টি করে অভূতপূর্ব স্ট্যাগফ্ল্যাশন stagflation বা মন্দা-মূল্য-উল্লম্ফন, অর্থাৎ একই সঙ্গে ঘটে ভয়ানক অর্থনৈতিক মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতি। বিশ্ব

অর্থনীতিতে এর আগে কখনো একই সঙ্গে এভাবে মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতি ঘটেনি। আমি সে সময় উত্তর আমেরিকার কানাডায় ম্যাক-মাস্টার বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচডি গবেষণা করছিলাম। সে সময় উত্তর আমেরিকাজুড়ে, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় দেখেছি, খ্রিসমাস ও নিউইয়ার বা নববর্ষের উৎসব ছিল আলোকহীন, নিষ্প্রভ, যা অন্যান্য বছর থাকত আলোয় আলোয় উজ্জ্বল ও বর্ণাঢ্য। এই স্ট্যাগফ্ল্যাশন (stagflation) ইউরোপেও, বস্তুতপক্ষে সারা বিশ্বেই সৃষ্টি করেছিল বিরাট অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মন্দা। বঙ্গবন্ধু অসাধারণ বিচক্ষণতার সঙ্গে বিশ্বজোড়া এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সচল রেখেছিলেন। প্রায় একই কালে বাংলাদেশের ২৩টি জেলায় ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। তাও তিনি সামাল দিয়েছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণতার মাধ্যমে। বাংলাদেশে তখন প্রকৃতপক্ষে পাটশিল্প ছাড়া কোনো শিল্পই ছিল না। বাংলাদেশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ভোগ্যশিল্পের বাজার, বস্তুতপক্ষে বন্দি বাজার (captive market)। বঙ্গবন্ধুই শুরু করেছিলেন বাংলাদেশের প্রকৃত শিল্পায়ন; বহু ধরনের শিল্প সৃষ্টির সূচনা। ফলে ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশের শিল্পায়ন যে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল, তা তাঁর মৃত্যুর আট বছর পরেও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও তিনি কৃষিকেই দিয়েছিলেন ব্যাপক প্রাধান্য। এই কারণে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশ কৃষিতে প্রায় স্বয়ম্ভরতা অর্জন করে।

বঙ্গবন্ধু কেবলমাত্র বাংলাদেশ সৃষ্টির মহানায়কই ছিলেন না, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৌল অবকাঠামো নির্মাণ ও তার অগ্রগতির পথ সৃষ্টিরও মহাশিল্পী ছিলেন। ১৯২০-এর দশকে লেনিন যখন সোভিয়েত ইউনিয়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় অনেকেই তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। লেনিনকেও এই সুযোগ নিয়েই প্রতিক্রিয়াশীলরা হত্যার উদ্দেশ্যে গুলিবিদ্ধ করেছিল। তাই তিনি জীবনের শেষ দিনগুলো প্রায়ই অর্ধমৃত অবস্থায় কাটিয়েছিলেন। আরও অনেক মহাপ্রাণ ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু, লেলিনের মতো এই ধরনের যুদ্ধাপরাধী দেশদ্রোহীদের প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন, যেমন আব্রাহাম লিংকন।

১৫ই আগস্ট পাকিস্তানপন্থী যুদ্ধাপরাধী দেশদ্রোহীরা কেবলমাত্র বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করেনি, তাঁর পরিবারের ১৭ জন সদস্য, যাঁদের মধ্যে নারী-শিশুরাও ছিলেন, তাঁদেরও নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। এমনই ঘৃণ্য কাপুরুষ ছিল এরা। ১৯৮১ সালের মে মাসে বঙ্গবন্ধুর যে দুজন কন্যা এই

ঘৃণ্য অপরাধীচক্রের হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে বৃত হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশ আবার নতুন পথের সন্ধান পায়। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর ২১ বছর পরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আবার বাংলাদেশের উন্নয়নের রথযাত্রার সারথি হয়। আজ বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ।

বিশ্বজুড়ে ২০০৮-০৯ সালে যে গ্রেট রিসেশন বা মহামন্দা শুরু হয়েছিল, সে সময়েই দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রের হাল ধরে দেশরত্ন শেখ হাসিনা আজ বাংলাদেশকে উন্নয়নের মহাবর্ত্মে নিয়ে গেছেন। সে সময়ে, ১৯০৮-৯-এ বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ৬০০ মার্কিন ডলারের সামান্য কিছু বেশি। এখন তা প্রায় ২০০০ ডলার। ২০০৬-০৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ছিল কৃষিতে পরনির্ভর। আজ বাংলাদেশ কৃষিতে কেবলমাত্র স্বনির্ভরই নয়, একটি কৃষি রপ্তানিকারক দেশেও রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ছিল মাত্র এক কোটি টন। আজ তা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টনে উন্নীত হয়েছে। ১৯৭১ সালে, আগেই উল্লিখিত, বাংলাদেশে কোনো শিল্প ছিল না বললেই চলে (পাটশিল্প ছাড়া)। বাংলাদেশের প্রয়োজন মেটানোর প্রায় সব শিল্পসামগ্রীই আজ বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে। অনেক শিল্পসামগ্রী (কেবলমাত্র গার্মেন্টস নয়) যেমন, ঔষধ, টিন, কাচ, সিরামিক, ছোট ছোট জাহাজ, প্লাস্টিক ইত্যাদি বহির্বিশ্বেও রপ্তানি হচ্ছে। সেবা খাতেও বাংলাদেশের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে আত্মনির্ভরশীলতা, যে জয়যাত্রা আজ আমরা দেখছি তার বীজটি বপন করেছিলেন বাঙালি জাতির সর্বকালের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর মহাপ্রয়াণের দিন বিশ্বের প্রত্যেক স্বাধীনতাপ্রেমী-মুক্তিকামী মানুষের জন্য একটি স্মরণীয় দিন। তিনি বাঙালিকে মুক্তির ঠিকানা দিয়েছেন, তাই তিনি বাঙালির জন্য অনশ্বর, অমর।

লেখক : শিক্ষাবিদ

মহামানবের জন্মজয়ন্তীতে : সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ

আবেদ খান

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় কীভাবে তাঁর জন্মদিন পালন করেছেন তার একটি বর্ণনা তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর 'কারাগারের রোজনামচা' স্মৃতিকথার একাংশে। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'আজ আমার ৪৭তম জন্মবার্ষিকী। দিনটি ছিল ১৯৬৭ সালের ১৭ মার্চ। এই দিনে ১৯২০ সালে পূর্ব বাংলার এক ছোট্ট পল্লিতে জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মবার্ষিকী আমি কোনোদিন নিজে পালন করি নাই। বেশি হলে আমার স্ত্রী এই দিনটাতে আমাকে ছোট্ট একটা উপহার দিয়ে থাকত। এই দিনটিতে আমি চেষ্টা করতাম বাড়িতে থাকতে। খবরের কাগজে দেখলাম ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ আমার জন্মবার্ষিকী পালন করছে। বোধ হয়, আমি জেলে বন্দি আছি বলেই। আমি একজন মানুষ, আর আমার আবার জন্মদিবস! দেখে হাসলাম।'

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আগে যখন সেই উত্তাল মার্চের সময়ে বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ব্যস্ত সময় চলছিল, সে সময় ৩২ নম্বর ছিল দেশি-বিদেশি সব সাংবাদিকসমেত সমস্ত মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রস্থল। বঙ্গবন্ধু নিঃশ্বাস ফেলার সময় পর্যন্ত পাচ্ছিলেন না। নেতাকর্মী, স্থানীয়-বিদেশি সাংবাদিক সব মিলিয়ে তাঁর অতিশয় ব্যস্ত সময় যাচ্ছে। এমনই এক ব্যস্ততার মধ্যে বিদেশি এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, এই পরিস্থিতিতে আপনি আপনার এবারের জন্মদিনটি কীভাবে পালন করতে যাচ্ছেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি আমার জন্মদিন পালন করি না। যে জাতি অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটায়, কথায় কথায় গুলি করে হত্যা করা হয়, সে জাতির নেতা হিসেবে আমি জন্মদিন পালন করতে পারি না।'

এই আমাদের পিতা। সামান্যতম ক্লান্তি নেই, চেহারার মধ্যে এতটুকু বিরক্তির ছাপ নেই। অত্যন্ত শান্তভাবে তিনি নানাজনের নানা প্রশ্নের উত্তর

দিয়ে যাচ্ছেন, নেতাকর্মীদের নানা ধরনের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন, আন্দোলনের ব্যাপারে জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁর পরিকল্পনার কথা।

আমরা আজ ইতিহাসের কোনো চরিত্রের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব না। আমরা এমন একটি মানুষের কথা বলব যিনি ইতিহাসকে অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আমরা এমনই একজন মানুষের কথাই এখানে তুলে আনব, যিনি একটি জাতির আত্মপরিচয়ের সন্ধান দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে সমস্ত অনাচার-নির্যাতন-শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে একটি জাতিসত্তার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। এ অঞ্চলের মানুষ যে ভাষায় কথা বলত তা তাদের মাতৃভাষা। এই মাতৃভাষাকে তিনি আত্মপরিচয়ের ভাষায় পরিণত করার অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি এই জাতিকে একটি ভৌগোলিক ঠিকানা দিয়েছেন। সার্বভৌমত্বের অধিকার নিশ্চিত করেছেন। পৃথিবীর মানুষকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে এটা এমন একটি জাতিরাষ্ট্র, যা কারও অনুগ্রহের ভেতর দিয়ে তৈরি হয়নি। নিজস্ব শক্তিতে, নিজস্ব ক্ষমতায়, অনেক রক্ত-ঘাম এবং ত্যাগের বিনিময়ে তার নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করেছে। সমগ্র পৃথিবীতে বাঙালির সংখ্যা প্রায় ৩৫ কোটির মতো। তারা বিভিন্ন দেশের নাগরিক হতে পারে। কিন্তু তার গৌরবের বিষয়টা হলো সে নির্দ্বিধায় দাবি করতে পারে যে তার ঠিকানা বাংলাদেশ। কারণ বাঙালির একটা নির্দিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা আছে, নিজের পরিচয় আছে, নিজের কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য রয়েছে, যা সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর কীর্তিতে। তিনি এমনই একটি দেশ উপহার দিয়েছেন পৃথিবীকে, যেই পৃথিবীর প্রতিটি বাঙালি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করতে পারে–আমার একটি দেশ আছে, যে দেশের নাম বাংলাদেশ।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে দীর্ঘ সময় এই মানুষটিকে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এই পাপ সংঘটিত হয়েছে সুদীর্ঘ কয়েক দশক ধরে। তখন এই মহামানবের নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করার সুযোগ ছিল না। তাঁর পরিবারের সদস্যদের ব্রাত্য হিসেবে চিত্রিত করা হতো।

কিছু মানুষ থাকেন, যাঁরা ইতিহাসে উদ্ধৃত হন; কেউ আছেন, যাঁরা ইতিহাসের অংশ হয়ে যান আর এমন সামান্য কয়েকজন আছেন, যাঁরা নিজেরাই ইতিহাসের স্রষ্টা হয়ে যান। বঙ্গবন্ধু এই শেষোক্ত পর্যায়েরই মানুষ। যাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে ইতিহাস, সৃষ্টি হয়েছে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের একটি বিশাল জাতির জন্মগাথা। এই একটি মানুষ যাঁর কর্মজীবনের প্রতিটি

স্তরে রচিত হয়েছে এক মহান মুক্তিসংগ্রামের অমর পঙক্তিমালা। বাঙালির হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে কখনও তার আত্মপরিচয়ের সন্ধান ছিল না, কখনও তার আত্মপরিচয়ের ইতিহাস ছিল না। এই মহান মানুষটি এই জাতির অপ্রাপ্তির যাতনার অবসান ঘটিয়েছেন। এখন বাঙালি জাতির একটা ঠিকানা আছে, একটা জাতীয় সংগীত আছে, একটা পতাকা আছে, একটা স্বাধীন-সার্বভৌম ভূখণ্ড আছে।

বঙ্গবন্ধু যে কতখানি সাহসী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন তার দুটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তেও সেই শৈশব থেকে রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন সময়ের আরও অনেক উদাহরণ আছে।

প্রথম ঘটনাটির সময়কাল ষাটের দশকের শেষার্ধ। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে ছয় দফা পেশ করেছেন এবং সারা দেশ চষে বেড়াচ্ছেন মুক্তির সনদের পতাকা নিয়ে। ক্ষমতায় তখন পাকিস্তানের স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান। তিনি তখন আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্য সব রকম দমননীতির কৌশল প্রয়োগ করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধুকে বারবার মামলা দিয়ে, বন্দি করে নাস্তানাবুদ করা হচ্ছে, কারাগারে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে মাঝারি সমর্থক পর্যন্ত সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের হয়রানি। অবশেষে সর্বশেষ অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করা হলো রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা। সামরিক আইনে গ্রেফতার করা হলো বঙ্গবন্ধুকে, গ্রেফতার করা হলো সামরিক বাহিনীতে কর্মরত বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাকে, কয়েকজন উচ্চপদস্থ আমলা, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বেশ কয়েকজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকেও। সামরিক আদালতে শুরু হলো কুখ্যাত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। বিচারক্ষেত্র ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। প্রতিটি অভিযুক্তকে অমানুষিক এবং লোমহর্ষক নির্যাতন করা হয়েছে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য। উদ্দেশ্য–শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী চিহ্নিত করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া যে পাকিস্তান ভাঙার চেষ্টা যে-ই করবে তাকেই ঝুলতে হবে ফাঁসির দড়িতে। আইয়ুব খানের সামরিক জান্তার নিশ্চিত ধারণা ছিল শেখ মুজিবের ছয় দফার অর্থ বাংলাদেশের স্বাধীনতা। অতএব, যেভাবেই হোক বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিতে হবে।

সামরিক আদালতে বিচার শুরু হলো। সাক্ষী আর আসামিদের আনা হলো সামরিক এজলাসে। মুহূর্তেই ঘটে গেল নাটকীয় ঘটনা। যেসব আসামিকে রাজসাক্ষী বানানো হয়েছিল তারা একে একে আদালতে বলতে শুরু করলেন

তাঁদের ওপর কী ধরনের অমানুষিক নির্যাতন হয়েছে রাজসাক্ষী হওয়ার জন্য। হতচকিত সামরিক আদালত একের পর এক রাজসাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করতে শুরু করল। মামলার এক নম্বর আসামি শেখ মুজিবকে কাঠগড়ায় একটা কাঠের চেয়ার দেওয়া হয়েছিল বসার জন্য। অনতিদূরে প্রেসবক্স। সেখানে 'দৈনিক আজাদ'-এর রিপোর্টার হিসেবে উপস্থিত সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, কোনোভাবেই আসামিদের সঙ্গে সাংবাদিকরা কথা বলতে পারবেন না। তেমনটি ঘটলে কঠোর শাস্তি। শেখ মুজিব সামরিক আদালতের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে হাস্যপরিহাসরত মুঠোবন্দি তাঁর বিখ্যাত পাইপ। এমন সময় তাঁর চোখ পড়ল তাঁরই অত্যন্ত প্রিয়ভাজন সাংবাদিক ফয়েজ আহমদের দিকে। তিনি উচ্চস্বরে ডাকলেন, 'ফয়েজ, এই ফয়েজ।' ফয়েজ আহমদ সামরিক নির্দেশনামা মেনে ঘাড় নিচু করে আসনে বসে রইলেন। সামরিক আদালতের বাঘা বাঘা কর্মকর্তার কুঞ্চিত ভ্রু। দুই-তিনবার ফয়েজ আহমদকে ডাকলেন তিনি। হঠাৎ যেন গোটা সামরিক এজলাস এক বজ্রকণ্ঠে প্রকম্পিত হলো। সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল মেঘমন্দ্র গর্জনে।

'কি রে ফয়েজ, কথা ক'স না ক্যান? শোন, আমার বাংলাদেশে থাকতে হলে শেখ মুজিবের কথা শুনতে হবে'। থতমত খেয়ে বিপর্যস্ত এজলাস। বিহ্বল দৃষ্টিতে বসেন বিচারকরা। সেদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেল মামলার কার্যক্রম। এই হলেন আমাদের সাহসী নেতা।

আরেকটি ঘটনা স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের। সেই ঘটনার কথা লিখেছেন আরেকজন। তিনিও বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য প্রয়াত খ্যাতিমান সাংবাদিক এম আর আখতার মুকুল তাঁর 'মুজিবের রক্ত লাল' গ্রন্থে।

১৯৭৩ সালের ৫ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আলজিয়ার্সের চতুর্থ জোটনিরেপেক্ষ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে, ফিদেল কাস্ত্রো, নরোদম সিহানুক, বাদশাহ ফয়সল, হুয়ারি বুমেদিন, আনোয়ার সাদত, আলেন্দেসমেত অনেক বিশ্বনেতা। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের চেষ্টায় সম্ভব হলো একটি অতিশয় দুরূহ সাক্ষাৎকার। সৌদির বাদশাহ ফয়সল এবং বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকারটি ছিল খুবই স্বল্পকালীন। সৌদি আরব বাংলাদেশকে তখনো স্বীকৃতি দেয়নি বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সর্বাংশে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশবিরোধীদের বিভিন্ন তৎপরতায় সব রকমের সাহায্য-সহযোগিতা করে চলেছে। ঠিক এই

পরিস্থিতিতে যে কথাবার্তা হয়েছিল দোভাষীর মাধ্যমে দুজনের মধ্যে, সেটা হুবহু তুলে ধরছি মুকুল ভাইয়ের বর্ণিত গ্রন্থটিতে–

'... বাদশাহ : এক্সেলেন্সি, আমি শুনেছি যে আসলে বাংলাদেশ আমাদের কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশী। কিন্তু কথা হচ্ছে আপনারা কোন ধরনের সাহায্য চান? দয়া করে বলুন আপনারা কী চান? অবশ্য এসব সাহায্য দেয়ার জন্যে আমাদের কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে।

মুজিব : এক্সেলেন্সি, বেয়াদবি নেবেন না। আমি হচ্ছি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু আমার তো মনে হয় না, মিসকিনের মতো বাংলাদেশ আপনাদের কাছে কোনো সাহায্য চেয়েছে?

বাদশাহ : তাহলে আপনারা কিংডম অফ সৌদি এরাবিয়ার কাছ থেকে কী চাচ্ছেন?

মুজিব : বাংলাদেশের পরহেজগার মুসলমানরা পবিত্র কাবা শরীফে নামাজ আদায়ের অধিকার চাচ্ছে। এক্সেলেন্সি, আপনিই বলুন সেখানে তো কোনোও শর্ত থাকতে পারে না। আপনি সুমহান এবং প্রতিটি বাঙালি মুসলমান আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আপনি হচ্ছেন পবিত্র কাবা শরীফের হেফাজতকারী। এখানে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের নামাজ আদায়ের হক রয়েছে। সেখানে আবার শর্ত কেন? এক্সেলেন্সি, আপনাদের কাছ থেকে ভ্রাতৃ সুলভ সম্মান ও ব্যবহার প্রত্যাশা করছি।

বাদশাহ : এসব তো আর রাজনৈতিক কথাবার্তা হলো না। এক্সেলেন্সি, বলুন আপনারা কিংডম অফ সৌদি এরাবিয়ার কাছ থেকে কী চাচ্ছেন?

মুজিব : এক্সেলেন্সি, আপনি জানেন এই দুনিয়ায় ইন্দোনেশিয়ার পর বাংলাদেশ হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ। তাই আমি জানতে চাচ্ছি, কেন সৌদি আরব আজও পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না?

বাদশাহ : আমি পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা ছাড়া আর কারও কাছে জবাবদিহি করি না। তবুও আপনি একজন মুসলমান, তাই বলছি সৌদি স্বীকৃতি পেতে হলে বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' করতে হবে।

মুজিব : এই শর্তটা কিন্তু অন্তত বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান দেশ হলেও এই দেশে প্রায় এক কোটির মতো অমুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে। সবাই একই সঙ্গে

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে হয় শরিক হয়েছে, না হয় দুর্ভোগ পোহায়েছে। তাছাড়া, এক্সেলেন্সি, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা তো শুধুমাত্র রাব্বুল মুসলেমিন নন, তিনি হচ্ছেন রাব্বুল আলামিনও। তিনি তো শুধুমাত্র মুসলমানদের আল্লাহ নন, তিনি হচ্ছেন সবকিছুর একমাত্র অধিকর্তা। এক্সেলেন্সি, বেয়াদবি মাপ করবেন। আপনাদের দেশটার নামও তো 'ইসলামিক রিপাবলিক অফ সৌদি এরাবিয়া' নয়। এই মহান দেশের নাম আরব জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও রাজনীতিবিদ মরহুম বাদশাহ ইবনে সউদ-এর সম্মানে 'কিংডম অব সৌদি এরাবিয়া', কই আমরা তো এই নামে কোনো আপত্তি করিনি?

বাদশাহ : এছাড়া আমার অন্য একটা শর্ত রয়েছে এবং তা হচ্ছে অবিলম্বে সমস্ত পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীকে ছেড়ে দিতে হবে।

মুজিব : এটা তো বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার। দুটো দেশের মধ্যে এ ধরনের আরও অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়েছে; যেমন ধরুন বাংলাদেশ থেকে কয়েক লাখ পাকিস্তানি নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে নেয়া, বাংলাদেশের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করা–এই ধরনের বেশ কিছু অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে। এসবের মীমাংসা কিছুটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই শুধুমাত্র একানব্বই হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীকে ছেড়ে দেয়ার প্রশ্নটি পৃথকভাবে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে না। আর এজন্য সৌদি আরবই বা এতো উদগ্রীব কেন?

বাদশাহ : এক্সেলেন্সি, শুধু এইটুকুই জেনে রাখুন, সৌদি আরব আর পাকিস্তান একই কথা। পাকিস্তান সবচেয়ে অকৃত্রিম বন্ধু। তাহলে এক্সেলেন্সি, আর তো কথা থাকতে পারে না। তবে আমাদের দুটো শর্তের বিষয় চিন্তা করে দেখবেন। একটা হচ্ছে ইসলাম প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা, আর একটা বিনা শর্তে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি। আশা করি বাংলাদেশের জন্যে সাহায্যের কমতি হবে না।

মুজিব : প্রায় দু'বছর পর্যন্ত সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়ায় সেখানকার পরহেজগার মুসলমানরা যে পবিত্র হজ্ব আদায় করতে পারছেন না, সেই কথা ভেবে দেখেছেন কি এক্সেলেন্সি? এভাবে বাধার সৃষ্টি করা কি জায়েজ হচ্ছে? পবিত্র কাবা শরীফে তো দুনিয়ার সমস্ত দেশের মুসলমানদের নামাজ আদায়ের হক রয়েছে। তাহলে কেন এই বাধার সৃষ্টি? কেন আজ

হাজার হাজার বাঙালি পরহেজগার মুসলমানকে ভারতের পাসপোর্টে হজ্ব আদায় করতে হচ্ছে? আকস্মিকভাবে এখানেই আলোচনার পরিসমাপ্তি। ...

এম আর আখতার মুকুল এরপরে লিখেছেন, বঙ্গবন্ধু বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে তাঁর তৎকালীন নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর উচ্চারিত একটা আরবি কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, লা-কুম-দ্বিন-কুম-ওয়ালি ইয়া দ্বীন (তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার)।

এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে সে সময় নীতির প্রশ্নে, দেশের প্রশ্নে, যুদ্ধবন্দিদের কিংবা যুদ্ধাপরাধীদের প্রশ্নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কতটুকু অনমনীয় এবং আপসহীন ছিলেন। এই সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পরপরই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুও তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে পরমতসহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় ও মুক্তির আলোকবর্তিকা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই সাধারণ মানুষের কাছে। রাজনৈতিক শিষ্টাচার প্রতিষ্ঠায় তিনি বিরোধীপক্ষের মতপ্রকাশের অধিকারকেও সবসময় সর্বোচ্চ স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি তাঁর শত্রুকেও শ্রদ্ধা করতেন এবং তার মতপ্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। ধর্ম-গোত্র-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র এবং আদর্শ। সারা জীবন তিনি মানুষকে ভালোবেসে তাঁর সমগ্র জীবন উজাড় করে দিয়েছেন। কী পরিমাণ ভালোবাসতেন মানুষকে বোঝা যায় তাঁর এই কথায়, 'আমার সবচেয়ে বড় শক্তি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি, সবচেয়ে বড় দুর্বলতা আমি তাদেরকে খুব বেশি ভালোবাসি।'

আজ মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, 'রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়ে শোধ করব!' প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, 'দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।'। জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়েই মানুষের ভালোবাসার ঋণ তিনি শোধ করেছিলেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দেশি-বিদেশি চক্রান্তের রোষে তাঁকে জীবন দিতে হয়। পরবর্তীতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সরকারগুলোর ভূমিকা, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার

ব্যাপারে স্বাধীনতাবিরোধী দলগুলোর কার্যক্রম থেকে আজ আমরা অনায়াসে বুঝে নিতে পারি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী নষ্ট রাজনীতির প্রবর্তন, লালন, পরিচর্যার পেছনে কারা অদ্যাবধি সক্রিয়। আমরা এখনও দেখি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ মানুষের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্রের মধ্যেও এ দেশের মানুষ চালিয়ে যাচ্ছে স্বপ্নের অভিযাত্রা।

আমরা আজ সেই সময় পেরিয়ে এসেছি। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের এই নিগড় থেকে মুক্ত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর মতোই একইভাবে তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিনাশী অপশক্তির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা।

আজ এই মহামানবের ১০১তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

লেখক : সম্পাদক ও প্রকাশক, দৈনিক জাগরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে

আমির হোসেন আমু, এমপি

আজ ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৭২ সালের এই দিনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি পাকিস্তানের কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্তি লাভ করে স্বপ্নের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি বিজয় অর্জন করে। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসার মাধ্যমে সে বিজয় পূর্ণতা লাভ করে। এদিন স্বাধীন বাংলার নতুন সূর্যালোকের মতো চির ভাস্বর-উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মহান নেতা ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে আসেন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে। বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশ তো কল্পনাতীত; সেটা হতো স্বাধীনতার অপূর্ণতা। ওই সময় যখন বিভিন্ন দেশের কংগ্রেস সদস্য, সিনেটর, সংসদ সদস্য, আন্তর্জাতিক রেড ক্রিসেন্টের কর্মকর্তারা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করতেন, তাঁরা শরণার্থীদের জিজ্ঞেস করতেন দেশ স্বাধীন হলে তাঁরা ফিরে যাবেন কি না। তাঁরা বলতেন, বঙ্গবন্ধু ফিরলে দেশে ফিরে যাব।

১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো, কিন্তু মানুষের মুখে ছিল না কোনো হাসি, বিজয়ের তৃপ্তির ছাপ। শুধু জিজ্ঞাসা—বঙ্গবন্ধুর খবর কী? বেঁচে আছেন কি না? আসবেন তো ইত্যাদি।

এমনি এক সময় ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় খবর ভেসে এলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্তি পেয়ে একটি বিশেষ বিমানে অজানার পথে। পরের দিন ৯ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু লন্ডনে হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছান। ওই দিন এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'বাংলার মুক্তিসংগ্রামে স্বাধীনতার

অপরিসীম ও অনাবিল আনন্দ অনুভব করছি। আমার জনগণ যখন আমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করেছে তখন আমি রাষ্ট্রদ্রোহের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে নির্জন ও পরিত্যক্ত সেলে বন্দি জীবন কাটাচ্ছি। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে আমি ধন্যবাদ জানাই। স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তব সত্য। এ দেশকে বিশ্বের স্বীকৃতি দিতে হবে। বাংলাদেশ অবিলম্বে জাতিসংঘের সদস্যপদের জন্য অনুরোধ জানাবে।'

পরিশেষে তিনি বলেন, 'আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে রাজি নই। আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই।' বিবৃতির শেষে সাংবাদিকরা বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেন, আপনি আপনার বাংলাদেশে ফিরে যাবেন, সেই দেশ তো এখন ধ্বংস্তূপ।

তখন জাতির পিতা বলেছিলেন, 'আমার বাংলার মানুষ যদি থাকে, বাংলার মাটি যদি থাকে একদিন এই ধ্বংসস্তূপ থেকেই আমি আমার বাংলাদেশকে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শস্য-শ্যামলা সোনার বাংলায় পরিণত করব।'

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয়, ২৫ মার্চ রাতের শেষ প্রহরের দিকে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার পর ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, 'Sheikh Mujib is a traitor. This time he will not go unpunished.' সেই প্রেক্ষিতেই ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর বিচার করে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৬ ডিসেম্বর পাকস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আমরা বিজয়ী হওয়ায় ইয়াহিয়ার কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হওয়ায় ওই রায় আর কার্যকর হয়নি।

জানা গেল, বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে ফিরছেন। ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনীর কমেট জেটটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করলে ওখানে উপস্থিত হাজার হাজার জনসাধারণ এক অভূতপূর্ব রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা প্রদান করেন বঙ্গবন্ধুকে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কমেট জেটটি অবতরণ করলে তাঁর সম্মানে ২১ বার তোপধ্বনি করা হয়। অভ্যর্থনা জানান ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তারপর বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ। পালাম বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা এবং বঙ্গবন্ধু মিসেস গান্ধীর

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর মিসেস গান্ধীর সাথে মতবিনিময় শেষ করে (যে মতবিনিময়ে মিসেস গান্ধীর কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের নিশ্চয়তা নিয়েছিলেন) রওনা হলেন তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলার উদ্দেশে।

অবসান হলো লাখো মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষার। বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী কমেট জেট বিমানটি ঢাকার আকাশসীমায় দেখার সাথে সাথে দীর্ঘপ্রতীক্ষিত লাখো জনতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। লাখো মানুষের কণ্ঠে জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে স্বাধীন বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস।

বিমানের সিঁড়ি দেওয়ার সাথে সাথে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ মন্ত্রিপরিষদ ও নেতৃবৃন্দ তাঁকে মাল্য ভূষিত করেন। সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু কান্নায় ভেঙে পড়েন। সে এক অভূতপূর্ব, অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। বঙ্গবন্ধু বিমান থেকে নেমে আসার সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনি করে রাষ্ট্রপ্রধানকে বরণ করা হয়। বাংলাদেশ সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অব অনার দেয়। গার্ড অব অনার নেওয়ার পর বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দরে উপস্থিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিদেশি মিশনের সদস্য, মিত্র বাহিনীর পদস্থ সামরিক অফিসার, বাংলাদেশ সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে করমর্দন শেষ করে যাত্রা শুরু করেন রেসকোর্সের উদ্দেশে (আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)।

নেতার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত দীর্ঘ ৪ মাইল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ও বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে এবং সুসজ্জিত তোরণ নির্মাণ করে লাখো জনতা জাতির পিতাকে অভিবাদন জানায়। সুসজ্জিত তোরণ এবং সেই সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষের গগনবিদারী 'জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে স্বাধীন দেশের আকাশ-বাতাস হয় প্রকম্পিত। এই পথ অতিক্রম করতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় লেগেছিল। স্বচক্ষে অবলোকন না করলে জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসার গভীরতা অনুধাবন করা অসম্ভব। এই দৃশ্য অভূতপূর্ব ছিল। আবেগপ্রসূত এই দৃশ্য অবিস্মরণীয় এবং ঐতিহাসিক।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বাঙালি জাতির কাছে ছিল একটি বড় প্রেরণা। দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ, তিতিক্ষা, আন্দোলন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তুলে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য।

এই বছর এক নতুন প্রেক্ষাপটে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় কমিটির মাধ্যমের বাংলাদেশে এবং জাতিসংঘের UNESCO-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। এই জন্মশতবার্ষিকী পালনের মধ্য দিয়ে টানা ১২ বছরের রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্ভীক, তেজস্বী ও দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং সফল রাষ্ট্রনায়কোচিত সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার বাস্তব প্রতিফলন দেখিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাতা ও উন্নয়নের কাণ্ডারি, উন্নত, সমৃদ্ধ, মর্যাদাশীল বাংলাদেশ নির্মাণের রূপকার। শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে এবং দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে।

শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহু লেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকার মেট্রো রেল প্রকল্প, দোহাজারী-রামু-ঘুমধুম রেল প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা বিদ্যুৎ নির্মাণ প্রকল্প, পায়রা বন্দর, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দরসহ মেগাপ্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

তাঁর সফল রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্য দিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান, শিক্ষানীতি প্রণয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্র, শান্তি ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জঙ্গি দমন এবং রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে শেখ হাসিনা বহু মর্যাদাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন। ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন।

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বে মর্যাদার নতুন মাত্রা তিনি দিয়েছেন। শেখ হাসিনা আজ বিশ্বে একজন নন্দিত সফল রাষ্ট্রনায়ক। তিনি সৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিশ্বে তৃতীয় স্থানের অধিকারী হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা, চার মূলনীতি সংবিধানে পুনঃ অন্তর্ভুক্ত তিনি করেছেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের এবং যুদ্ধাপরাধী ও

মানবতাবিরোধীদের বিচার অনুষ্ঠিত করে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে পাপমুক্ত করেছেন।

বর্তমানে অত্যন্ত সফলতার সাথে করোনা পরিস্থিতি এবং পাশাপাশি উপর্যুপরি বন্যার মোকাবিলা করে যাচ্ছেন।

আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। তাঁর ঘোষিত ২০৪১ সালের আগেই উন্নত দেশে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার প্রতিফলন ঘটবে। তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

লেখক : রাজনীতিবিদ, সাবেক মন্ত্রী

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী : বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু অবিনাসূত্রে গাঁথা

ড. অনুপম সেন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব আজ। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী সমাপ্তির দিনও এই মাসে; এই মাসের ১৭ মার্চ ও ২৬ মার্চ দিন দুটি ইতিহাসে সুবর্ণ অক্ষরে লেখা রইল। আজ আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ২৬ মার্চ দিনটি পরম গৌরবে পালন করছি; পরম গৌরবে পালন করছি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর শেষ মাসটিকে। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধে ছিলাম এবং আমাদের উত্তর প্রজন্ম যারা আজ আমাদের দেশের স্বাধীনতার অর্ধশতবর্ষ পালন করছে সবাই এক অভূতপূর্ব অনশ্বর গৌরবের অধিকারী।

ইংরেজ রাজত্বের অবসানে ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রিতে যখন পাকিস্তান সৃষ্টি হলো, তখন পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা ভেবেছিল তারা স্বাধীনতা পেয়েছে; কিন্তু তারা স্বাধীনতা পেল না, পায়নি। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাঙালি হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথম স্বাধীনতা পেল তার নিজের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, যে রাষ্ট্রে তাকেই ঘোষণা করা হলো রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস হিসেবে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে বাঙালির প্রথম সংবিধান উপস্থাপন করে বলেছিলেন, 'বাংলার ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম নজির যে, বাঙালিরা তাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র প্রদান করছে। বোধ হয় নয়, সত্যিই প্রথম'। এই সংবিধানে জনগণকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সব ক্ষমতার উৎস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আরো ঘোষিত হয়েছিল, বাংলাই বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

বাঙালির ভাষা আন্দোলনেরই সুদূরপ্রসারী ফল বাঙালির স্বাধীনতা–বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এ কথা বঙ্গবন্ধুই বলেছেন

স্বাধীনতাত্তোরকালে। ভাষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য, অবিস্মরণীয়। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তার ভূমিকায় ছিলেন তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। এই মুসলিম ছাত্রলীগই 'ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবি উত্থাপন করে। এই দাবি আদায়ের জন্য ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ যে হরতাল আহ্বান করা হয়েছিল, তা সংঘটিত করার মূল দায়িত্ব পালন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। সেই দিন তিনি গ্রেফতার হন ৭০-৮০ জন সহকর্মী আন্দোলনকারীকে নিয়ে। এই গ্রেফতারের মধ্যদিয়ে অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্বের ২৩ বছরের ১৩ বছর তিনি যে কারান্তরালে কাটিয়েছিলেন তার সূচনা হয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির ৯ বছর পরে একটি সংবিধান তৈরি করেছিল পাকিস্তান গণপরিষদ ১৯৫৬ সালে। কিন্তু এই সংবিধান অনুযায়ী দেশে কোনো নির্বাচন হতে দেওয়া হলো না। পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র ভেবেছিল, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জনসংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। এ কারণে ১৯৫৮-এর ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সংবিধান বাতিল করে দেশব্যাপী সামরিক শাসন জারি করলেন; ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেকে সামরিক শাসক ঘোষণা করলেন। সামরিক শাসন জারির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হলো। যখনই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবর্গের খড়্গ বাঙালি জনগণের ওপর নেমে এসেছে, তখনই বাঙালি জনগণের অধিকারের প্রতীক বঙ্গবন্ধুকে কারান্তরালে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯৬২-তে আইয়ুব খান পাকিস্তানকে আরেকটি নতুন সংবিধান দিয়েছিলেন। কিন্তু জনগণ কোনো প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার পায়নি। পূর্ব পাকিস্তানের ওপর অর্থনৈতিক শোষণের নিগড় এর মাধ্যমে বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে আরও নিবিড় হলো, কঠিনতর হলো। ১৯৬৫-তে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। এক ডিভিশন সৈন্যও ছিল না পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য। ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব-লালবাহাদুর শাস্ত্রী যুদ্ধবিরতি (ভারত-পাকিস্তান) চুক্তির সমালোচনায় লাহোরে পাকিস্তানের বিরোধী দলসমূহের একটি সম্মেলন ডাকা হয়। এই সম্মেলনেই বঙ্গবন্ধু তাঁর ছয় দফা পেশ করলেন : নগ্ন ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে, বাঙালিকে মুক্ত করার জন্যই বঙ্গবন্ধু এই ছয় দফা

পেশ করেছিলেন। এই ছয় দফা কেন বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন, প্রতিটি বাঙালির বিশেষত নতুন প্রজন্মের তা জানা প্রয়োজন।

পাকিস্তানের সর্বমোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ বাঙালি হলেও পাকিস্তানের সবকিছুরই–সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কেন্দ্রভূমি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। পাকিস্তানের বার্ষিক বাজেটের সিংহভাগই–কোনো কোনো বছর সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ শতাংশই ব্যয় হতো প্রতিরক্ষা খাতে, প্রায় পুরোটাই হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তান অত্যন্ত শক্তিশালী এক প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলেছিল।

এই তথ্যে দেখা যায়, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিযুক্ত সামরিক অফিসার সর্বমোট ছিলেন ২২২০ জন অফিসার। সেখানে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিযুক্ত ছিলেন মাত্র ৮০ জন বাঙালি অফিসার। কী নগ্ন ছিল দুই অঞ্চলের প্রতিরক্ষা খাতের বৈষম্য! বেসামরিক কেন্দ্রীয় অফিসারদের ক্ষেত্রেও এই বৈষম্য কম ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে একজন সেক্রেটারিও ছিল না, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানি সেক্রেটারি সংখ্যা ছিল ১৯; মোট অফিসারের সংখ্যা ছিল ৬৯০। পূর্ব পাকিস্তানি অফিসারের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮০! ১৯৭০-এ পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীতে প্রায় চার লক্ষ সৈন্য থাকলেও পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালি সৈন্যের সংখ্যা ছিল ২০ হাজারের সামান্য বেশি।

পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের অর্থনৈতিক শোষণ কী নিবিড় ছিল বোঝা যায়, যখন দেখি ১৯৪৯-৫০-এ পূর্ব পাকিস্তানের জিডিপি ছিল ১২৩৭.৪ কোটি, পশ্চিম পাকিস্তানের ১২০৯.১ কোটি টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জিডিপি যখন মাত্র ২২৭১.৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানের তখন তা বেড়ে ৩১৫৬.৩ কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তর করেই এই বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। পঞ্চাশের দশক ও ষাটের দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত (১৯৬৭-৬৮) পাকিস্তানের প্রধান বৈদেশিক অর্থের উৎস ছিল পাট ও পাটজাত পণ্য। পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের প্রথম দশকে প্রায় ৭০ শতাংশ ও দ্বিতীয় দশকের প্রায় ৬০ শতাংশ আয় করেছে পূর্ব পাকিস্তান, কিন্তু তার বার্ষিক আমদানি প্রায় ৩০ শতাংশেই সীমিত ছিল। এই দুই দশকে বাংলাদেশ বা পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে বহির্বিশ্বের বাণিজ্যে প্রতিবছরই বিশাল উদ্বৃত্ত থাকত (কেবলমাত্র ১৯৬৩-৬৪, ১৯৬৪-৬৫ ছাড়া)। পূর্ব পাকিস্তানের এই বিশাল উদ্বৃত্ত দিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানের বিপুল আমদানি ঘাটতি মেটানো হতো। পূর্ব পাকিস্তানের এই বাণিজ্য উদ্বৃত্ত, যা

পাটশিল্প থেকে আসত তা-ই পশ্চিম পাকিস্তানের বিপুল উন্নয়নের আদি পুঁজি (primitive capital) হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের এই আদি পুঁজি সঞ্চয় এসেছে পূর্ব পাকিস্তানের পাট চাষিদের শ্রমের ফল লুণ্ঠন করেও। সে সময় পাকিস্তানি টাকার দাম কৃত্রিমভাবে বেশি রাখা হয়েছিল, ১ ডলারের সরকারি বিনিময় মূল্য ছিল ৪.৭৬ টাকা; খোলা বাজারে যার মূল্য ছিল ৮ টাকা। এর ফলে পাট চাষি যখন সরকারি মূল্যে ৪.৭৬ টাকা পেত তখন শিল্প মালিক বা ব্যবসায়ী পেত ৮ টাকা; ফলে প্রতি ডলারে পাট চাষির বঞ্চনা বা শোষণ ছিল ৩.২৪ টাকা। যেহেতু সব পাটকল মালিক, পাট ও পাটপণ্য ব্যবসায়ী যেমন আদমজী, বাওয়ানী, দাউদ, আমিন প্রমুখ প্রায় সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি তাই এই পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়ন, সেবা ও কৃষি খাতকে গড়ে তুলতে।

১৯৫০-৭০–এই দুই দশকে পাকিস্তান বৈদেশিক ঋণ পেয়েছিল ৬৫০ কোটি ডলার; এর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয় ৪৫৫.৮ কোটি ডলার, পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪.২ কোটি ডলার। বাংলাদেশের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের এই নগ্ন ঔপনিবেশিক বন্ধন ছিন্ন করতে, বাঙালিকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি দিতেই বঙ্গবন্ধু ছয় দফা পেশ করেন।

ছয় দফার মুখ্য দাবি ছিল, পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বিনিময়যোগ্য দুটি আলাদা মুদ্রা বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে দুটি আলাদা হিসাব থাকবে, যেন এক অঞ্চলের অর্জিত সম্পদ বা অর্থ অন্য অঞ্চলে স্থানান্তর না করা যায়। কেন্দ্রের শাসন সীমাবদ্ধ থাকবে কেবলমাত্র পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষায়। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রদেশগুলোর অবাধ ক্ষমতা থাকবে। এই বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রদেশেরই নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা অঙ্গরাজ্যসমূহের সম্মতির মাধ্যমে বণ্টন করা হবে। প্রদেশের নিজস্ব মিলিশিয়া গঠনের ক্ষমতা থাকবে। এটা পরিষ্কার যে, এই ছয় দফার মাধ্যমে দুটি রাষ্ট্রের অবয়ব মূর্ত হয়েছিল। আইয়ুব খান ছয় দফা প্রত্যাখ্যান করে বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে বলেন, তিনি যদি ছয় দফা প্রত্যাহার না করেন, তাহলে অস্ত্রের ভাষায় তাঁকে ছয় দফা প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হবে। বঙ্গবন্ধু ছয় দফা প্রত্যাহার করেননি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এই ছয় দফা প্রত্যাহার করেননি বলেই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে। এজন্যই বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু অবিনাসূত্রে

(inseparably) গাঁথা। এই ছয় দফায় রূপ দেওয়া হয়েছিল দুটি অঞ্চলের স্বাধীন সত্তার। বঙ্গবন্ধুকে এসব দাবি, অর্থাৎ ছয় দফা দাবি প্রত্যাহারে রাজি করানোর জন্যই ঢাকায় এসেছিলেন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্য নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো।

৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষ জনতার সামনে বঙ্গবন্ধু বিশ্বের ইতিহাসের স্বাধীনতা ঘোষণার যে শ্রেষ্ঠ ভাষণটি দিয়েছিলেন তার প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেছিলেন, বাঙালি সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সব অধিকার থেকেই বঞ্চিত। বঙ্গবন্ধুও বাঙালির শোষণমুক্তি, বন্ধনমুক্তি অর্জন করার ব্যাপারে কোনো আপসে রাজি ছিলেন না। তাই তাঁর মহাকাব্যিক ভাষণের শেষ বাক্যটি ছিল–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এই ভাষণটি ছিল অসাধারণ প্রজ্ঞা ও হৃদয় নিঃসৃত গভীর আবেগের সংমিশ্রণ। এই ভাষণে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু এই ভাষণটিকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাষণ হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। সে কারণেই ২৫ মার্চ রাতে যখন পাকিস্তানের অস্ত্রের আঘাত নেমে এলো, গণহত্যা শুরু হলো বাংলাদেশে, তখন বিশ্ববাসী, বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্র এর জন্য পাকিস্তানকেই দায়ী করে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি কামনা করেছিল।

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি বিজয় অর্জন করল। ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এলেন সমগ্র দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে, তাদের গভীর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে। তিনি পেলেন একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। এক বছরের মধ্যেই বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে দাঁড় করিয়েছিলেন জাতির পিতা। হাজার হাজার ধ্বংসপ্রাপ্ত কালভার্ট, ভৈরব ব্রিজ ও হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পুনর্নির্মাণ করলেন। সোভিয়েত সাহায্য নিয়ে মাত্র এক বছরের মধ্যে বোমার আঘাতে বেশ কয়েকটি নিমজ্জিত জাহাজের জন্য অচল চট্টগ্রাম বন্দরকে সচল করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যের পথকে বাধামুক্ত করলেন। ভারতে আশ্রয় নেওয়া এক কোটি লোক এবং দেশের মধ্যে বাস্তুচ্যুত প্রায় দেড় কোটি লোককে পুনর্বাসিত করা হয়। মৃত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে দ্রুত পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। রাজনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি একটি অসাধারণ সংবিধান জাতিকে উপহার দেন ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র ১০ মাসের

মধ্যে। এই সংবিধানে জনগণকে রাষ্ট্রের মালিক ঘোষণা করা হয়। ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশের গণতন্ত্র হবে শোষিতের গণতন্ত্র, শোষকের নয়। আরো তিনটি স্তম্ভ ছিল সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

নতুন প্রজন্মের অনেকের হয়তো জানাই নেই, ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধু যে বাংলাদেশ পেয়েছিলেন সে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৬০ শতাংশই ছিল দারিদ্র্যসীমার নিচে। দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী হলেও তাদের অধিকাংশই ছিল প্রায় ভূমিহীন, এক একরের কম জমির মালিক। পাকিস্তানের চরম শোষণ ও অবহেলার কারণে একরপ্রতি উৎপাদন এত সামান্যে দাঁড়িয়েছিল যে, সুজলা-সুফলা বাংলাদেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের শস্যভাণ্ডার, সেই বাংলাদেশের বার্ষিক খাদ্য ঘাটতি দাঁড়ায় প্রায় ২০ লক্ষ টন, দেশের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য প্রায় প্রতিবছরই নির্ভর করতে হতো মার্কিন খাদ্য সাহায্য পিএল ৪৮০-এর ওপর। বঙ্গবন্ধু বাঙালিকে এই চরম খাদ্যসংকট থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য খাদ্যে স্বয়ংম্ভর করার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন কৃষিকে। যথাযথভাবে তিনি দেশের উন্নয়নের পথ খুঁজেছিলেন শিক্ষায়, তাই প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা করেছিলেন অবৈতনিক। তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলের মধ্যেই শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে অগ্রগতি বা প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল, তা পরবর্তী সাত বছর পরেও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এমনকি ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের পথেও তিনি এগিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের সহস্র বছরের ইতিহাসের অমোচনীয় কলঙ্কের রাত্রি, কালরাত্রি ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট। এই কালরাত্রির তমিস্রা আজও রয়েছে; তার ঘন অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসৃত হতে শুরু করে যখন জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা এ দেশের মাটিতে ফিরে আসেন ১৯৮১ সালের ১৭ মে। তিনি ফিরে আসেন 'গণতন্ত্রের বহ্নিশিখা' হিসেবে। ১৯৯৬-এ, দীর্ঘ ২১ বছর পর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এবং আবার ২০০৯-এ নতুন করে ক্ষমতায় এসে এ দেশের প্রতিটি 'মানুষকে মানুষের মর্যাদা' দিতে যে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা দেশরত্ন শেখ হাসিনা শুরু করেন, তার ফলে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২০০৭-এ যা ছিল মাত্র ৭৭০ ডলার, তা আজ প্রায় তিন গুণ বেড়ে উন্নীত হয়েছে ২,০৬৪ ডলারে (২২২৭ ডলার, মে ২০২১)।

বাংলাদেশ আজ আর অনুন্নত দেশ নয়, উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় আজ যখন বেড়ে ২২২৭ ডলার, পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশ থেকে অনেক কম, মাত্র ১৫৪৩ ডলার। মানবিক উন্নয়নের সব সূচকে (HDI) বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে অনেক এগিয়ে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারত থেকেও। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ছিল কৃষি ঘাটতি দেশ, মাত্র এক কোটি টন কৃষিদ্রব্য উৎপাদিত হতো, যা তৎকালীন সাড়ে সাত কোটি লোকের খাদ্য চাহিদা মেটাতে পারত না। আজ বাংলাদেশের লোকসংখ্যা প্রায় সতেরো কোটি, কৃষি উৎপাদন তিন কোটি পঁচাশি লক্ষ টন, খাদ্যে উদ্বৃত্তের দেশ।

বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের এক বিস্ময়। করোনা মহামারির কারণে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের প্রবৃদ্ধি যখন ঋণাত্মক, বাংলাদেশ তা ধনাত্মক। ২০২০-২১ অর্থবছরে ভারত ও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেখানে মাইনাস বা ঋণাত্মক; সেখানে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি প্রায় ৫.২ শতাংশ। বাংলাদেশ আজ আর কৃষিভিত্তিক দেশ নয়, শিল্প ও সেবাভিত্তিক দেশ। বাংলাদেশের কর্মজীবীদের অধিকাংশই এখন এই দুই খাতে নিয়োজিত। বাংলাদেশের ৯৬ শতাংশ গ্রামেই বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে, নাগরিক সুবিধা গ্রামবাসীর দ্বারপ্রান্তে। ১৩ কোটি লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করে, ততোধিক লোক মোবাইল ব্যবহার করে। বাংলাদেশে এই অভূতপূর্ব উন্নয়ন যদি অব্যাহত থাকে তাহলে এই শতাব্দীর মধ্যভাগেই বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন পূর্ণতা পাবে।

লেখক : শিক্ষাবিদ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামের পরম্পরা

ড. আতিউর রহমান

৭ই মার্চ ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি জাতির মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন। এই ডাক ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির। তাঁর আহ্বানে পুরো জাতি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ওই সময়ে একটি স্বাধীন দেশের মতোই রাষ্ট্র পরিচালনা করছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নেতৃত্বে পুরো জাতিই যে মুক্তির সংগ্রামে বদ্ধপরিকর, তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। তাই সংলাপের ছলে ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো নিচ্ছিলেন গণহত্যার প্রস্তুতি। ২৫ মার্চ শুরু হয় পরিকল্পিত নির্মম গণহত্যা। আর ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। মূলত মুক্তিযোদ্ধা, কৃষক-সন্তানদের রক্তের বিনিময়ে আসে স্বাধীনতা। বন্দি বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বীরের বেশে ফিরে আসেন মুক্ত বাংলাদেশে। শুরু করেন বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার এক অবিস্মরণীয় সংগ্রাম।

যুদ্ধের ছাইভস্ম থেকে ফিনিক্স পাখির মতো এক নতুন দেশ গড়ে তোলার এ সংগ্রামের মূল চালিকাশক্তি ছিল এ জাতির লড়াকু মনোভাব আর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি তাদের অগাধ আস্থা। তাই বৈরী আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পরিবেশ এবং প্রতিকূল প্রকৃতিকে মোকাবিলা করে শুরু হয় নতুন বাংলাদেশ গড়ার এক অভাবনীয় অভিযাত্রা। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের অনেক বিশেষজ্ঞের আশঙ্কা ভুল প্রমাণ করেন বঙ্গবন্ধু। স্বাধীনতার কয়েক মাসের মাথায় প্রণয়ন করেন গণমুখী সংবিধান। আর ওই সংবিধানে উল্লিখিত রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নে যে ধারার সামাজিক রূপান্তর প্রয়োজন ছিল তা মাথায় রেখে সামনে নিয়ে আসেন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। এটি ছিল প্রকৃত অর্থেই একটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। এতে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ,

যানবাহন, রাস্তাঘাট–এমনকি পরিবার পরিকল্পনা খাতেরও সামগ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা পেশ করা হয়। প্রতিটি খাতেরই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয় এবং সমাধানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এ দেশের মানুষের প্রতি যে ভালোবাসা নিয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতাপূর্ব কালে সংগ্রাম করেছেন, ঠিক তেমনি ভালোবাসা ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করেছেন যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ পুনর্গঠনে। তাঁর রূপান্তরবাদী উন্নয়ন কৌশলের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল :

প্রথমত, তিনি জাতিকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই জাতীয় সম্পদের কার্যকর সদ্ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে তাঁর শাসনামলে। দ্বিতীয়ত, অগ্রাধিকার খাতগুলোতে যুদ্ধের পরপর বিদেশি সাহায্যের দরকার ছিল। তাই প্রাথমিকভাবে শর্তাধীন বৈদেশিক সাহায্যকে স্বাগত জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। তবে ক্রমান্বয়ে এই নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা তাঁর লক্ষ্য ছিল। তৃতীয়ত, বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় খাতের উদ্যোগকে একমাত্র পথ হিসেবে বিবেচনা করেননি। বরং ব্যক্তি খাতকে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে তোলার মধ্যেই সমাধান দেখেছেন। তাই স্বাধীনতার পরপর ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের সীমা ২৫ লক্ষ টাকা থাকলেও ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছর থেকেই এ সীমা ৩ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বঙ্গবন্ধু দেশের অর্থনীতিকে ঠিক পথে এগিয়ে নিচ্ছিলেন। বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে কেবল মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির দিকে লক্ষ করলেই তা বোঝা যায়। প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও মাথাপিছু আয় ১৯৭২ সালে মাত্র ৯৩ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ১৯৭৫-এ দাঁড়ায় ২৭২ মার্কিন ডলারে। অথচ বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে এই মাথাপিছু আয় কমে যেতে শুরু করে (১৯৭৬ সালে ১৩৮ মার্কিন ডলার এবং ১৯৭৭ সালে ১২৮ মার্কিন ডলার)। এছাড়া এর অনেক বছর পরে, ১৯৯০-এর দশকে এশিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের সময়ে প্রমাণিত হয় বঙ্গবন্ধু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ব্যক্তি খাতের বিকাশের যে নীতি নিয়েছিলেন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সেটিই সবচেয়ে কার্যকর কৌশল।

বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে জাতি সত্যিই ছিটকে পড়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ধারা থেকে। বহু বছর আর বহু সংগ্রামের পরে ১৯৯০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে আবার সঠিক পথে ফিরে আসে অর্থনীতি। তিনি রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি খাতের ভারসাম্য

রক্ষা করে মিশ্র অর্থনীতির এক নয়া ধারণার উন্মেষ ঘটান। ২০০১ সালে সে যাত্রায় ছন্দঃপতন ঘটলেও ২০০৮-এ আবার বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় ফেরে বঙ্গবন্ধুকন্যার আওয়ামী লীগ। আর তার পর থেকে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের এক অভাবনীয় যাত্রার মধ্য দিয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বের কাছে রোল মডেল।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলোর দিকে তাকালেই এই বিস্ময়কর অগ্রযাত্রাটির স্বরূপ বোঝা যায়। ২০০৮-০৯-এ যেখানে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৭ শতাংশ, ২০১৮-১৯-এ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.১ শতাংশে। খুব শিগগিরই দুই অঙ্কের ঘরে গিয়ে ঠেকবে প্রবৃদ্ধির হার, আর এ ধারা অব্যাহত রাখলে আগামী এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার হবে দ্বিগুণ। তবে কেবল আকার বৃদ্ধিতেই এই অর্থনৈতিক সাফল্য সীমাবদ্ধ নয়। কারণ এই উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় সকল স্তরের জনগণকে যুক্ত রাখা এবং একেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে এর সুফল পৌঁছে দেওয়াই বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বাধীন সরকারের মূল লক্ষ্য। তাই দেখা যাচ্ছে, গত এক দশকে দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্যের হার অর্ধেকের মতো কমিয়ে আনা হয়েছে (বর্তমানে দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ২০ শতাংশ ও ১১ শতাংশ)।

সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রশংসনীয় অর্জন রয়েছে গত এক দশকে। রাষ্ট্রীয় খাতে মেগাপ্রকল্প গ্রহণসহ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিপুল বিনিয়োগ ঘটেছে গেল দশকজুড়েই। রুগ্ন একটি বেসরকারি খাতকে বর্তমান সরকার রূপ দিয়েছে বৈশ্বিক অর্থনীতির এক যোগ্য অংশীদার হিসেবে। গত এক দশকে বেসরকারি বিনিয়োগ ৩ গুণ বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬ ট্রিলিয়ন টাকায়।

প্রবাসী আয়ও এখন দেশের অর্থনৈতিক শক্তির একটি অন্যতম স্তম্ভ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রবাসী আয় ছিল ৭,৯১৫ মিলিয়ন ডলার। ১০ বছরে তা দ্বিগুণ ছাড়িয়ে ১৬,৪২০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ৬,১৪৯ মিলিয়ন ডলার, যা ৫ গুণ ছাড়িয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে হয়েছে ৩২,২৩৬ মিলিয়ন ডলার। যেকোনো বড় ধরনের দুর্যোগ আমরা এই বিশাল রিজার্ভ দিয়ে সামলে উঠতে পারার ক্ষমতা রাখি। পাশাপাশি পদ্মা সেতুর মতো বড় বড় অবকাঠামো নির্মাণের সাহসও দেখাতে পারছি এ কারণেই।

রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রেও আমরা দেখিয়েছি ঈর্ষণীয় সাফল্য। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ১৪,১১১ মিলিয়ন ডলার। বর্তমান সরকার দায়িত্ব

নেওয়ার পর মাত্র ১০ বছরেই তা আড়াই গুণ ছাড়িয়ে ৩৫,৩৫৫ মিলিয়ন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। মোটকথা, বাংলাদেশের অর্থনীতি গত এক দশকে এমনভাবে এগিয়েছে যার সুফল পৌঁছে গেছে সকল স্তরের মানুষের কাছে এবং এই অগ্রগতি টেকসইও হয়েছে আগের তুলনায় কয়েক গুণ।

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচকেই নয়, সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ দেখিয়েছে অভাবনীয় সাফল্য। মাতৃমৃত্যুর হার ২০০৮ সালে ছিল প্রতি হাজারে ৩.৪৮ জন। ২০১৮ সালে কমে তা দাঁড়িয়েছে ১.৬৯ জনে। ২০০৮ সালে প্রতি হাজারে ৪১ জন নবজাতক মারা যেত। গত ১০ বছরে তা অর্ধেক কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২২ জনে। এ সব কিছুই আমাদের গড় আয়ু বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। ২০০৮ সালে যেখানে আমাদের গড় আয়ু ছিল ৬৬.৮, এখন তা ৭৩ বছরে এসে ঠেকেছে।

কাজেই বলা যায়, বঙ্গবন্ধুকন্যার কাছে দেশের মানুষ যেমনটা প্রত্যাশা করেছিল, তিনি তার চেয়েও শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যেতে পেরেছেন সামষ্টিক অর্থনীতিকে। কারণ মিশ্র অর্থনীতির যে নয়া ধারণার উন্মেষ ও বাস্তব প্রয়োগ তিনি ঘটিয়েছেন, সেখানে উচ্চ প্রবৃদ্ধির দিকে যেমন মনোযোগ দেওয়া হয়েছে. তেমনি জোর দেওয়া হয়েছে প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়াটিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাখার দিকে। একইভাবে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসূচি গ্রহণেও পিছপা হননি তিনি। সর্বোপরি, এই সময়ে সরকার নিজের সক্ষমতা যেমন বাড়িয়েছে, তেমনি অন্য অংশীজনদের সাথে সমন্বিত কার্যকর কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করেছে।

বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে তাঁরই সুযোগ্য কন্যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু জাতীয় সামষ্টিক লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে এখনো পাড়ি দিতে হবে অনেক বন্ধুর পথ। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ, জ্বালানি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, পরিকল্পিত নগরায়ণ এবং সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার মতো চ্যালেঞ্জগুলো তো রয়েছেই। পাশাপাশি বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জও যুক্ত হচ্ছে এ তালিকায়। যেমন সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে করোনা প্যানডেমিক মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ। এটি কেবল গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকিই নয়, বরং এর কারণে বাংলাদেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক সম্ভাবনাও হুমকির মুখে পড়েছে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ২০০৮-০৯ সালের বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার সময়কার কথা। সে সময় বাংলাদেশ সফলভাবে মন্দা মোকাবিলা

করতে পেরেছিল ব্যাপকভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কৌশল বাস্তবায়ন এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা বজায় রাখার মাধ্যমে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ওই একই কৌশল এবারও বাংলাদেশকে বাঁচাবে। বিশেষ করে কৃষি খাতকে চাঙ্গা করা, ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোক্তাদের বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং আইসিটিনির্ভর কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এই প্রতিকূল পরিস্থিতি কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে বলেই মনে হয়।

তবে সময়টা খুবই অস্বাভাবিক। তাই আমাদের অস্বাভাবিক নীতি ও উদ্যোগ নিতেই হবে। 'আউট অব বক্স' আর্থিক ও রাজস্ব প্রণোদনা দিয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাসহ সকল অনানুষ্ঠানিক উদ্যোক্তা, কৃষক, শ্রমিক এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত নীতি সমর্থন দিতে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকার যে দ্বিধা করবে না, তা আরও স্পষ্ট করে বলার সময় এসে গেছে। নিশ্চয়ই তাঁরা তা বলবেন এবং করবেন। একই সঙ্গে সমাজকেও সচেষ্ট ও সচেতন থাকতে হবে।

লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

একটি মানুষ যখন একটি দেশ

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আজ থেকে ঠিক একশত বছর আগে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে মায়ের কোল আলো করে একটি শিশুর জন্ম হয়। কেউ তখনও জানত না প্রায় অর্ধশতাব্দী পর এই শিশুটি এবং একটি দেশ সমার্থক হয়ে যাবে–তিনি হবেন বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের স্থপতি, একজন রাষ্ট্রনায়ক এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর জীবনের মতো বর্ণাঢ্য, ঘটনাবহুল, বৈচিত্র্যময় এবং অবিশ্বাস্য জীবন কাহিনি এই পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। একদিকে তিনি ছিলেন প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী একজন রাজনীতিবিদ, একজন নেতা এবং সংগঠক, অন্যদিকে তিনি ছিলেন এই দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কাছাকাছি একজন মাটির মানুষ। সারা পৃথিবীর মানুষ এখন জানে, কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি ছাড়া লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে, তাদের মুখের ভাষায় কথা বলে মাত্র আঠারো মিনিটের একটি ভাষণে তিনি একটি দেশের গতিপথ নির্ধারণ করে দিতে পারেন।

তরুণ বয়সে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন রাজনীতি শুরু করেছিলেন তখন এই উপমহাদেশে রাজনীতির সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল ধর্ম। সময়টি ছিল ধর্ম নিয়ে ভেদাভেদের সময়, হানাহানি এবং রক্তপাতের সময়। এই কলুষিত দুঃসময়েও বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিস্ময়করভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্ম পরিচয় নয়–মানুষ পরিচয়টিই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়। তাই ৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় তিনি হিন্দু এবং মুসলমানদের সমানভাবে রক্ষা করেছেন, পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় লঙ্গরখানা খুলে সকল ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন জুগিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম পরিবর্তন করে সকল ধর্মের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য 'আওয়ামী লীগ' নামকরণ

করেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানেরও একটি মূল আদর্শ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে যখন আবার ধর্ম নিয়ে হানাহানি শুরু হয়েছে তখন সবাই বঙ্গবন্ধুর মতো একজন পুরোপুরি মানবিক নেতার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করে।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক মেধা ছিল অবিশ্বাস্য। তাই ভারত পাকিস্তান দেশ ভাগের এক বছরের ভেতর তিনি বুঝে গিয়েছিলেন, যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য তিনি আন্দোলন করেছিলেন সেই রাষ্ট্রটি বাঙালিদের জন্য কোনো মঙ্গল বয়ে আনবে না। তিনি তার প্রমাণও চোখের সামনে দেখতে পেলেন। শুধু বঞ্চনা এবং শোষণ নয়, পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রটি বাঙালিদের নিজের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার অধিকারটুকুও দিতে রাজি নয়। রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন করে তিনি সেই ৪৮ সালে প্রথমবার জেলে গেলেন–তারপর কতবার জেলে গিয়েছিলেন মনে হয় তার কোনো হিসাব নেই! বঙ্গবন্ধু সঠিকভাবে বুঝেছিলেন বাঙালিদের দাবি আদায় করে নেওয়ার জন্য দরকার একটি সুগঠিত শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। দল সংগঠিত করার জন্য তিনি মন্ত্রিত্ব পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসেবে শুরু করে তিনি দেখতে দেখতে সত্যিকারের নেতা হয়ে উঠলেন। প্রথমে যুগ্ম সম্পাদক, তারপর সাধারণ সম্পাদক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর সবশেষে সভাপতি। ১৯৫৮ সালে শুরু হলো আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, সারা দেশে রাজনৈতিক নেতাদের ওপর জেল-জুলুম, বঙ্গবন্ধু তার মাঝে তাঁর দলকে সংগঠিত করে চললেন।

বঙ্গবন্ধু আজীবন রাজনীতি করেছেন দেশের মানুষের জন্য, তাঁর স্বপ্ন ছিল বাঙালির স্বাধিকার। শক্তিশালী সুসংগঠিত একটি রাজনৈতিক দলের সভাপতি হিসেবে তিনি বাঙালির স্বাধিকারের জন্য ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষণা করলেন। ঘোষণা দিয়েই শেষ নয়, সারা দেশ ঘুরে ঘুরে তিনি ছয় দফার পক্ষে বিশাল জনমত গড়ে তুললেন। ছয় দফার সনদটি ছিল স্বাধিকারের মোড়কে ঢাকা স্বাধীনতার ডাক। দেশের মানুষ তাই ছয় দফাকে লুফে নিল, বঙ্গবন্ধুর পেছনে একতাবদ্ধ হতে শুরু করল প্রবল আগ্রহে। বিপদ টের পেয়ে আইয়ুব খানের সরকার শুধু বঙ্গবন্ধু নয়, তাঁর দলের ছোট-বড় সব নেতাকে জেলখানায় পুরে রাখল। শুধু তা-ই নয়, তাদের অস্তিত্বের জন্য 'বিপজ্জনক' এই নেতাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা চাপিয়ে দেওয়া হলো।

দেশের সেই ক্রান্তিলগ্নে ১৯৬৯ সালে তখন ছাত্রসমাজ এগিয়ে এসেছিল, সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ তৈরি করে তারা সারা দেশব্যাপী একটি বিশাল

গণআন্দোলন শুরু করে দেশকে উথাল-পাথাল করে দিল। আইয়ুব খানের সরকার বাধ্য হলো বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে। দেশের ছাত্র-জনতা তাদের নেতাকে ফিরে পেয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্সের ময়দানে ১০ লক্ষ থেকে বেশি মানুষের সামনে তাঁকে প্রথমবার 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে সম্মানিত করে, সেই থেকে তিনি সবার কাছে বঙ্গবন্ধু হিসেবে পরিচিত।

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা দিয়ে আইয়ুব খান মাথা হেঁট করে চিরদিনের জন্য রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন। পাকিস্তানের নতুন সামরিক সরকার নির্বাচনের ঘোষণা দিল। তাদের হিসাব ছিল খুব সহজ, তারা দেখে এসেছে রাজনৈতিক নেতাদের মাঝে শুধু বিভেদ আর অনৈক্য, কাজেই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে কেউ সরকার গঠন করতে পারবে না, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় থেকে যাবে যত দিন তাদের ইচ্ছা।

তাদের হিসাবে অনেক বড় একটা ভুল ছিল, তারা বঙ্গবন্ধুর সত্যিকারের ক্ষমতা অনুমান করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের স্বাধিকারের স্বপ্ন দেখিয়ে একতাবদ্ধ করে রেখেছেন। তাই সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু দুটি সিট ছাড়া বাকি সব সিট পেয়ে গেলেন। এখন তিনি শুধু বাঙালিদের নয়, পুরো পাকিস্তানের একচ্ছত্র নেতা, এই প্রথমবার পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাবে একজন বাঙালি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেটা কেমন করে মেনে নেবে? শুরু হয়ে গেল কুটিল-নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র। সেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১ মার্চ হঠাৎ করে ইয়াহিয়া খান প্রস্তাবিত গণপরিষদ অধিবেশন স্থগিত করে দিলেন, খবরটা প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে পুরো দেশ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ল, মুহূর্তের মাঝে ঢাকা নগরী হয়ে গেল মিছিলের নগরী!

পৃথিবীর মানুষ তখন অবাক হয়ে দেখল একজন মানুষ কেমন করে একটি দেশ হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর একটি তর্জনী হেলনে পুরো দেশ থমকে দাঁড়াল। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্ময়কর অসহযোগ আন্দোলনে পুরো দেশ রাষ্ট্রযন্ত্রের অধীনে নয়, বঙ্গবন্ধুর মুখের কথায় পরিচালিত হতে লাগল। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ সেই সময়কার রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর জগদ্বিখ্যাত ভাষণ দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। যেটি ছিল স্বাধিকারের সংগ্রাম, সেই মুহূর্তে সেটি স্বাধীনতার সংগ্রামে পাল্টে গেল। তখনো কেউ জানত না রক্ত যদি স্বাধীনতার মূল্য হয়ে থাকে তাহলে কত মূল্য দিয়ে এই স্বাধীনতা কিনতে হবে।

পরের ইতিহাসটুকু আমরা সবাই জানি–সেটি ছিল আত্মত্যাগের ইতিহাস, বীরত্বের ইতিহাস এবং অর্জনের ইতিহাস। ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে মধ্যরাত থেকে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম গণহত্যা শুরু হয়ে গেল, গ্রেফতারের পূর্বমুহূর্তে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে গেলেন। তাঁকে পাকিস্তানের একটি বন্দিশালায় বন্দি করে রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নামে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হতে থাকে। পাকিস্তানের বন্দিশালায় বঙ্গবন্ধুর বিচার করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো, শঙ্কাহীন অবিচল বঙ্গবন্ধু তাঁর শেষ ইচ্ছাটি জানিয়ে দিলেন, মৃত্যুদণ্ডের পর তাঁর মৃতদেহটি যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

৯ মাসের যুদ্ধ শেষে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশের মাটিতে লাল-সবুজ পতাকার বুকে সোনালি বাংলাদেশ আঁকা পতাকাটি উড়তে শুরু করে। সেই পতাকায় লাল সূর্যটি কত রক্ত দিয়ে আঁকা হয়েছে, কত অশ্রুতে সেটি সিক্ত রয়েছে তার ইতিহাস তখন পর্যন্ত জানে শুধু স্বজনহারা আপনজন। বিজয়ের পর সারা পৃথিবীর চাপে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। বঙ্গবন্ধু তাঁর দেশের মানুষের কাছে ফিরে এলেন জানুয়ারির ১০ তারিখে। মানুষের ভালোবাসার সেই স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশের মতো সেই অনুপম দৃশ্যটি এভাবে পৃথিবীর আর কোথাও ঘটেছে বলে জানা নেই।

দেশে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু দেশ পুনর্গঠনে হাত দিলেন। দেশে তখন লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা মানুষ, পিতৃহারা পরিবার, সন্তানহারা মা, লাঞ্ছিতা নারী, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা, হতদরিদ্র জনগণ। তাদের ঘর নেই, বাড়ি নেই, পরনে কাপড় নেই, মুখে খাবার নেই। দেশে রাস্তাঘাট নেই, সেতু নেই, যানবাহন নেই, স্কুল নেই, কলেজ নেই, লেখাপড়ার বই নেই, খাতা নেই। অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, শুধু মানুষের বুকে বিশাল একটা প্রত্যাশা। নুতন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র, বৈরী আবহাওয়া, দুর্ভিক্ষের প্রতিধ্বনি এ রকম অসংখ্য প্রতিকূলতার মাঝখানে বঙ্গবন্ধু কাজ শুরু করলেন। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় এক বছরের ভেতর জাতিকে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান উপহার দিলেন। তিনি জানতেন, দেশকে পুনর্গঠনের প্রথম ধাপ হচ্ছে শিক্ষার পুনর্গঠন, তাই দেশে ফিরে আসার সাত মাসের মাথায় তিনি একটি শিক্ষা কমিশন তৈরি করে তার দায়িত্ব দিলেন বিজ্ঞানী মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদাকে। তিনি শুধু মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলেননি, সেটি বাস্তবায়নের জন্য দেশকে উপহার দিলেন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দিলেন, কৃষি উপকরণ সরবরাহ করার উদ্যোগ নিলেন, শিল্পের জাতীয়করণ করলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বাংলাদেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ

তার গ্যাসফিল্ডগুলোর মালিকানা ছিল বিদেশি কোম্পানির। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের ৯ তারিখ সেগুলো কিনে নিল বাংলাদেশ সরকার।

সপ্তাহ না ঘুরতেই আগস্ট মাসের ১৫ তারিখ ভোরবেলা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মম একটি হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলো। দুধের শিশু থেকে নববিবাহিতা বধূ কিংবা অন্তঃসত্ত্বা নারীটিও রক্ষা পেল না। বঙ্গবন্ধুর রক্তে রঞ্জিত হলো এই অভাগা দেশের মাটি। যে দেশটির তিনি জন্ম দিয়ে গেছেন সেই দেশটিকে গড়ে তোলার সময়টুকুও তাঁকে দেওয়া হলো না।

তারপর কত দিন কেটে গেছে। বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু সমার্থক, তাই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে আসলে বাংলাদেশকেই হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে গড়ে তোলা বাংলাদেশ তার পথ হারিয়ে বিভ্রান্তির কানা গলিতে হারিয়ে গেল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে যে অপরাধ করা হয়েছিল তার থেকেও জঘন্য অপরাধ করতে এগিয়ে এল মুক্তিযুদ্ধবিরোধী যুদ্ধাপরাধীর আশীর্বাদপুষ্ট সরকার। তারা বাংলাদেশের মাটি থেকে বঙ্গবন্ধুর শেষ চিহ্নটিও মুছে ফেলতে চাইল। এই দেশে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বড় হলো বঙ্গবন্ধুর কথা না জেনে, তাঁর ছবি না দেখে, কণ্ঠস্বর না শুনে। কেমন করে শুনবে? বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের সেই অগ্নিঝরা ভাষণ পর্যন্ত এই দেশে নিষিদ্ধ। কিন্তু যেই মানুষটি এই দেশের মানুষের হৃদয়ের গহিনে আশ্রয় নিয়ে আছেন, কোনো পাপিষ্ঠ, কোনো দুরাত্মার সাধ্য আছে তাঁকে সেখান থেকে অপসারণ করার?

তাই বঙ্গবন্ধু তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে ফিরে এসেছেন তাঁর পূর্ণ মহিমায়। যতদিন বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা আকাশে উড়বে, ততদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকবেন আমাদের হৃদয়ের গভীরে। বাংলাদেশের আকাশে, বাতাসে, মাটিতে।

বাংলাদেশের হৃদয়ের গভীরে।

লেখক : সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ : লক্ষ শিশুর প্রেরণার দিন

সেলিনা হোসেন

১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস। এ বছরে এই দিনে উদযাপিত হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শতবর্ষের জন্মদিন। এই জন্মদিন লক্ষ শিশুর মানবিক চেতনায় শুভবোধ নিয়ে গড়ে ওঠার প্রতীকী দিন। জাতির পিতা, স্বাধীনতার স্থপতি, ইতিহাসের মহামানবের ত্যাগ, সাহস এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসার শিক্ষা নিয়ে বড় হবে শিশুরা। শুভবোধের চেতনায় আলোকিত রাখবে নিজেদের শিক্ষার নানা দিকের সবটুকু ধারণ করে। মানুষ হবে দেশের প্রকৃত ইতিহাস জেনে। অঙ্গীকারবদ্ধ হবে সেই ইতিহাস ও চেতনাকে সঠিকভাবে রক্ষা করার প্রেরণায়। দেশ, জাতি ও মানুষসংক্রান্ত ভাবনায় জাতির পিতার জন্মদিন এ দেশের শিশুদের বেড়ে ওঠার বিকাশে একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ দিন।

শৈশব থেকেই তাঁর মানস চেতনায় দুটি জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এক. মানুষের প্রতি ভালোবাসা। দুই. অধিকার আদায়ের সচেতনতা। স্কুল থেকে ফেরার পথে তিনি শীতে কাঁপতে থাকা বুড়োকে গায়ের চাদর খুলে দিয়েছিলেন। বর্ষাকালে গরিব বন্ধুটি ভিজে স্কুলে এসেছিল দেখে নিজের নতুন ছাতাটি বন্ধুকে দিয়ে দিয়েছিলেন। শৈশব থেকে এভাবে নিজস্ব আলোকে মানুষের অবস্থা বুঝতে শিখেছিলেন। মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনকে সম্মান করতে শিখেছিলেন। আজকের বাংলাদেশের শিশুদের এই মানবিক বোধসম্পন্ন হয়ে বড় হয়ে ওঠা খুব জরুরি। তাই মহৎ মানুষের জীবনটিকে সামনে রেখে তাদের নৈতিকবোধে গড়ে তোলা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৪ জানুয়ারি রমনা রেসকোর্সে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে উল্লেখ করেছিলেন : 'বাংলার মানুষ বিশেষ করে ছাত্র এবং তরুণ সম্প্রদায়কে আমাদের ইতিহাস এবং অতীত জানতে হবে। বাংলার যে ছেলে তার অতীত বংশধরদের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে না,

সে ছেলে সত্যিকারের বাঙালি হতে পারে না। আজও বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয়নি। নতুন করে বাঙালির ইতিহাস রচনা করার জন্য দেশের শিক্ষাবিদদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি। এই ইতিহাস পাঠ করে যেন বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধররা তাদের গৌরবময় অতীতের পরিচয় পেয়ে গর্ব অনুভব করতে পারে এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।'

গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলে পড়তেন তিনি। একবার স্কুল পরিদর্শনে আসেন শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ মন্ত্রী দুজন পরিদর্শন শেষে চলে যাওয়ার সময় বঙ্গবন্ধু কয়েকজন ছাত্রসহ তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। বলেন, বৃষ্টির সময় স্কুলের হোস্টেলের ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে। ফলে ছাত্রদের অসুবিধা হয়। পড়াশোনায় ব্যাঘাত হয়। তাঁরা দুজনই স্কুলছাত্রের সাহসী ভূমিকা দেখে খুশি হন। অধিকার আদায়ের জন্য দৃঢ় চিত্ত হওয়া যে জরুরি, তা তিনি সেই বয়সে বুঝেছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই সাহসকে অভিনন্দন জানান। নিজস্ব তহবিল থেকে হোস্টেলের ছাদ মেরামতের প্রয়োজনীয় টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। দুজন মানুষই স্কুলের ছাত্রের ব্যক্তিত্ব দেখে মুগ্ধ হন। বুঝতে পারেন যে অধিকার আদায়ের পক্ষে নির্ভীক, সে অনেক দূর যাবে।

১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতিসংঘে ভাষণ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আজ এই মহামহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এইজন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়া বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহারা বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন।

আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের এই অঙ্গীকারের সহিত শহীদানের বিদেহী আত্মাও মিলিত হইবেন। ইহা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার যে, স্বাধীনতাযুদ্ধের

একজন সক্রিয় যোদ্ধা সভাপতি থাকাকালেই বাংলাদেশকে এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেওয়া হইয়াছে।'

তাঁর সাহস, শিক্ষা, জ্ঞানবুদ্ধি, মেধা দিয়ে টুঙ্গিপাড়ার মতো বাংলাদেশের একটি গ্রাম থেকে বিশ্বের সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছে ছিলেন, একটি স্বাধীন দেশের স্থপতি এবং জাতির পিতার গৌরব নিয়ে। তাঁর জন্মদিন শিশুদের জন্য জাতীয় শিশু দিবস। এটি শুধু একটি দিন মাত্র নয়, সেই মানুষটি সম্পর্কে জানতে হবে শিশুদের। জানতে হবে কীভাবে তিনি দেশ ও দেশের মানুষকে শৈশব থেকে জানতে শিখেছিলেন।

১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম বিশ্ব শিশুদিবস পালিত হয়। আয়োজক ছিল ইউনিসেফ ও আন্তর্জাতিক শিশু কল্যাণ ইউনিয়ন। এখন অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশুদিবস হিসেবে পালিত হয়। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অসংখ্য শিশু এতিম হয়ে পড়ে। হারায় আশ্রয়, বেঁচে থাকার নিরাপত্তা। ১৯২৪ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয় লীগ অব নেশনসের কনভেনশন। সেই কনভেনশনে ঘোষণা করা হয়, মানবজাতির সর্বোত্তম যা কিছু দেওয়ার আছে, শিশুরাই তা পাওয়ার যোগ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আবার লক্ষ লক্ষ শিশু এতিম ও অসহায় হয়ে পড়ে। শুধু তা-ই নয়, পারমাণবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তায় অসংখ্য শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ শিশু অধিকার বিষয়ক সনদটি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হয়। সনদে স্বাক্ষরদাতা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশ।

এ কথা সত্যি বিশ্ব শিশুদিবস শিশুদের আন্তর্জাতিক চেতনা বিকাশে সহায়তা দেয়। আর জাতীয় শিশু দিবস শিশুদের নিজের জাতিসত্তায় বিকশিত করে। তাকে ঐতিহ্য বুঝতে শেখায়। তার সংস্কৃতিকে লালন করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। যেকোনো শিশু পৃথিবীর যে দেশেই থাকুক না কেন তাকে নিজের জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়েই মাথা তুলে থাকতে হয়। এই দিক বিবেচনা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে উদযাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা।

বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে তিনি স্কুলের বালিকাদের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি নিজের সুদূরপ্রসারী চিন্তায় একটি বিশাল লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। একজন রাজনৈতিক নেতা কত দূরদর্শীসম্পন্ন হন বঙ্গবন্ধুর এই ভাবনা শিশুসম্পর্কিত চিন্তাকে মহীয়ান করে।

তিনি সে সময় ঢাকার কারাগারে রাজবন্দি ছিলেন। বইয়ের ৯৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "যে ওয়ার্ডে আমাদের রাখা হয়েছিল, তার নাম চার নম্বর ওয়ার্ড। তিনতলা দালান। দেওয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। যে পাঁচ দিন আমরা জেলে ছিলাম সকাল দশটায় মেয়েরা স্কুলের ছাদে উঠে স্লোগান দিতে শুরু করত, আর চারটায় শেষ করত। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা একটু ক্লান্তও হত না। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই', 'পুলিশি জুলুম চলবে না'—নানা ধরনের স্লোগান। এই সময় শামসুল হক সাহেবকে আমি বললাম, 'হক সাহেব ঐ দেখুন, আমাদের বোনেরা বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে পারবে না।' হক সাহেব আমাকে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, মুজিব।'"

বালিকাদের স্লোগান দেওয়াকে তিনি কত মর্যাদার সঙ্গে দেখেছেন এটি তাঁর চেতনার বড় দিক। শিশুরাও তাঁর কাছে ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রবল শক্তি। মনে করেননি ওরা যা করছে তা দিয়ে কিছু হবে না। এভাবেই বঙ্গবন্ধু তাঁর চিন্তা-চেতনায় দেশবাসীর প্রতিটি জায়গাকে মূল্যায়ন করেছেন। এটিই তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের বড় দিক।

তিনি তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের শুরুতে লিখেছেন : 'একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।'

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের জন্মদিন শুধু একটিমাত্র দিন নয়—তরুণ প্রজন্মের মানবিক শিক্ষায় একটি বড় দিক বঙ্গবন্ধুর সারা জীবন। নিজেদের জীবনযাপনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের দিক চর্চা করলে নিজেদের শাণিত করা যাবে। এই শিক্ষা নিয়ে বড় হোক এই প্রজন্ম।

লেখক : কথাসাহিত্যিক

উচ্চ যেথা শির

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

আজ ১৫ই আগস্ট। আজ থেকে ৪৫ বছর পূর্বে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট প্রত্যুষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। জাতীয় শোক দিবসের এই দিনে আমরা জাতির পিতাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যসহ আরও যাঁরা সে অভিশপ্ত দিনে শহিদ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতিও আমাদের অতল শ্রদ্ধা।

ভয়ংকর এক বিপন্নতার মাঝে মারণব্যাধি করোনাভাইরাসের মহাসংকটকালে এবার আমরা জাতীয় শোক দিবস পালন করছি। সকল আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করে যেমন আমরা মুজিব শতবর্ষ উদযাপন করছি, ঠিক সেভাবেই সকল স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করেই আজ আমরা প্রত্যেকে জাতির পিতাকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করব–যাঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে আজ আমরা স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক।

১২০ বছর পূর্বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কবিতার পঙক্তি 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' বঙ্গবন্ধুর জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টের সেই অভিশপ্ত প্রত্যুষে যিনি নির্ভয়ে-নিঃশঙ্কচিত্তে আভিজাত্যের সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারেন, যিনি একাত্তরের ২৫ মার্চের ভয়াবহ রাতে ভয়শূন্যভাবে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের নিজ বাসভবনে বসে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন', যিনি একাত্তরের ৭ই মার্চ অপরাহ্নে ঢাকার তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল জনসমুদ্রের ওপর যখন বর্বর পাকিস্তান বাহিনীর সেনা হেলিকপ্টার উড্ডয়নরত তখন বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', যিনি ১৯৫২ সালের ১৬

ফেব্রুয়ারি কারাগারে বসেই বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনশন শুরু করতে পারেন, তখন বাংলা ভাষাভাষী কাউকে আর বলতে হয় না যে রবীন্দ্রনাথ জীবনসায়াহ্নে এসে 'ওই মহামানব আসে' বলে যে ইঙ্গিত করেছিলেন তা সংগ্রামমুখর, রোমাঞ্চকর, মানবমুক্তির অনুভূতিশীলতায় পরিপূর্ণ সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত কিন্তু বহুবর্ণিল জীবনের সাথে সর্বাংশে সমার্থক। বাঙালির স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বাঙালিকে সন্নিবদ্ধ জাতিসত্তা পরিচয়ে পরিচিতি করে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধু আজ বিশ্বস্বীকৃত।

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় এসে প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুর এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকারের একপর্যায়ে প্রশ্ন করেছিলেন, '[একাত্তরের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে] আপনার ৩২ নম্বর ধানমণ্ডির বাড়ি থেকে যখন আপনি বেরিয়ে এলেন, তখন কি ভেবেছিলেন আর কোনোদিন আপনি এখানে ফিরে আসতে পারবেন?' প্রত্যুত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'না, আমি তা কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু আমার মনের কথা ছিল, আজ যদি আমি আমার দেশের নেতা হিসেবে মাথা উঁচু রেখে মরতে পারি, তাহলে আমার দেশের মানুষের অন্তত লজ্জার কোনো কারণ থাকবে না। কিন্তু আমি ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে আমার দেশবাসী পৃথিবীর সামনে আর মাথা তুলে তাকাতে পারবে না। আমি মরি, তাও ভালো। তবু আমার দেশবাসীর যেন মর্যাদার কোনো হানি না ঘটে।'

ডেভিড ফ্রস্টের অন্য এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'যে মানুষ মরতে রাজি তাকে কেউ মারতে পারে না। আপনি একজন মানুষকে হত্যা করতে পারেন, সে তো তার দেহ। কিন্তু তার আত্মাকে কি আপনি হত্যা করতে পারেন? না, তা কেউ পারে না। এটাই আমার বিশ্বাস।' ফ্রস্টের আরেক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'সাধারণ মানুষের প্রতিই আমার প্রথম ভালোবাসা। আমি জানি আমি অমর নই। কাজেই আমার বিশ্বাস, মানুষ মৃত্যুবরণ করবে সাহসের সঙ্গে।' পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের সামনে একইভাবে বঙ্গবন্ধু ছিলেন শান্ত, স্থির, নিরুদ্বেগ ও নির্ভীক। তিনি মাথা উঁচু রেখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর কারাজীবনের স্মৃতিকথা এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' ও 'আমার দেখা নয়া চীন' গ্রন্থত্রয় নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অবশ্যপাঠ্য। বঙ্গবন্ধু রচিত এই তিনটি মূল্যবান গ্রন্থ থেকে

আমরা ইতিহাসের বহু অজনা তথ্যের সন্ধান পাই। এই তিনটি গ্রন্থ লেখার পেছনে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের নিরন্তর প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণা আমাদের জাতীয় জীবনে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, সেজন্য আমরা তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। দেশের বিভিন্ন সংকটকালে বেগম মুজিব সময়োপযোগী ও বিচক্ষণ পরামর্শ দিয়ে জাতিকে চিরঋণী করে গেছেন।

মানবজীবনের ঘটনাবলির কত অদ্ভুত সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই। কারাগারে বসে লেখা বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনা ২০০৭ সালে শোকাবহ আগস্ট মাসের ৭ তারিখে ঢাকায় স্থাপিত সাবজেলের অন্ধকার কক্ষে বসে। বাবার আদর্শ সমুন্নত রেখেই কন্যা শেখ হাসিনা ১৬ কোটি মানুষকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ভূমিকায় শেখ হাসিনা লিখেছেন, 'আমার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের সব থেকে মূল্যবান সময়গুলো কারাবন্দি হিসেবেই কাটাতে হয়েছে। জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়েই তাঁর জীবনে বারবার এই দুঃসহ নিঃসঙ্গ কারাজীবন নেমে আসে। তবে তিনি কখনও আপস করেন নাই। ফাঁসির দড়িকেও ভয় করেন নাই। তাঁর জীবনে জনগণই ছিল অন্তঃপ্রাণ। মানুষের সুখ-দুঃখে তাঁর মন কাঁদত। বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবেন, সোনার বাংলা গড়বেন–এটাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। যে কারণে তিনি নিজের জীবনের সব সুখ-আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে জনগণের দাবি আদায়ের জন্য এক আদর্শবাদী ও আত্মত্যাগী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, বাঙালি জাতিকে দিয়েছেন স্বাধীনতা।'

বঙ্গবন্ধু আজীবন ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন, সত্যের পক্ষে ছিলেন ও সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারের পক্ষে ছিলেন। সত্যের শক্তি আর ন্যায়ের শক্তির চেয়ে শক্তিধর আর কী হতে পারে। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থায়ই ১৯৪৮ সালে বলতে পারেন, 'পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তাতে যাই হোক না কেন, আমরা প্রস্তুত আছি'। এই উক্তির সাথেই সেই সাহসের সুর নিহিত। মাতৃভাষার অধিকার আদায়ে বাঙালিরা একদিন মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে প্রতিবাদমুখর হয়েছিল। সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে প্রথমবার কারাগারে নেওয়া হয় তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ তারিখে। তার পর থেকে পাকিস্তানের ২৪ বছরের ঔপনিবেশিক আমলে এক

যুগেরও অধিক সময় বঙ্গবন্ধুকে কারাগারের অভ্যন্তরে সময় কাটাতে হয়। তবে তিনি কারাগারেই থাকুন অথবা কারাগারের বাইরে থাকুন, বঙ্গবন্ধুর সার্বক্ষণিক চিন্তা ছিল বাঙালির সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণ।

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, গণমানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু একাত্তরের ৩ জানুয়ারি রমনার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমাবেশে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণসহ ছয় দফা ও এগারো দফা কর্মসূচির ওপর বিশ্বস্ত থাকার শপথ গ্রহণ করেন। লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সেদিন অপরাহ্নে নেওয়া শপথবাণীর শেষ বাক্যটি ছিল 'জনগণ অনুমোদিত আমাদের কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াসী যেকোনো মহল ও অশুভশক্তির বিরুদ্ধে আমরা প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলব এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে যেকোনো ত্যাগ স্বীকারকরতঃ আপসহীন সংগ্রামের জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত থাকব।'

প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ বঙ্গবন্ধু সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে নির্বাচিত এই সদস্যগণ সম্ভবত পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের ফ্লোরে শপথ নেওয়ার সুযোগ পাবেন না। তাই সাধারণ মানুষের সামনে উন্মুক্ত ময়দানে সকল নির্বাচিত সদস্যসহ বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকার রক্ষায় সকল আত্মত্যাগের শপথ গ্রহণ করে আমাদের মুক্তির সংগ্রামকে তাঁর সম্মোহনী নেতৃত্বে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান।

পরবর্তীতে একাত্তরের ৭ই মার্চ তারিখে যখন শপথগ্রহণের একই স্থানে বঙ্গবন্ধু দশ লক্ষ মানুষের সামনে ঘোষণা দেন যে, বাঙালির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা ও ট্যাক্স প্রদান সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে, দেশের সকল সরকারি, বেসরকারি অফিস, হাইকোর্ট ও নিম্ন আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সচিবালয় বন্ধ থাকবে ও পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো টাকা পাঠানো যাবে না তখন শপথ অনুষ্ঠানের পূর্বে ও পরে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সময় প্রদত্ত বক্তব্য ও মন্তব্যের তাৎপর্য দেশবাসী গভীরভাবে উপলব্ধি করে। বঙ্গবন্ধু যখন বলেন 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো' তখন জনগণ সম্মুখ সমর ও মুক্তিযুদ্ধের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধু একপর্যায়ে সম্মুখ সমরের কথা বলেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের মূলমন্ত্র আর অবরুদ্ধ দেশবাসীর বীজমন্ত্র। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

থেকে যখন বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে সম্মোহনী ও আবেগমথিত ৭ই মার্চের ভাষণ সম্প্রচারিত হতো তখন আক্ষরিক অর্থেই প্রত্যেক বাঙালির দেহের লোম খাড়া হয়ে যেত ও স্মরণে আসত বঙ্গবন্ধুর বৈপ্লবিক উক্তি 'সংগ্রামী বাংলা দুর্জয়, দুর্বিনীত। কাহারও অন্যায় প্রভুত্ব মানিয়া নেওয়ার জন্য, কাহারও কলোনি হইয়া, বাজার হইয়া থাকার জন্য বাংলার মানুষের জন্ম হয় নাই'।

পাকিস্তান সেনা শাসকদের নির্দেশে পাক হানাদার বাহিনী এ দেশে যেভাবে বর্বরোচিত গণহত্যা, গণধর্ষণ, গ্রামের পর গ্রাম অগ্নিসংযোগ ও পুরুষশূন্য করার ন্যায় মানবতার বিরুদ্ধে নানা অপরাধ সংঘটিত করে, তখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাদের গেরিলারা প্রাণপণ যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করে। এ বিজয়ের নির্মাতা বঙ্গবন্ধু তাঁর অনুসারী বীরদের এমনভাবেই দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রস্তুত করেছিলেন, যা কবি সুকান্তের উচ্চারণে বলতে পারি 'সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী/ অবাক তাকিয়ে রয়;/জ্বলে-পুড়ে মরে ছারখার/ তবু মাথা নোয়াবার নয়'। মাথা উঁচু রাখার রাজনৈতিক দর্শনের উত্তরাধিকার বঙ্গবন্ধু আমাদের দিয়ে গেছেন–আমরা যেন সবসময় তা স্মরণে রাখি। জেল-জুলুম, অত্যাচার-অবিচার, অন্যায় সব সহ্য করেও বঙ্গবন্ধুর আপসহীন নেতৃত্বের শিক্ষাই হচ্ছে আত্মত্যাগ অনুশীলনের শিক্ষা।

বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণের সাথে সাথেই আমরা অনুভব করি দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের নিবিড় স্পন্দন, সকল বন্ধন থেকে মুক্তির প্রাণোচ্ছ্বাস। বাঙালির মুক্তিদাতা বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মাঝে অনুপ্রেরণা, আস্থা, বিশ্বাস ও আশ্রয়ের প্রতীক হিসেবে চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবেন। বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শনই আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী।

বাংলাদেশের সাথে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক, বাংলাদেশের মানুষের সাথে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক একটি চিরস্থায়ী সম্পর্ক যে কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রকৃত অর্থে মৃত্যুঞ্জয়ী। ব্যক্তি মুজিবকে হত্যা করলেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা যায় না। তিনি বাঙালি জাতির মাঝে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন। তিনি বাঙালির চিরস্বজন। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির মূল লক্ষ্যই ছিল বাঙালিসহ সকল শোষিত জনগণের মুক্তি ও পৃথিবীর সার্বিক প্রগতি। তিনি মানুষ, মাতৃভাষা, মাতৃভূমি ও বিশ্বমানবতার মুক্তির সংগ্রাম করেই জীবনদান করে গেছেন।

বঙ্গবন্ধুর বিশ্বজনীনতা প্রকাশ পায় আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে প্রদত্ত ভাষণ-অভিভাষণে। সদ্য স্বাধীন একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু যে কয়টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সে সকল

সম্মেলনে সবকিছু আবর্তিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে। জ্যামাইকার কিংস্টনে অনুষ্ঠিত ২০তম কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ১৯৭৪ সালের ২ মে তারিখে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, 'খুব বিলম্ব না হওয়ার আগেই ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতাভিত্তিক একটি নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রসমূহ কাজ করবে।' ১৯৭৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু সে সময়কার বিশ্ব বাস্তবতা তুলে ধরে বলেন, 'এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে আমাদের মধ্যে মানবিক ঐক্যবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধের পুনর্জাগরণ। বর্তমানের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে একটা ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যুক্তির শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা। এ ব্যবস্থায় থাকবে নিজের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর প্রতিটি দেশের সার্বভৌম অধিকারের নিশ্চয়তা।'

যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে সে দেশের তরুণ প্রজন্মকে অভিহিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তরুণদের স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন ও তাদের ওপর আস্থা রাখতেন। বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রথম জাতীয় সম্মেলনে ১৯৭৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধু আত্মশুদ্ধ, আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মসংযমী, আত্মসমালোচনায় আগ্রহী ও আত্মবিশ্বাসী যুবসমাজের উন্মেষ ও বিকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। স্বাধীন দেশকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার জন্য যুবশক্তির প্রতি বঙ্গবন্ধু স্বভাবসুলভ আন্তরিকতায় বলেন, 'ওয়াদা কর্, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করবি'। বঙ্গবন্ধুর সকল ভাষণেই তিনি সততার কথা বলেছেন, দেশপ্রেমের কথা বলেছেন, মানুষকে ভালোবাসার কথা বলেছেন, সাহসিকতা ও আপসহীনতার কথা বলেছেন, বলেছেন কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ব পালনের কথা। শুধু শোকাবহ আগস্ট মাসেই নয়, শুধু মুজিব জন্মশতবর্ষেই নয়, বছরের প্রতিটি দিন বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা-সম্মান নিবেদন আমাদের দায়িত্ব। বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের অর্থই হচ্ছে তাঁর জীবনদর্শন ধারণ করে নিজের জীবনকে বিশুদ্ধ রাখা, আত্মশুদ্ধ করা।

মানুষ মাত্রই ভুল হয়। বঙ্গবন্ধু চর্চায় নিবেদিত ব্যক্তি প্রতিনিয়ত নিজেকে উত্তরোত্তর পরিশুদ্ধ করবেন, সেটিই প্রত্যাশিত। বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছিলেন, 'আত্মসমালোচনা না করলে আত্মশুদ্ধি করা যায় না। আমি ভুল নিশ্চয়ই করব, আমি ফেরেশতা নই, শয়তানও নই। আমি মানুষ, আমি ভুল করবই। আমি

ভুল করলে আমার মনে থাকতে হবে, আই ক্যান রেকটিফাই মাইসেলফ। আমি যদি নিজেকে রেকটিফাই করতে পারি সেখানেই আমার বাহাদুরি।' (১৯ শে জুন, ১৯৭৫)

পরিশীলিত, পরিমার্জিত, পরিশুদ্ধ, পরোপকারী, পরশ্রীকাতরতাবিমুখ, পরিমিতিবোধসম্পন্ন মানুষই ছিল বঙ্গবন্ধুর নিকট সোনার মানুষ। বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার সূত্রও দিয়ে গেছেন। জীবনে তিনি বহুবার বলেছেন, 'সোনার বাংলা গড়ার জন্য আমার সোনার মানুষ চাই'। যে প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংগীত আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, সে দেশের প্রত্যেক নাগরিক হবে সোনার মানুষ–এই ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবনের প্রত্যয় ও প্রত্যাশা।

মুজিব জন্মশতবর্ষে এবারের জাতীয় শোক দিবসে আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের শোককে শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিজেদের সোনার মানুষে পরিণত করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হোক আমাদের পথপ্রদর্শক। জয়তু বঙ্গবন্ধু।

তথ্যসূত্র : বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা

লেখক : সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ : তাত্ত্বিকতা, বাস্তবতা ও প্রাসঙ্গিকতা

অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেদিনে মঞ্চে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, আর বক্তা ছিলেন মাত্র একজন–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সভার সভাপতি কে ছিলেন তা জানার প্রয়োজন বোধ করিনি। সভাটি শুরুর আগে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'তোমার নেতা আমার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' স্লোগানে মুহর্মুহু উচ্চারিত হচ্ছিল। বক্তৃতা শুরুর সাথে সাথে সারা ময়দানের কমপক্ষে দশ লাখ শ্রোতার মাঝে পিনপতন নিঃস্তব্ধতা নেমে আসে। 'ভায়েরা আমার' বলে তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন এবং জানালেন 'আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি।' তারপর শ্রোতাকে উৎকর্ণ করার মানসে বললেন, 'আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।' বক্তার ও বিষয়বস্তুর বিশ্বাসযোগ্যতায় বিমোহিত শ্রোতা উজ্জীবিত ও উৎকর্ণ হয়ে তার ১৮-১৯ মিনিটের ভাষণটি শুনলেন। শুধু শুনলেন না, অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আকাশে যুদ্ধবিমানের আনাগোনা কিংবা একটি হেলিকপ্টারের চক্রাকার আবর্তন শ্রোতাদের মনোযোগে বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটেছিল বলে মনে পড়ছে না। বক্তব্য শেষে বহু স্লোগান উচ্চারিত হয়েছে এবং মনে হলো লক্ষ লক্ষ শ্রোতা তাদের কাম্য বস্তুটি হাতে পেয়ে তৃপ্ত মনে ঘরে ফিরে যাচ্ছে।

সেদিন আমার মতো লাখো লাখো শ্রোতার কাম্য ছিল একটা ঘোষণা এবং সে ঘোষণাকে বাস্তবায়নের রণকৌশল। বঙ্গবন্ধু আমাদের শোনালেন

স্বাধীনতার অমর কাব্যের একাংশ 'এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। কার্যত এই বাক্যটিই ছিল স্বাধীনতার প্রচ্ছন্ন ঘোষণা এবং তার পরই শত্রুপক্ষের কামান গর্জে ওঠার কথা ছিল। তা হলো না, কেননা শ্রদ্ধেয় বক্তা একটু রেশ টেনে ধরলেন। আরও একটু কৌশলী পথ ধরলেন।

সভাস্থলে আসার পূর্বে সহকর্মী, উদ্ধত ছাত্র ও যুবনেতাদের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তিনি স্বর ও সুরে নমনীয়তা যোগ করে চারটি দাবি উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন, 'সামরিক আইন মার্শাল ল, উইথ-ড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।' বস্তুত সংসদ অধিবেশন স্থগিতের পর এটাই ছিল বিশ্ববিবেকের সাথে সংগতিময় আহ্বান। অন্যদিকে এটা যে স্বাধীনতা অর্জনের অন্যতম নিয়মতান্ত্রিক কৌশল ছিল এবং থাকতে পারত তা কিছুটা হলেও তিনি দৃষ্টিসীমায় রাখলেন। সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই শেখ মুজিব স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। কখনও তিনি সে লক্ষ্যচ্যুত হননি। তবে কৌশলের ব্যাপারে তাঁর বিকল্প চিন্তা ছিল। একটা ছিল নিয়মতান্ত্রিক, যার উৎকৃষ্ট প্রকাশ ঘটে ছয় দফার কর্মসূচিতে। ৭ই মার্চ ভাষণে উত্থাপিত শর্তাবলি যদি পাকিস্তানের শাসকরা মেনে নিত তাহলে ক্ষমতায় বসেই ছয় দফাভিত্তিক নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তিনি স্বাধীনতা আনতে পারতেন। তিনি জানতেন, পাকিস্তান তাও মেনে নেবে না। তাই সুস্পষ্ট অসহযোগের ঘোষণা দিলেন। তিনি বললেন, 'আজ থেকে এই বাংলাদেশের কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।' কিংবা 'যে পর্যন্ত আমার দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো–কেউ দেবে না।'

তিনি রক্তপাতের কথা প্রথম থেকেই উচ্চারণ করলেন, শ্রোতাদের বোঝাতে চাইলেন যে রক্তের মতো চরম মূল্য দিয়েই মুক্তি ও স্বাধীনতা আনতে হবে। রণকৌশলের পুনরাবৃত্তি ও সম্পূরক রণকৌশলের কথাও বললেন, 'আমরা ভাতে মারবো, পানিতে মারবো'। এ বাংলার হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান, বাঙালি-অবাঙালির সমস্কেলে তিনি হন্তারক সেনা সদস্যেরও ভাই বলে সম্বোধন করলেন। সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে থাকার নির্দেশনা দিলেন; সুর আরও কোমল করে বললেন, 'তোমরা আমাদের ভাই,

তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না।' পরের বাক্যটি হলো 'কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না, ভালো হবে না।' প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা দিলেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারব না, আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।' সতীর্থদের নির্দেশ দিলেন, 'তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।' 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাব-ডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।'

রক্তের প্রসঙ্গ আবার তুললেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, বাংলার মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব'–ইনশাল্লাহ। এবং আসল কথাটিতে 'আমার' বদলে 'আমাদের' শব্দটি যোগ করে বললেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এখানেই স্পষ্ট হলো যে যদিও সেদিনে তিনি সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি, তবুও মহান স্রষ্টা তাঁর মুখ দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণাটিই নিঃসৃত করে দিলেন, যা লাখো লাখো শ্রোতার কাম্য ছিল। বহু পরে পাকিস্তানি গোয়েন্দার ভাষ্যে জেনেছি যে, 'শেখ মুজিব আমাদের নাকের ডগায়, চোখের সামনে স্বাধীনতার ঘোষণাই দিয়ে গেলেন। আমরা কিছু করতে পারলাম না।' তাই তাত্ত্বিকভাবে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালির স্বাধীনতা ঘোষণার দিন।

তবে ৭ই মার্চের জনসভায় আসার আগেই এটুকুও জানতাম যে বঙ্গবন্ধু সকলের আকাঙ্ক্ষাকেই বাঙ্ময় করে তুলবেন। আমি ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখেই জেনেছিলাম নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংগ্রামের দিন শেষ। সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। ২৮ তারিখে সকাল ৯টায় ঘণ্টাখানেকের জন্য মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের সাথে বঙ্গবন্ধু আলোচনায় বসেছিলেন। দুপুরের পর শেখ ফজলুল হক মণির সঙ্গী হয়ে আমি আওয়ামী লীগ অফিসে গিয়ে তা জানতে পারলাম। আশ্বস্ত হওয়ার মতো কথা শুনলাম যে বিনা রক্তপাতে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হতে পারে। আমাদের আলোচনার মাঝপথেই ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধুকে টেলিফোন করলেন। ইঙ্গিত পেয়ে আমরা বাইরে চলে গেলাম। কয়েক মিনিট পর বঙ্গবন্ধু আমাদের ডেকে নিয়ে বললেন যে 'যদি ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ কোনো বিবৃতি কিংবা ভাষণের মাধ্যমে ৩ মার্চের সংসদ অধিবেশন বন্ধ করে দেয়, তাহলে রক্তপাত ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না।' ১ মার্চ তারিখে ইয়াহিয়া ভাষণ নয়,

একটি বিবৃতির মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য সংসদ অধিবেশন বন্ধ করে দিল। বাইরের কাছে বিবৃতিটি ছিল একটি সামান্য ঘটনা। ২৩ বছরের আগুনে জ্বলা বাঙালির কাছে তা ছিল জীবন-মরণ সমস্যা, যার সমাধান উত্তরোত্তর রক্তদানের মধ্যে নিহিত। ৭ই মার্চের ভাষণে বারবার যখন তিনি রক্তদানের কথা বলেছিলেন তখন আমার মনে হচ্ছিল যুদ্ধ আসন্ন ও রক্তদান অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণার সাথে সাথে যুদ্ধের কৌশলও ঘোষিত হলো। উপস্থিত লাখো লাখো জনতা এটাকেই স্বাধীনতার ডাক ও যুদ্ধের আহ্বান ধরে দৃপ্ত পদে ও তৃপ্ত মনে ফেরার পথ ধরল। মনে হলো তাঁরা গন্তব্য ও পথের নির্দেশনা পেয়ে গেছেন। তবে প্রতিঘাতের দিনক্ষণ নির্ধারিত হলো এভাবে 'আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের উপর হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল তোমরা প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যুদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।'

ভাষণের পর দেন-দরবারের মধ্যে ১৮ দিন চলে গেল আর আনুষ্ঠানিক ঘোষণার লগ্নটি এসে গেল। মোক্ষম লগ্ন এলো ২৫ মার্চ রাতে যেদিন একটি গুলি দিয়ে একজন মানুষকে নয়, হাজারে হাজারে মানুষকে লাখো লাখো গুলির আঘাতে প্রাণে মারা হলো। আমাদের সৌভাগ্য এই প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিলেন। প্রতিরোধ যুদ্ধ থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটা পেছনে ফেলে রেখে যুদ্ধে জড়িয়ে গেলাম। যুদ্ধটা কাম্য ছিল না, কিন্তু আমাদের যুদ্ধ ছাড়া বিকল্প ছিল না। যুদ্ধকালে প্রতিনিয়ত বঙ্গবন্ধুর আহ্বানটি কানে বাজতে থাকত 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ৯ মাস তাঁর এই ভাষণটি আমাদেরকে বারবার বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি মনে করিয়ে দিয়েছে, উদ্দীপ্ত করেছে। ট্রেনিংয়ের আগে ট্রেনিংয়ের সময়ে এবং যুদ্ধকালে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমরা নিজেরা তা শুনেছি, নিবেদিত যোদ্ধাদের শুনেয়েছি যারা অকাতরে নির্দ্বিধায় মৃত্যু উপত্যকায় প্রতিযোগিতায় নেমে জয়ী হয়েছে।

যুদ্ধকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কিংবা অন্যান্য পত্রপত্রিকা মারফত তাঁর ভাষণের বাণী নির্দেশনা হয়ে আমাদের সজ্জীবিত রেখেছে, গন্তব্যে উপনীত হওয়ার পাথেয় দিয়েছে। যুদ্ধ পরিচালনার বাইরে সাপ্তাহিক

'বাংলাদেশ' পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও কলাম লেখকের খণ্ডকালীন দায়িত্বে ছিলাম। যতটা সম্ভব ৭ই মার্চের ভাষণকে মৃত সজ্জীবনী হিসেবে উপস্থাপনের প্রয়াস ছিল। এ ভাষণে একটি নন-মার্শাল জাতিকে মার্শাল জাতিতে রূপান্তর, একটি দ্বিধান্বিত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন জাতিকে একত্রিত ও সমন্বিত করার উপাদান ছিল। এ ভাষণ সর্বাধিনায়ককে যোদ্ধার সামনে সারাক্ষণ উপস্থিত রেখেছে। বঙ্গবন্ধুকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অহিংসবাদী ও মানবিক নেতা হিসেবে পরিচয় করিয়েছে। তাঁকে রাজনীতির কবি হিসেবে অভিষিক্ত করেছে।

বহু বছর পর ইউনেস্কো ভাষণটিকে বিশ্ব-মানুষের যৌথ সম্পদের মর্যাদা দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও ভাষণটিকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছে। ভাষণটির প্রণেতা ও বক্তা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এখন প্রয়োজন হলো ভাষণটিকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণের জায়গায় নিয়ে আসা।

ভাষণটির শব্দচয়ন ও বাক্য বিন্যাসে যে বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও বাস্তবতার স্পর্শ ছিল, তা এখন খুঁজে পাই। বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের বিচ্ছিন্নতাবিরোধী আন্তর্জাতিক আইনের সাথে পরিচিত ছিলেন। নাইজেরিয়ায় বায়োফ্রার পরিণতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন, বিশ্বমোড়লদের মতিগতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, বিশ্ব জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, ভারতের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তাতে ছিলেন। ১ থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত ভারতের সাধারণ নির্বাচন চলছিল। ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন নিয়ে গৃহবিবাদ ছিল, অনিশ্চয়তা ছিল। তাই অপেক্ষার প্রয়োজন ছিল। ৮ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত দেন-দরবার, দর-কষাকষি, মন-কষাকষি, হুমকি-ধমকির ও রক্তগঙ্গার সম্ভাবনার মধ্যে তিনি প্রস্তুতির সুযোগ নিয়েছিলেন। বিশ্ব জনমত মোটামুটি অনুকূলে আনতে পেরেছিলেন। দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করলেন, সংঘবদ্ধ করলেন, আর প্রতিঘাতের অপেক্ষায় রইলেন। ২৬ মার্চে যখন তিনি স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেন তখন সেটাকে কেউ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বা একক স্বাধীনতা ঘোষণা বলতেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেনি। যুদ্ধ চলল। সারা দেশ সম্পৃক্ত হলো। নিজের প্রয়াস ও মিত্রদের সহায়তা আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম হলাম।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে আমাদের রাজনৈতিক লড়াই সমাপ্ত হয়েছে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির লড়াই চলছে, হয়তো অনন্তকাল চলবে।

তাতে বাধা আসবে, বিপত্তি আসবে আর সেসব উত্তরণে জন্ম-জন্মান্তরে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে এই ভাষণটি থাকবে। শুধু দেশে নয়, পৃথিবীর যেকোনো স্থানে মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামে ভাষণটি প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে। আমাদের এই মহামূল্যবান সম্পদটি যথোপযুক্ত সংরক্ষণ করতে হবে, তার অন্তর্নিহিত বাণী, ভাব, ভাষা ও দ্যোতনাকে সম্প্রসারিত করতে হবে। ভাষণস্থলসহ অন্যান্য পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। আরও প্রয়োজন হচ্ছে এই ভাষণ ধারণ, বাহন, সংরক্ষণ, ঝুঁকিময় পরিবহন ও যথাস্থানে সমর্পণের কাজে নিয়োজিত সকলের প্রাপ্য স্বীকৃতিদান।

এই ভাষণের নিকটতম উদ্দেশ্যসমূহ প্রায় সবই অর্জিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিকতা বিচারে এই ভাষণের উদ্দেশ্য ছিল মুক্তি ও স্বাধীনতার ব্যাপারে বাঙালিকে পুনঃজাগ্রত করা, গোষ্ঠীভুক্ত করা আর ব্যাপক সম্পৃক্ততা দিয়ে তাদেরকে আত্মত্যাগের বাসনায় উন্মাদ ও উদ্বুদ্ধ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করা এবং স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু মুক্তি এখনও বহু দূরে। মুক্তি বলতে বঙ্গবন্ধু যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি বুঝিয়েছেন, তাও ভাষণে অনুল্লেখ ছিল না। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তাই আমাদেরকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে দুঃসাধ্য অর্জনে উৎসাহিত করছে ও করবে।

লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শিক্ষাবিদ

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধুর মানব সেবার সিদ্ধান্ত ও ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের পথচলা

লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির (বীরপ্রতীক)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর শুভলগ্নে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি এই মহান নেতার দূরদর্শিতা, মানবপ্রেম, মেধা ও মননের। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী দিকনির্দেশনার জন্যই নিপীড়িত ও অধিকারবঞ্চিত বাঙালিরা ১৯৭১ সালে শক্তিশালী পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। তাই তাঁর প্রচণ্ড মমত্ববোধ ও ভালোবাসা ছিল বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে তিনি মানবতার কল্যাণে এমন একটি সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যার দ্বারা আন্তর্জাতিক দরবারে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের যোগদান ও অবদান আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। আন্তর্জাতিক পরিসরেও আমাদের শান্তিরক্ষা মিশনগুলো পরিচিতি ও সুখ্যাতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী অনেক বছর যাবৎ এই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও বাংলাদেশ পুলিশ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত আছে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সবসময়ই প্রতিটি দুর্যোগে দেশ ও বিদেশে নিজেদের মানবিকতা, দক্ষতা, নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে কার্যসম্পাদন করে বিশ্বে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। শান্তিরক্ষা মিশনসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১৯৯০ সালে অপারেশন কুয়েত পুনর্গঠন (ওকেপি), ২০০৪ সালে অপারেশন সার্ক বন্ধন (শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের সুনামি), ২০০৮ সালে মিয়ানমারে ঘূর্ণিঝড় নার্গিস, ২০১০ সালে হাইতির ভূমিকম্প ইত্যাদি। তাছাড়া জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহ যেমন : ইউনিমগ, আনগোম্যাপ, আনট্যাগ, মিনারসো, ইউনিকম, ইউএনজিসিআই, ইউনামিক, আনপ্রোফর, আনট্যাক, ইউনোসোম, অনুমোজ,

ইউনোমগ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গ বিশেষ অবদান রাখেন।

১৯৭৩ সালের ৬ অক্টোবর শনিবার দুপুর ২টার ঠিক পরেই শুরু হয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ। তাছাড়া এই যুদ্ধ ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ, রমজান যুদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন নামেও পরিচিত। ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়। নিপীড়িত মানবতার জন্য বঙ্গবন্ধু সর্বদাই চিন্তিত থাকতেন এবং তাঁদেরকে সহায়তা করতে সচেষ্ট ছিলেন বলে তিনি আরবদের ন্যায়সংগত এই যুদ্ধে আরব দেশসমূহকে সমর্থন জানান। তিনি শুধু নৈতিক সমর্থন নয়, সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সেখানে সামরিক চিকিৎসক দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, তখন পর্যন্ত অনেক আরব দেশ বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করেনি, তদুপরি মানবিক দিক বিবেচনা করে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও বঙ্গবন্ধু সাহায্য প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ছিল সাহসী ও সুদূরপ্রসারী। উল্লেখ্য যে, ওই যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে খুবই অল্পসংখ্যক মুসলিম দেশ ক্ষমতাশীল আমেরিকা, ইউরোপ ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এই ধরনের সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। বঙ্গবন্ধু পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালক ও উপসচিব মোহাম্মদ জমিরকে ডেকে শান্তিরক্ষা মিশনে প্রেরণের বিষয়ে প্রশাসনিক সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও টিমের সাথে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। সেনাপ্রধান ব্রিগেডিয়ার কে এম সফিউল্লাহ ও ডাইরেক্টর মেডিক্যাল সার্ভিস কর্নেল খুরশিদ উদ্দিন আহমেদকে ডেকে বঙ্গবন্ধু বলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে আরব ও মুসলমান দেশগুলো আজ বিশাল বিপদের সম্মুখীন, এই সময়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের মানবিক কর্তব্য। যদিও আমাদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে তবুও অত্যাচারিত ভাইদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য। কর্নেল খুরশিদ বঙ্গবন্ধুর কথায় আবেগতাড়িত হলেন। উল্লেখ্য, কর্নেল খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি ছিলেন। তখন তিনি ছিলেন ক্যাপ্টেন ও তাঁর আসামি নম্বর ছিল ৩৪। মামলা চলাকালীন জিজ্ঞাসাবাদের সময় পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই তাঁর ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল। সেই সময় থেকেই বঙ্গবন্ধু খুরশিদ উদ্দিনকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি খুরশিদের দিকে তাকিয়ে স্নেহভরে বললেন : খুরশিদ, তোমাকে আমি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য এই দুরূহ কাজে পাঠাচ্ছি। খুরশিদ উদ্দিন তখন বঙ্গবন্ধুকে স্যালুট দিয়ে বললেন : স্যার, আমি আমার জীবন দিয়ে

হলেও আপনার প্রদত্ত এই মিশন সফলভাবে বাস্তবায়ন করব। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু সেনাসদরের ৭ জন অফিসার ও ২১ জন সৈনিককে এই কাজের জন্য নিয়োজিত করলেন এবং দ্রুত প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন। মিশনে যাওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু ২৮ জনের দলকে তাঁর অফিসে আমন্ত্রণ করে তাঁদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়ে বললেন, আপনাদের সফল কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভর করছে অত্যাচারিত মানুষের কল্যাণ এবং বাংলাদেশের সম্মান ও ভবিষ্যতের অনেক সিদ্ধান্ত। জাতির পিতার এই ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হয়েছিল। মেডিক্যাল দলের সাথে মিসর ও সিরিয়ার জন্য ৪ টন চা-পাতা প্রেরণ করা হয়।

১৯৭৩ সালের ১৯ অক্টোবর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দলটি প্রথম কোনো বৈদেশিক অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ত্যাগ করে। দলে ছিলেন কর্নেল খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ, পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালক ও উপসচিব মোহাম্মদ জমির, মেজর আমির আলী, মেজর শফিউল ইসলাম, ক্যাপ্টেন শাহজাহান, ক্যাপ্টেন নুর হোসেন, ক্যাপ্টেন রেজাউল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মফিদুল ইসলাম প্রমুখ। ১৯ অক্টোবর সকাল ১০টায় ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে বোয়িং ৭০৭ বিমানে সিরিয়া যাত্রা করে বাংলাদেশ দল।

পরিকল্পনা অনুযায়ী দলটির প্রথমে বাগদাদে অবতরণ করার কথা ছিল, কিন্তু সেখানে ইসরায়েলিদের বিমান আক্রমণ হচ্ছিল। তাই ঢাকা থেকে উড্ডয়নের পর দুবাই থেকে জ্বালানি নিয়ে বিমানটি সিরিয়ার উদ্দেশে উড্ডয়ন করে। দামেস্ক ও বৈরুত বিমানবন্দরেও ইসরায়েলি আক্রমণের কারণে অবতরণ করা সম্ভব হয়নি বলে ব্রিটিশ পাইলট ক্যাপ্টেন ম্যাকিনটশ বিমানটি নিয়ে ককেশাস পর্বত, মাল্টা দ্বীপ, ইসরায়েল আর সিরিয়া পেরিয়ে লিবিয়ায় অবতরণের অনুমতি না থাকলেও পাইলট SOS সিগন্যাল দিয়ে বিমানটিকে রাতে লিবিয়ার বেনগাজিতেই অবতরণ করালেন। কেননা মাত্র ৩০ মিনিট চলতে পারে এই পরিমাণ জ্বালানি ছিল বিমানে। বাংলাদেশ সেনাদল বহনকারী বিমানটির লিবিয়ায় অবতরণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল। কিন্তু ঘটনার গভীরতা অবগত হওয়ার পর লিবিয়া কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ দলকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। লিবিয়া কর্তৃপক্ষের সহায়তায় দলটি পরদিন ২০ অক্টোবর দুপুরে মিডলইস্ট এয়ারলাইনসের বিমানে করে বৈরুতে যাত্রা করে বৈরুত বিমানবন্দরে পৌঁছার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত দলকে অভ্যর্থনা জানায়। রাত ১০টায় নির্ধারিত বাসে করে দলটি লেবানন-সিরিয়া বর্ডার চেকপোস্ট পেরিয়ে দামেস্কের দিকে যাত্রা করে এবং ভোরে দামেস্ক নগরীর কাছে পৌঁছে। তখন

চারদিকে ছিল যুদ্ধ অবস্থা। নগরীতে প্রবেশের কিছুক্ষণ পরই সাইরেন বেজে ওঠে এবং ইসরায়েলের ৫-৬টি যুদ্ধবিমান দামেস্কে আক্রমণ চালায়। সেদিন ২১ অক্টোবর সিরিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. মাদনি আল খিয়ামি বাংলাদেশ দলকে দামেস্কে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানান।

সিরিয়ার ৯ ডিভিশনের পেছনে দামেস্ক থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে দারুসসালামে বাংলাদেশ দলকে মোতায়েন করা হয়, যেখানে দ্বিতল একটি বালিকা বিদ্যালয়ে বাংলাদেশ দল অস্ত্রোপচার সুবিধাসহ একটি ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করে। বাংলাদেশ দল ২২ নভেম্বর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে। এই হাসপাতালে ৩০ দিনে কয়েক হাজার সেনা সদস্য, মুজাহিদ, আহত গ্রামবাসীকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। মেডিক্যাল টিমের সদস্যরা নিরলসভাবে যুদ্ধাহতদের সেবা করেছেন। সিরিয়ার রণাঙ্গনে বাংলাদেশ দল অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে বলে দলটি সিরিয়ায় বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। আরব বিশ্বের বেশ কিছু সংবাদপত্রে বাংলাদেশ দলের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করা হয়। যুদ্ধ শেষে দামেস্কের উমায়েদ মসজিদের (Great Mosque of Damascus নামেও পরিচিত) গ্র্যান্ড মুফতি খুতবার সময় বাংলাদেশিদের এই অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই অভিযানের তাৎপর্য ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট যুদ্ধের ময়দান থেকে ২২ নভেম্বর লেবাননের রাজধানী বৈরুতে আসে। ২৪ নভেম্বর সিরিয়ার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বৈরুত বিমানবন্দরে বাংলাদেশ দলকে আন্তরিক বিদায় জানান। আরবদের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন ও দৃঢ় অবস্থান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৩ সালের শেষে বাংলাদেশ আরবদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং তাদের সাথে সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। তারপর ১৯৭৩ সালের শেষ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের ১৫টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশের সমর্থন ও অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে মিসরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত বাংলাদেশকে এক রেজিমেন্ট ট্যাংক উপহার দেন।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, ক্ষণজন্মা নেতা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শিতা, কূটনৈতিক পরিকল্পনা, সময়োপযোগী সাহসী সিদ্ধান্ত ও সুযোগ্য নেতৃত্বের ফলেই আজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ সম্মানজনক অবস্থানে আছে। বাংলাদেশ অদ্যাবধি জাতিসংঘের

অধীনে ৫৪টি শান্তিরক্ষা মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে যার মধ্যে মোট ১,৭৫,০৮৯ জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে ৬,৪১৩ জন সদস্য শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করছেন। শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করার এই যাত্রা শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৩ সালে মাত্র ২৮ জন শান্তিরক্ষীর দ্বারা।

লেখক : স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত ও ভারতের পদ্মশ্রী পদকপ্রাপ্ত অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশ

ইমদাদুল হক মিলন

সবুজ মাঠ ভেঙে দৌড়াচ্ছে এক কিশোর। হাতে লম্বা সরু বাঁশের মাথায় বাঁধা বাংলাদেশের পতাকা। বিকেলের রোদে ঝলমল করছে পতাকা। দৌড়ের তালে পতপত করে উড়ছে। গভীর আনন্দ উত্তেজনায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে কিশোর। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

এই ঘটনা ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের। বিক্রমপুরের এক গ্রামের মাঠ। বাংলাদেশের বহু অঞ্চল ১৬ তারিখের আগেই শত্রুমুক্ত হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানি মিলিটারিরা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বেদম মার খেয়েছে। মরে ভূত হয়েছে হাজার হাজার। আহত হয়েছে প্রচুর। যারা বেঁচে গেছে তারা কোনো রকমে পালিয়ে গেছে ঢাকায়। রাজাকার, আলবদর, আলশামসদেরও একই অবস্থা। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়েছে অনেকে, অনেকে গাঢাকা দিয়েছে। যারা ধরা পড়েছে তারা টের পাচ্ছে ৯ মাসে যে অত্যাচার বাংলার মানুষের ওপর করেছে তার মাসুল কীভাবে দিতে হয়।

যে মাঠে দৌড়াচ্ছিল কিশোর সেই এলাকা শত্রুমুক্ত। সূর্য অস্ত যাচ্ছে মাঠের ওপারে। একটা মাত্র রাত। তারপর আসছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। যে রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, যেখান থেকে ঘোষণা দিয়েছিলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' সেই মাঠেই আত্মসমর্পণ করবে নিয়াজি বাহিনী। সেই মাঠেই জন্ম নেবে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আগামীকাল বাংলার আকাশে উঠবে স্বাধীনতার সূর্য। সেই আনন্দক্ষণে ৯ মাসে ঘটে যাওয়া কত বেদনার কথা মনে পড়বে স্বজন হারানো বাঙালির। কত নৃশংসতার ঘটনা মনে পড়বে! কত ত্যাগ, নারীর সম্ভ্রম আর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হলো এই বাংলা, সেই সব কথা মনে পড়বে।

২৫ মার্চের রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পাকিস্তানিরা শুরু করেছিল গণহত্যা। ঢাকা শহরকে চার ভাগে ভাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই রাতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলাকার ইকবাল হল আর জগন্নাথ হলের ছাত্রদের একত্র করল। জগন্নাথ হলের সামনে ছাত্রদের দিয়ে বিশাল গর্ত করাল। তাদের সবাইকে হত্যা করে ওই গর্তে মাটি চাপা দিল। ইউনিভার্সিটির টিচারদের মারল, সাধারণ কর্মচারীদের মারল। আশপাশের বস্তিগুলোতে আগুন দিল, শহিদ মিনার গুঁড়িয়ে দিল। ঢাকা শহরের চারদিক হয়ে উঠল দোজখ। শুধু আগুন আর আগুন। শুধু গুলির শব্দ, কামানের শব্দ।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনে বাঙালি পুলিশরা প্রতিরোধ গড়েছিল। প্রচুর বাঙালি পুলিশ হত্যা করল ওরা। ইপিআর জোয়ানদেরও একই অবস্থা। সদরঘাট টার্মিনালে রাতের লঞ্চে চড়ার আশায় যারা বসেছিল তাদের সবাইকে মেরেছে। রাস্তায় শুধু লাশ আর লাশ। পিচের কালো রাস্তা রক্তে লাল। জগন্নাথ কলেজের গেটের কাছে লাশের স্তূপ। নারায়ণগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডের কাছে লাশ। পরদিন সকাল পর্যন্ত আগুন জ্বলেছে কোথাও কোথাও।

২৭ মার্চ দুই ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল। সেই ফাঁকে ঢাকার মানুষ বুড়িগঙ্গা পার হয়ে জিনজিরা, কেরানীগঞ্জ এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিল। এপ্রিলের ২ তারিখে ফজরের সময় জন্তুরা ওপারে গিয়ে আক্রমণ চালাল ঘুমন্ত মানুষের ওপর। হাজার হাজার মানুষ মেরে ফেলল। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে কত যে বধ্যভূমি! ঢাকার রায়েরবাজারে, মিরপুরে। ৯টা মাসজুড়ে মানুষ মেরে ট্রাক ভর্তি করে নিয়ে রায়েরবাজারে ফেলা হতো, মিরপুরে ফেলা হতো। বিহারিরা যোগ দিয়েছিল পাকিস্তানিদের সঙ্গে। এক যুবককে বাঁশে গেঁথে নিয়ে এসেছে নবাবপুরে। মায়ের কোল থেকে বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে আকাশে ছুড়ে দিয়েছে। তলোয়ার কিংবা বর্শা উঁচিয়ে ধরেছে সেই শিশুর দিকে। শিশুটি গেঁথে গেছে তলোয়ারে, বর্শায়।

চুকনগরের কথা বলি। চুকনগর হচ্ছে খুলনার ডুমুরিয়া থানায়। ওদিক দিয়ে ভারতে ঢুকে যাওয়া সহজ। প্রাণ বাঁচাতে মানুষ তখন বর্ডার পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছিল। প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে চলে গিয়েছিল ভারতে।

মে মাসের ২০ তারিখ। বহু মানুষ চুকনগরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বাজারের ভেতর দিয়ে ভারতে ঢুকে যাবে। বর্ডার খুলে দিয়েছে ভারত সরকার। খবর পেয়ে পাকিস্তানি সেনারা গেল সেখানে। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা। চার ঘণ্টায় ২০ হাজার লোককে মারল। চুকনগর বাজার হয়ে

গেল মৃত্যুপুরী। পাশের নদীটির পানি লাল। হাজার হাজার লাশের মধ্যে পড়ে আছে রক্তে ভেসে যাওয়া মৃত মা। কোলের শিশুটি অবুঝ। সে বেঁচে আছে। মায়ের বুকের দুধ পান করার চেষ্টা করছে...।

প্রতিদিন নানা বয়সী মেয়েদের ধরে আনা হতো রাজারবাগ পুলিশ লাইনে। বিবস্ত্র করে আটকে রাখা হতো। উপর্যুপরি তাদের ওপর চলত নির্যাতন। মেয়েদের আর্তনাদে কাঁপতে থাকত আকাশ-বাতাস। মেয়েদের বিবস্ত্র শরীর সিলিংয়ের সঙ্গে টাঙানো হতো। মাথা নিচের দিকে, পা ওপরের দিকে। ওই অবস্থায় মারা গেছে কত মেয়ে!

যুবতীর নাম ভাগীরথী। বয়স আঠারো-উনিশ। পিরোজপুরের বাঘমারা কদমতলা গ্রামে বাড়ি। মে মাসের এক বিকেলে ট্রাকভর্তি মিলিটারি গেল সেই গ্রামে। পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দিল, যাকে পেল তাকেই হত্যা করল। ভাগীরথীকে নিয়ে এলো ক্যাম্পে, তারপর পাশবিক অত্যাচার চালাল। দিনের পর দিন চলল এই নির্যাতন। ভাগীরথী একটা সময়ে জন্তুদের আস্থা অর্জন করলেন, ভালো রান্নার হাত, তাদের রান্না করে খাওয়াতেন। ভেতরে তাঁর আগুন জ্বলছে। প্রতিশোধ নেবেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করলেন। তাঁদের গ্রামে জন্তুদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ৪৫ জনের মধ্যে ৪০ জনকেই মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে খতম করালেন। তারপর উধাও হয়ে গেলেন ভাগীরথী। তবে শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারলেন না। ধরা পড়ে গেলেন। ভাগীরথীকে ওরা পাশাপাশি দুটি জিপের সঙ্গে বিবস্ত্র করে বাঁধল। দুই জিপে দুই পা, দুই হাত। দুই জিপ দুই দিকে চালিয়ে দিল। ভাগীরথী কাগজের মতো ছিঁড়ে গেল...।

চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে হাজার হাজার বাঙালিকে ধরে এনে হত্যা করা হতো। পাহাড়তলী হয়ে হাটহাজারীতে যায় ট্রেন। ট্রেন থেকে নামিয়ে জবাই করা হতো বাঙালিদের। ওই এক জায়গায়ই হত্যা করা হয়েছিল ১০ হাজারেরও বেশি বাঙালি। রমজান মাসের ২০ তারিখে ফয়'স লেক এলাকায় শত শত গলা কাটা মানুষের লাশ পড়েছিল। লেকের উল্টো দিকের পাহাড়ের তলায় শুধু যুবতী মেয়েদের লাশ। তারা প্রায় প্রত্যেকেই গর্ভবতী। ১০৮২টা লাশ ছিল সেখানে। এ রকম হাজার হাজার নৃশংস ঘটনা একাত্তরের ৯ মাসজুড়ে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর থেকেই তাঁর কথামতো ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলেছিল বাঙালিরা। ২৫ মার্চের পর থেকেই বাঙালি জাতি শুরু করেছিল মুক্তিযুদ্ধ। ধীরে ধীরে সেই যুদ্ধ রূপ নিল গণযুদ্ধে। পাকিস্তানি পা চাটার দল ছাড়া প্রত্যেক বাঙালি হয়ে উঠল যোদ্ধা। দেশের স্বাধীনতার জন্য যার যা কিছু আছে, বঙ্গবন্ধুর কথামতো তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে লাগল।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কুষ্টিয়া দখল করেছিল। ৩০ মার্চ ভোর ৪টায় বাঙালি বীর সৈনিকেরা, পুলিশ ও আনসার আর ছাত্র-জনতা মিলে কুষ্টিয়ার প্রতিটি মিলিটারি ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়। বাঙালি সৈনিক, পুলিশ ও আনসারের সঙ্গে লাঠি-বল্লম নিয়ে যুক্ত হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। সেদিন বিকেলের মধ্যে পাকিস্তানিদের সব ঘাঁটি মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে আসে। বাকি ছিল শুধু কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের ঘাঁটিটি। দুই দিন এভাবে যুদ্ধ চলার পর ঘাঁটি ছেড়ে পালাতে শুরু করল পাকিস্তানি মিলিটারিরা। এলাকার সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তা কেটে রেখেছিলেন। রাস্তার কাটা অংশে চাটাই ফেলে তার ওপর আলকাতরা এমনভাবে মাখিয়ে রেখেছিলেন, দেখে বোঝার উপায় নেই কাটা রাস্তা। পাকিস্তানিদের ট্রাক আর জিপ সেই সব কাটা রাস্তায় পড়ে উল্টে গেল। মুক্তিযোদ্ধারা গুলির পর গুলি চালিয়ে পাকিস্তানিদের মারতে লাগলেন। যারা এই আক্রমণ থেকে বাঁচল তারা ছড়িয়ে গেল চারপাশের গ্রামে। একজন পাকিস্তানি সৈনিকও সেখান থেকে জীবিত ফিরতে পারেনি। সাধারণ মানুষই তাদের মেরেছিল।

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ আর সৈন্য ফেনীর ওপর দিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল পাকিস্তানিদের। মুক্তিযোদ্ধারা এই অঞ্চলে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তাদের প্রতিরোধে চুরমার হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান বাহিনী। ডিসেম্বরের ৬ তারিখে বীর মুক্তিযোদ্ধারা ফেনী বিলোনিয়া মুক্ত করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের এই যুদ্ধের কৌশল এখন পৃথিবীর বিভিন্ন সামরিক কলেজে পড়ানো হয়।

আমাদের সাত বীরশ্রেষ্ঠ তাঁদের জীবনের বিনিময়ে বিশাল অবদান রেখে গেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতায়। কত বীরত্বের ঘটনা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে। বাংলার দামাল ছেলেরা আর সর্বস্তরের মানুষ যে যার জায়গা থেকে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কিছু দেশদ্রোহী ছাড়া বাংলার প্রত্যেক মানুষ তখন মুক্তিযোদ্ধা।

পাকিস্তানিদের ভাষায় পূর্ব পাকিস্তানে কিছুই ঘটছে না প্রমাণ করার জন্য পৃথিবীর বড় বড় দেশের সাংবাদিকদের ডেকে আনা হয়েছে। ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে রাখা হয়েছে তাঁদের। পরদিন সকালবেলা শান্তিপূর্ণ(!) ঢাকা শহর দেখাতে নেওয়া হবে। বাঙালি গেরিলা যোদ্ধারা গ্রেনেডে গ্রেনেডে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের দেয়াল ধসিয়ে দিলেন। মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল এই ঘটনা। বিশ্ব জেনে গেল কী ঘটছে পূর্ব পাকিস্তানে! এইভাবে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার দিকে এগোচ্ছিল বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ।

আগস্ট মাসের ৯ তারিখ। টাঙ্গাইল এলাকার ধলেশ্বরী নদীর তীরে পাকিস্তানিদের সাতটা জাহাজ এসে নোঙর করল। জাহাজগুলো অস্ত্রবোঝাই। বগুড়ার ফুলছড়ি ঘাটে খালাস করা হবে। সেখান থেকে রংপুর আর সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে নেওয়া হবে। মুক্তিযোদ্ধারা মেজর হাবিবের নেতৃত্বে এই জাহাজগুলো দখল করেছিলেন। ফলে বিপুল অস্ত্র এসেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আরেক বিশাল অভিযানের নাম 'অপারেশন জ্যাকপট'। কর্ণফুলীর জেটিতে অস্ত্রবোঝাই বড় বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল। মধ্য আগস্টে আমাদের ৬০ জন নৌ কমান্ডো তিনটি দলে ভাগ হয়ে, রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে সাঁতরে সেই সব জাহাজের কাছে পৌঁছালেন। ডুব দিয়ে দিয়ে জাহাজের গায়ে লিম্পেট মাইন লাগিয়ে দিলেন। তারপর যে রকম নিঃশব্দে এসেছিলেন সে রকম নিঃশব্দে ফিরে গেলেন। রাত ১টা ৪০ মিনিটে শুরু হলো বিস্ফোরণ। একের পর এক বিস্ফোরণ। পাকিস্তানি সৈন্যদের জন্য নিয়ে আসা অস্ত্রবোঝাই বিশাল বিশাল জাহাজ একটার পর একটা কর্ণফুলীতে ডুবতে লাগল। এইভাবে এলো আমাদের স্বাধীনতা।

১৬ ডিসেম্বরের দুই দিন আগে জাতিকে মেধাশূন্য করার জন্য কুটিল পাকিস্তানিরা রাজাকার, আলবদরদের সহায়তায় শেষ আঘাত হানল। বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার জন্য হত্যা করল বহু বুদ্ধিজীবীকে। তারপর ১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্নে মাথা নিচু করে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিয়াজির নেতৃত্বে আত্মসমর্পণ করল। স্বাধীন হলো প্রিয় বাংলাদেশ।

সেই চূড়ান্ত আনন্দের ক্ষণে বাঙালি জাতির একটিই অপেক্ষা, আমাদের প্রিয় নেতা কবে ফিরে আসবেন তাঁর স্বাধীন বাংলাদেশে? বাংলার আকাশ অপেক্ষা করতে লাগল বঙ্গবন্ধুর জন্য, বাংলার মাটি অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর ১০ জানুয়ারি ১৯৭২, বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন তাঁর স্বাধীন বাংলাদেশে। মুহূর্তে আলোয় আলোয় ভরে গেল বাংলাদেশ। স্তব্ধ হয়ে থাকা নদী বইতে লাগল নিজের ছন্দে। পাখিরা গান ধরল। ফুলেরা ফুটে উঠল। ফসলের মাঠ পূর্ণ হলো। স্বাধীন দেশের মায়াবী হাওয়া বইতে লাগল। আর বাংলাদেশের হৃদয়ে বেজে উঠল 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'।

লেখক : কথাসাহিত্যিক ও সম্পাদক, কালের কণ্ঠ

জন্ম যদি তব বঙ্গে

জাফর ওয়াজেদ

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় চৈত্রদিনের গান, বসন্তকালের আলো-হাওয়া প্রবাহিত তখন, আর এরই মাঝে আবির্ভূত হলেন বাংলার সহস্র বর্ষের সাধনার নাম–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সাধিত সেই ধন্য পুরুষের জন্মশতবর্ষে বাঙালি জাতি নতুন উদ্দীপনায় তাঁরই নির্দেশিত পথে মুক্তির রথে চলেছে এগিয়ে। জাতি পালন করছে তার পিতার জন্মশতবর্ষ, মুজিববর্ষ। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনটি পালিত হয় জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে।

বঙ্গবন্ধু শুধু একটি নাম নন, হলেন একটি জাগ্রত ইতিহাস। একটি স্বাধীন জাতিসত্তার অপরিমেয় অহংকার, বর্ণিল ঐশ্বর্য। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি এবং স্বাধীনতা একসূত্রে গাঁথা। বাংলাদেশের অস্তিত্বস্পর্শী অমর নাম। ন্যায়, সত্য, কল্যাণ এবং আত্মমুক্তির পক্ষে সোচ্চার উদার হৃদয় মহান মানুষ। কোনো প্রকার সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প তাঁকে স্পর্শ করেনি কখনো। বাঙালিত্ব ছিল তাঁর অহংকার। এই বাঙালিকে তিনি জাগিয়ে তুলেছেন রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক দক্ষতায়। কোটি কোটি মানুষের ইচ্ছার অনিন্দ্য কুসুম ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি। তাঁরই আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধজয়ের রক্তাক্ত অধ্যায়ে বাঙালি জাতি। সৃষ্টি করেছিল ইতিহাস। জাতির শাণিত শিরায় অকুতোভয় সাহস ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। দুঃসময়, হতাশার সব বাধার দেয়াল ভেঙে দীর্ঘ পরাজিত, শোষিত, বঞ্চিত জাতিকে স্বাধীনতার সূর্যস্নানে স্নাত করিয়েছেন। তাই তো প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম উচ্চারিত হয় ত্যাগের উজ্জ্বল মহিমায় সিক্ত একটি নাম–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজের জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। অসমাপ্ত সেই জীবনী। ঘাতকের উদ্যত সঙ্গিন সেই রচনা সমাপ্ত হতে দেয়নি। একাত্তরের পরাজিত শক্তি এবং তাদের দেশি-বিদেশি এজেন্টরা বাঙালিত্বের চেতনা এবং স্বাধীনতার সব অর্জনকে নস্যাৎ করে দিতে বঙ্গবন্ধুর ওপর আঘাত

হানে। তাঁকে পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট দস্যুর মতো রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র অবস্থায় পরিজনসহ হত্যা করা হয়েছিল। এ যে জাতির জন্য কত বড় গ্লানি, অপমান ও লজ্জার কথা, তা অবর্ণনীয়। ইতিহাসের চাকা, সভ্যতার চাকাকে নিষ্পেষিত করে ঘাতকরা বাঙালি জাতির জীবনে সৃষ্টি করেছিল ট্র্যাজেডি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ একটি নাম, একটি ইতিহাস। বাঙালি জাতির সংগ্রামী জীবনধারার প্রতিটি সিঁড়িতে ছিলেন তিনি এককভাবে অগ্রসরমান। সবাইকে পেছনে রেখে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন একটি পশ্চাৎপদ ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলার কঠিন কাজটি সম্পাদনে। একটি জাতির জাগরণ, একটি জাতির অভ্যুত্থান, একটি রক্তাক্ত একাত্তর এবং একটি স্বাধীনতা–সবকিছুই সম্ভব হয়েছে একক নেতৃত্বে। আর এই যুগান্তকারী কালজয়ী নেতাই হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি যাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব দিয়ে সম্মানিত-সমৃদ্ধ করেছে নিজেদের। জাতি জানে, এসব অর্জন সম্ভব হয়েছিল একজন শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিশাল ব্যক্তিত্বের কারণে। ছিলেন দূরদর্শী, দুঃসাহসী, আপসহীন। সততা, কর্মনিষ্ঠতা, কর্মকুশলতা–সবকিছু মিলিয়ে এক অতুলনীয় মানবে পরিণত হয়েছিলেন শেখ মুজিব। হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি জাতির জীবনে আপন দ্যুতিতে প্রোজ্জ্বল এক অবিনাশী ধ্রুবতারা। সহস্র বছরের সাধনা শেষে বাঙালি জাতি পেয়েছে তার মহানায়ককে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকে। নিরন্ন, দুঃখী, অভাবী, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত জাতির দুর্ভোগ মোচনে নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে অগ্রসেনানীর দায়িত্ব পালন করেছেন। দাঙ্গাপীড়িত বাঙালি-অবাঙালিকে রক্ষায় জীবনবাজি রেখে এগিয়ে গিয়েছেন। লোভ-মোহের ঊর্ধ্বে ছিলেন বলেই শাসকের নানা প্রলোভন উপেক্ষা করে দুঃসাহসে প্রতিবাদ-প্রতিরোধী হয়েছেন। দিনের পর দিন কেটেছে কারাগারে। লৌহকপাটের অন্তরালে কখনো ভেঙে পড়েননি। হতাশা গ্রাস করেনি। শাসকদের সমঝোতার পথকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভোগ, বিলাস, ক্ষমতার অংশীদারিত্ব ইত্যাদিকে তুচ্ছজ্ঞান করে বাঙালি জাতির ভাগ্যোন্নয়নের জন্য আপসহীনভাবে লড়াই করে গেছেন শেষ দিন পর্যন্ত। ঘুমন্ত জাতির প্রতিটি শিরা-উপশিরায় রক্তপ্রবাহের উত্তাপ বঙ্গবন্ধু ধারণ করতেন। তাই জাতিকে নিজের মতো করে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। হাজার বছর ধরে পরাধীন-পর্যুদস্ত থেকে থেকে যে জাতিটি আধমরা থেকে পুরো মরায় পরিণত হচ্ছিল

ক্রমশ; বজ্রহুংকারে শুধু নয়, আদরে-সোহাগে প্রাণের প্রবাহে স্পন্দন তুলে একটি বিন্দুতে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু স্কুলজীবন থেকেই স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক ছিলেন। হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে বেড়ে উঠেছেন। তাই জন্মগতভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় লালিত ছিলেন। ধর্মীয় গ্রন্থ কোরআন পাঠ করেছেন। কারাগারের জীবনে এবং পাকিস্তানি কারাগারে একাত্তরের ৯ মাস বন্দিজীবনকালে নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করতেন। কিন্তু কখনোই ধর্মান্ধ ছিলেন না। তাই ইংরেজি ভাষা ছাত্রজীবনেই চর্চা করেছেন। এ ভাষায় পারদর্শী ছিলেন বলেই এবং মেধাবী হিসেবে সে সময়ের কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিলেন। আইন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা চলাকালেই বহিষ্কৃত হন। অপরাধ–বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবিদাওয়ার প্রতি সমর্থন দান।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে 'নেতাজি সুভাষ বোসের' সান্নিধ্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্থানীয় জনগণের সমস্যা সমাধানের দাবিতে তিনি যখন অগ্রসরমাণ, তখন রাজনৈতিক গণ্ডির পরিধিতে ক্রমশ প্রবিষ্ট হতে থাকেন। গোপালগঞ্জে পড়াকালে যে স্বাধীনচেতা মনোভাব তৈরি হয়েছিল, কলকাতায় তা আরও প্রসারিত হয়। সেখানে ছাত্র আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৩৯ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্য তাঁকে রাজনীতিতে সক্রিয় করে তোলে। সাহস ও যোগ্যতায় তিনি সমকালীন অনেককে ডিঙ্গিয়ে পাদপীঠে চলে আসেন। তখনকার সময়ের রাজনীতিতে শেখ মুজিব তাঁর গুরু সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগে যোগ দেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর দেখেন পশ্চিম পাকিস্তানিরা শাসনক্ষমতায় সর্বত্র। স্পষ্ট হয় যে, এক ব্রিটিশ শোষণ থেকে মুক্তি পেয়ে পাকিস্তানি বেনিয়া শোষকদের হাতে পড়েছে বাঙালি। রাষ্ট্রক্ষমতার কোথাও বাঙালির প্রবেশাধিকার নেই। এমনকি নিজেদের শাসন করার অধিকারটুকুও পাকিস্তানি শাসকরা কবজা করে রেখেছে। উপলব্ধি হলো, পূর্ববঙ্গবাসী দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান–মানুষ এই মৌলিক অধিকারগুলো থেকেও বঞ্চিত। পূর্ববঙ্গের কৃষকের উৎপাদিত পাটসহ অন্যান্য পণ্য বিদেশে রফতানি করে যে আয় হয়, তার পুরোটাই পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন ও শিল্পায়নে ব্যয় হচ্ছে। পূর্ববঙ্গের মানুষের জীবন আরেক পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ছে। কৃষিজীবী,

শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার উৎসগুলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করলেন যে, পূর্ব বাংলার মানুষ অনুভব করে যে, পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ বানানো হয়েছে। পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মোহমুক্তি ঘটতে শেখ মুজিবের সময় লাগেনি। তাই মুসলিম লীগবিরোধী নতুন রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ যখন প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন একজন নেতারূপে দেখা দিলেন শেখ মুজিব। গড়ে তুললেন শক্তিশালী বিরোধী দল। বইয়ে দিলেন দেশজুড়ে আন্দোলনের জোয়ার। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারে মুসলিম লীগ যে পন্থা নিয়েছে, শেখ মুজিবসহ অন্য নেতারা এর বিরোধিতা করেন। শেখ মুজিব ক্রমশ পূর্ববঙ্গে তাঁর নেতৃত্ব ও সংগঠন সংহত করলেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের কথা বললেন। তিনি উপস্থাপন করলেন ছয় দফা। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা শাসক তার জবাব দিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তৈরি করে। এতেই আগুনে ঘি পড়ল। পূর্ব বাংলার মানুষ শেখ মুজিবকেই একমাত্র স্বার্থরক্ষক হিসেবে দেখলেন। ছাত্ররা ছয় দফাকে এগারো দফায় অন্তর্ভুক্ত করে নামে আন্দোলনে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে সামরিক শাসক আইয়ুব খান বিদায় নিলেন। শেখ মুজিব জেল থেকে মুক্তি পেলেন এবং হলেন বঙ্গবন্ধু। অর্থাৎ বাংলার বন্ধু।

বঙ্গবন্ধু বুঝতেন, পাকিস্তানিদের সঙ্গে আর বসবাস সম্ভব নয়। জোড়াতালি দিলেও মেলানো যাবে না। সুতরাং, ছয় দফা দাবিকে সামনে রেখে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু এক দফা ঘোষণা করলেন এবং তা স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম। সারা দেশ গর্জে উঠল সেই ডাকে। পাকিস্তানের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বাংলাদেশ। বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে গেল 'পূর্ব পাকিস্তান' নামটি। উঠে এলো 'বাংলাদেশ' নামক একটি নতুন রাষ্ট্র। বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনকালে পুরো জাতি যে একটি বিন্দুতে এসে স্থির-প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে স্বাধীনতা। পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধিকারের দাবি থেকে স্বাধীনতার দাবিতে পৌঁছে গেছে ততদিনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে। পশ্চিমা সংবাদপত্রে বলা হলো 'ভয়েস অব বেঙ্গল'। সত্যিকার অর্থেই বঙ্গবন্ধু তখন বাংলার কণ্ঠস্বর। ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি পুরো জাতিকে তাঁর স্বাধীনতার জন্য করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিলেন। এমন পূর্বাভাসও দিলেন, 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তবে তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।' ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র মানুষের ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বাঙালি নীরবে আক্রমণ মেনে নেয়নি। বঙ্গবন্ধু 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে' তোলার জন্য বলেছিলেন। সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিব। পাকিস্তানিদের আক্রমণের মুখে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। সেই ঘোষণা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল।

স্বাধীন বাংলাদেশের পরিস্থিতি নাজুকই ছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অস্ত্রের ব্যবহার নাগরিক সমাজকে বদলে দিয়েছিল। রাজনীতির ধরনটাই পাল্টে দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম এবং পরিণামে সবকিছুর মূল্য বেড়ে গেল। দেশের প্রধান রফতানি পণ্য পাটের চাহিদা কমে গেছে। মানুষের প্রত্যাশা পূরণের সুযোগ তখন ঘটছিল না। দেশি ও বিদেশি ষড়যন্ত্র শুরু হয় বাংলাদেশকে ঘিরে। বামপন্থি ও দক্ষিণপন্থিরা আদাজল খেয়ে লাগল। পরস্পরবিরোধী দাবিতে রাজপথ মুখর হতে থাকল। কেউ চায় পাকিস্তানি সেনাদের বিচার, কেউ চায় পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি। কেউ চায় ঘাতক-দালালদের বিচার। আবার দালাল আইন প্রত্যাহার না করলে আন্দোলন করবেন বলে স্বয়ং মওলানা ভাসানী ঘোষণা করলেন। স্বাধীনতাবিরোধীদের চক্রান্ত বাড়তে থাকে। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের জন্য যে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দায়ী, তা জনগণকে বোঝানো হয়নি। ছাত্রদের একটি অংশ 'গণবাহিনী' নামে সশস্ত্র অবস্থান নেয়। তারা থানা লুট, ফাঁড়ি লুট, পাট ও খাদ্যের গুদামে আগুন দেওয়াসহ নাশকতামূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। অনেক স্থানে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের হত্যা করা হয়। পাকিস্তানিদের দোসর আলবদর ও রাজাকাররা ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের পর পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্যসহ ইংল্যান্ডে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তারাও বিদেশ থেকে বাংলাদেশবিরোধী প্রচার অব্যাহত রাখে। নানামুখী ষড়যন্ত্রের মুখে বঙ্গবন্ধু দেশ, জাতি ও রাষ্ট্র রক্ষায় একটি মহৎ প্রকল্প নেন। তিনি স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির অপতৎপরতা প্রতিরোধেরও ডাক দেন। সর্বহারা পার্টি নামে পাকিস্তানপন্থি দলগুলো এবং তাদের দোসর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছিল। এই অরাজকতা, ধ্বংস, হানাহানির বিরুদ্ধে তিনি জনগণকে সংগঠিত করার প্রয়াস নেন। সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্য ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাতে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। যারা তাঁকে হত্যা করেছিল, তারা পাকিস্তানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চেয়েছিল। তাই যে তাজউদ্দীন আহমদ এক বছর

আগে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, সেই তাঁকেও ঘাতকরা রেহাই দেয়নি। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর আরও তিন জাতীয় নেতার সঙ্গে স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকেও জেলখানায় হত্যা করেছিল। পাকিস্তান অভিনন্দন জানিয়েছিল 'ইসলামি প্রজাতন্ত্রী' বাংলাদেশকে। মুক্তিযোদ্ধাদের সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়া পঁচাত্তর সালের ৭ নভেম্বর ক্ষমতা দখল করার পর খুনি মোশতাকের ধারায় দেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করার সুযোগ নেয়। তিনি একাত্তরের পরাজিত শক্তিকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করার কাজটি করেন। এরা শাসনক্ষমতায় বসে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে যায়। স্বাধীনতার ইতিহাস, মূলনীতি বিকৃত করা হয়। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলাই শুধু নয়, শেখ মুজিবের নামও মুছে ফেলার চেষ্টা চলে। কিন্তু ইতিহাসের পাতাজুড়ে শেখ মুজিবের নাম জ্বলজ্বল করে। সবকিছু ছাপিয়ে এই একুশ শতকেও আছেন বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির জন্য দিকনির্দেশনা নিয়ে। তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতি শেখ মুজিব হত্যার বিচার পেয়েছে। পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। জেলহত্যার বিচারও হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনদানের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন, তিনি তাঁর দেশ, জাতি ও জনগণের প্রতি ছিলেন সৎ। তাঁর সততা ছিল বাঙালির প্রতি, বাঙালির সংস্কৃতির প্রতি, বাঙালির স্বাধীনতার প্রতি। তিনি লড়াই করেছেন সাহসের সঙ্গে। গুলি বঙ্গবন্ধুর বুকেই লেগেছিল, পিঠে নয়। বারবার ফিরে পায় আজও বাঙালি তার জাতির পিতাকে। জন্মশতবর্ষে জাতি নতুনের আহ্বানে গাইছে গান।

লেখক : একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

ছয় দফা থেকে স্বাধীনতা

সেলিনা হোসেন

আজ ৭ জুন। ১৯৬৬ সালের এই দিনে প্রবল প্রতিরোধে তখনকার পূর্ব বাংলায় পূর্ববঙ্গবাসী বঙ্গবন্ধুর উত্থাপিত ছয় দফার স্বীকৃতির জন্য রাজপথে নেমেছিল প্রবল প্রতিরোধে। বাঙালির অধিকার বিমূর্ত হয়েছিল ছয় দফার দাবিতে। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর কৈশোর থেকে সূচিত রাজনৈতিক জ্ঞানের ধারাবাহিকতায় তৈরি করেছিলেন বাঙালির অধিকার সচেতনতার মূলসূত্র ছয় দফা কর্মসূচি। তিনি এই রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞকে 'আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফা কর্মসূচি' শিরোনামে পাকিস্তানে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে আইয়ুব খানের বিরোধী দলগুলো একটি বৈঠকে বসে। এই সভায় বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক নেতারা ছয় দফা দাবিকে সমর্থন করেন না। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশই নানাভাবে শোষিত-বঞ্চিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হলে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে যান। তাঁরা ছয় দফাকে পাকিস্তানকে ভেঙে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখেন এবং এর তীব্র বিরোধিতা করেন।

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৭ দিন যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধ চলার সময় পূর্ব পাকিস্তানকে একদম অরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং অস্ত্রশস্ত্রের এমন অবস্থা ছিল না যে ভারতের আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারত। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছিলেন এভাবে যে, চীনের ভয়ে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধে জড়াতে সাহস করেনি। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানকে ১৭ দিন যুদ্ধকালীন সময়ে এতিমের মতো ফেলে রাখা হয়েছে।

ভারতীয় সৈন্যরা যদি দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত লেফট-রাইট করে হেঁটে যেত তবুও তাদেরকে বাধা দেওয়ার মতো অস্ত্র বা লোকবল কিছুই পূর্ব বাংলার ছিল না। আর চীনই যদি আমাদের রক্ষাকর্তা হয় তবে পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে চীনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেই হয়।'

বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রবলভাবে মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর অধিকারের ছয় দফা দাবি প্রণয়ন করেন।

লাহোর থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু। ঢাকা বিমানবন্দরে নামার পরে সাংবাদিকদের ছয় দফার ব্যাখ্যা দেন। এই দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলে উল্লেখ করেন। এরপর তিনি ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার পক্ষে দেশের প্রতিটি জেলায় জনসমাবেশ করেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়ে ছয় দফার কথা শোনেন। এই দফার শেষ দফায় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেন।

তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে যে বক্তৃতা করেন তার শুরুটা এমন :

'আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবিরূপে ছয় দফা কর্মসূচি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমি স্বার্থীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিতি। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়াই উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তিসনদ একুশ দফা দাবি, যুক্ত-নির্বাচন-প্রথার দাবি, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্প-ব্যয়ে শিক্ষালাভের দাবি, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ছয় দফা দাবিতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ছয় দফা দাবিতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত-বঞ্চিত আদম

সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণির সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি, তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে।'

তিনি শেষ করেছেন এভাবে–'আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ছয় দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তানবিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তিতর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমি স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মতো মুরুব্বিরাই এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে বাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তকি্দর আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোওয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সেসব সহ্য করিবার মতো মনের বল আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানির ভালোবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে-কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছুই আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁহার পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা আল্লাহ্র দরগায়

শুধু এই দোয়া করিবেন, বাকি জীবনটুকু আমি যেন তাঁহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি-সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।'

আপনাদের স্নেহধন্য খাদেম শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৬৬ সালের ৮ই মে নারায়ণগঞ্জে আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করার পরে দেশরক্ষা আইনের ৩২ নম্বর ধারায় শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর সাংবাদিকদের বলতেন, 'আমি যতদিন গভর্নর, শেখ মুজিবকে জেলেই থাকতে হবে।'

ছয় দফা কর্মসূচি বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের পরে ব্যাপক আকার ধারণ করে। জনগণ মিছিলে গণআন্দোলনের প্রতিষ্ঠায় উজ্জীবিত হয়। প্রায় আটশত লোককে গ্রেফতার করেন মোনায়েম খান। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং ছয় দফার সমর্থনে হরতাল পালন শুরু করে। ছাত্র-জনতা ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে ১৪৪ ধারা জারি করেন গভর্নর। স্লোগান ওঠে–'জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব'।

এই সময় শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' জারি করা হয়। প্রবল প্রতিরোধে উত্তাল হয়ে ওঠে পূর্ববঙ্গবাসী।

আওয়ামী লীগ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললে পুলিশের নির্যাতনে শহিদ হয় অনেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলনের সূত্রপাত করে। এই আন্দোলনের প্রথম শহিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান; পরে শহিদ হয় স্কুলছাত্র মতিউর রহমান। শহিদ হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের চাপে ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করেন। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয় লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে।

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সামরিক শাসক আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। পুরো পাকিস্তানে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসন জারি হয়। ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন করার কথা ঘোষণা করেন। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন, কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁকে প্রধানমন্ত্রী না করার জন্য ষড়যন্ত্র করে। ইয়াহিয়া খান সংসদ অধিবেশন স্থগিত করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশব্যাপী শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ভাষণে বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ছয় দফার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলেন। ৫ বছরের ব্যবধানে তিনি স্বাধীন দেশের স্থপতি হন।

ছয় দফা থেকে স্বাধীনতা এই ছিল গৌরবের ইতিহাস।

লেখক : কথাসাহিত্যিক

ছয় দফা : স্বাধিকার ও স্বাধীনতার সেতুবন্ধ

মনজুরুল আহসান বুলবুল

৭ জুন 'ছয় দফা দিবস'।

ছয় দফা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলতেন, সাঁকো দিলাম, স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য। আসলেই ছয় দফা আমাদের স্বাধীনতার ভ্রূণ। ছয় দফা বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের সাথে সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের দৃঢ় সেতুবন্ধ। কেন ৭ জুন ছয় দফা দিবস? একটু পটভূমি জানা দরকার।

১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয় দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয় দফা আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। এর আগে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত বিরোধী দলের কনভেনশনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। তবে কনভেনশনের সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ছয় দফা নিয়ে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করতে দেননি। শেখ মুজিব ১১ ফেব্রুয়ারি দেশে ফিরে এসে ঢাকা বিমানবন্দরে সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফা সম্পর্কে বিস্তারিত জনসমক্ষে তুলে ধরেন। ছয় দফা প্রচার ও প্রকাশের জন্য শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ছয় সদস্যবিশিষ্ট উপকমিটি গঠন করা হয়। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত ছয় দফা নিয়ে গোটা পূর্ব পাকিস্তান চষে বেড়ান শেখ মুজিব ও তাঁর সহযোগীরা। ছয় দফার পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন দেখে ৮ মে প্রতিরক্ষা আইনে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। ছয় দফার পক্ষে জনসমর্থন এবং বন্দি নেতাদের মুক্তির দাবিতে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল ডাকে আওয়ামী লীগ।

১.

১৯৬৬ সালে জুনের সেই উত্তাল প্রথম সপ্তাহে কেমন ছিল পূর্ব বাংলা? কী ঘটেছিল সেই দিনগুলিতে–তা পাওয়া যাবে শেখ মুজিবের নিজের জবানীতে।

মনে রাখতে হবে, তখনও তিনি বঙ্গবন্ধু হননি। আওয়ামী লীগের নেতা এবং ছয় দফার স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে জেলে আটক শেখ মুজিব।

৬ জুন ১৯৬৬, সোমবার। কারাবন্দি শেখ মুজিব লিখেছেন : 'আগামীকাল ধর্মঘট। পূর্ব বাংলার জনগণকে আমি জানি, হরতাল তারা করবে। রাজবন্দিদের মুক্তি তারা চাইবে। ছয় দফা সমর্থন করবে। তবে মোনায়েম খান সাহেব যেভাবে উস্কানি দিতেছেন তাতে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা যে তিনি করছেন। এটা বুঝতে পারছি। জনসমর্থন যে তার সরকারের নাই তা তিনি বুঝেও বোঝেন না।' [কারাগারের রোজনামচা, পৃষ্ঠা. ৬৭] দেশজুড়ে টানটান উত্তেজনা। বন্দি শেখ মুজিব অস্থির, কিন্তু দেশের মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাসে অটল।

৭ জুন ১৯৬৬, মঙ্গলবার। শেখ মুজিব লিখছেন : "কি হয় আজ? আবদুল মোনায়েম খান যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হয় কিছু একটা ঘটবে আজ। কারাগারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে খবর আসলো দোকানপাট, গাড়ি, বাস রিকশা সব বন্ধ। শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল চলছে। এই সংগ্রাম একলা আওয়ামী লীগই চালাইতেছে। আবার সংবাদ পাইলাম পুলিশ আনছার দিয়ে ঢাকা শহর ভরে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই জনগণ বে-আইনি কিছু করবে না। শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশের মানুষের রয়েছে। কিন্তু এরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করতে দিবে না।

আবার খবর এলো টিয়ার গ্যাস ছেড়েছে। লাঠিচার্জ হতেছে সমস্ত ঢাকায়। আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না। কয়েদিদের কয়েদিরা বলে। সিপাইরা সিপাইদের বলে। এই বলাবলির ভিতর থেকে কিছু খবর বের করে নিতে কষ্ট হয় না। তবে জেলের মধ্যে মাঝেমধ্যে প্রবল গুজবও রটে। অনেক সময় এসব গুজব সত্যই হয়, আবার অনেক সময় দেখা যায় একদম মিথ্যা গুজব। কিছু লোক গ্রেপ্তার হয়ে জেল অফিসে এসছে। তার মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চাই বেশি। রাস্তা থেকে ধরে এনেছে। ১২টার পরে খবর পাকাপাকি পাওয়া গেল যে হরতাল হয়েছে। জনগন স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করেছে। তারা ছয় দফা সমর্থন করে আর মুক্তি চায়, বাঁচতে চায়, খেতে চায়, ব্যক্তি স্বাধীনতা চায়। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি, কৃষকের বাঁচার দাবি তারা চায়–এর প্রমাণ এই হরতালের মধ্যে হয়েই গেল।

এ খবর শুনলেও আমার মনকে বুঝাতে পারছি না। একবার বাইরে একবার ভিতরে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। বন্দি আমি, জনগণের মঙ্গল কামনা

ছাড়া কি করতে পারি! বিকালে আবার গুজব শুনলাম গুলি হয়েছে, কিছু লোক মারা গেছে। অনেক লোক জখম হয়েছে। মেডিকেল হাসপাতালেও একজন মারা গেছে। একবার আমার মন বলে, হতেও পারে, আবার ভাবি সরকার কি এতো বোকামি করবে? ১৪৪ ধারা দেওয়া নাই। গুলি চলবে কেন? একটু পরেই খবর এলো ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে, মিটিং হতে পারবে না। কিছু জায়গায় টিয়ার গ্যাস মারছে সে খবর পাওয়া গেল। বিকালে আরও বহু লোক গ্রেফতার হয়ে এলো। প্রত্যেককে সামারী কোর্ট করে সাজা দিয়ে দেয়া হয়েছে। কাহাকেও এক মাস, কাহাকে দুই মাস। বেশির ভাগ লোকই রাস্তা থেকে ধরে এনেছে শুনলাম। অনেকে নাকি বলে রাস্তা দিয়া যাইতে ছিলাম ধরে নিয়ে এলো। আবার জেলও দিয়ে দিল। সমস্ত দিনটা পাগলের মত কাটলো আমার। তালাবদ্ধ হওয়ার পূর্বে খবর পেলাম নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁ, কার্জন হল ও পুরনো ঢাকার কোথাও কোথাও গুলি হয়েছে, তাতে অনেক লোক মারা গেছে। বুঝতে পারি না সত্য কি মিথ্যা! কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারি না। সেপাইরা আলোচনা করে, সেখান থেকে কয়েদিরা শুনে আমাকে কিছু কিছু বলে। তবে হরতাল যে পালন হয়েছে সে কথা সবাই বলছে। এমন হরতাল নাকি কোনদিন হয় নাই। এমনকি ২৯শে সেপ্টেম্বরও না। তবে আমার মনে হয় ২৯শে সেপ্টেম্বরের মতোই হয়েছে হরতাল। গুলি ও মৃত্যুর খবর পেয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। শুধু পাইপই টানছি - যে এক টিন তামাক বাইরে আমি ছয় দিনে খাইতাম, সেই টিন এখন চার দিনে খেয়ে ফেলি। কি হবে? কি হতেছে? দেশকে এরা কোথায় নিয়ে যাবে, নানা ভাবনায় মনটা আমার অস্থির হয়ে রয়েছে। এমনিভাবে দিন শেষ হয়ে এলো। মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা জেলে আছি। তবুও কর্মীরা, ছাত্ররা, শ্রমিকরা যে অন্দোলন চালাইয়া যাইতেছে, তাদের জন্য ভালবাসা দেওয়া ছাড়া আমার দেবার কিছু নাই। মনে শক্তি ফিরে এলো এবং আমি দিব্যচোখে দেখতে পেলাম 'জয় আমাদের অবধারিত'। কোন শক্তি আর দমাতে পারবে না।" [কারাগারের রোজনামচা, পৃ. ৬৯/৭০]

৭ জুন কী ঘটেছিল তার এক পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় বঙ্গবন্ধুর ৮ জুন লেখা ডায়েরির পাতায়।

৮ জুন ১৯৬৬, বুধবার। শেখ মুজিব লিখছেন : 'ভোরে উঠে শুনলাম সমস্ত রাতভর গ্রেপ্তার করে জেল ভরে দিয়েছে পুলিশ বাহিনী। সকালেও জেল অফিসে বহুলোক পড়ে রয়েছে। প্রায় তিনশত লোককে সকাল ৮টা পর্যন্ত

জেলে আনা হয়েছে। এর মধ্যে ৬ বৎসর বয়স থেকে থেকে ৫০ বছর বয়সের লোকও আছে। ... ... এরা জেলে আসার পর খবর এলো ভীষণ গোলাগুলি হয়েছে, অনেক লোক মারা গেছে তেজগাঁ ও নারায়ণগঞ্জে। সমস্ত ঢাকা শহরে টিয়ার গ্যাস ছেড়েছে, লাঠিচার্জও করেছে। ... ... খবরের কাগজের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ... ... আমি পূর্বে যে অনুমান করেছি তাই হলো। কোন খবরই সরকার সংবাদপত্রে ছাপতে দেয় নাই। ধর্মঘটের কোন সংবাদই নাই। শুধু সরকারি প্রেসনোট। ইত্তেফাক, আজাদ, অবজারভার সকলেরই একই অবস্থা। একই বলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা! ... ... প্রতিবাদ দিবস ও হরতাল যে পুরাপুরি পালিত হয়েছে বিভিন্ন জেলায় সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ রইলো না। ... ... পত্রিকার নিজস্ব খবর ছাপতে দেয় নাই। তবে সরকারি প্রেসনোটেই স্বীকার করেছে পুলিশের গুলিতে দশজন মারা গিয়েছে। এটাতো ভয়াবহ খবর। সরকার যখন স্বীকার করেছে দশজন মারা গেছে তখন কতগুণ বেশি হতে পারে ভাবতেও আমার ভয় হলো! কতজন জখম হয়েছে সরকারি প্রেসনোটে তাহা নাই। ... ... ৭ই জুনের যে প্রতিবাদে বাংলার গ্রামগঞ্জে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফেটে পড়েছে, কোন শাসকের রক্ত চক্ষুরাঙানি তাদের দমাতে পারবে না। ... ... যে রক্ত আমার দেশের ভাইদের বুক থেকে বেরিয়ে ঢাকার পিচঢালা কাল রাস্তা লাল করলো, সে রক্ত বৃথা যেতে পারে না।' [কারাগারের রোজনামচা, পৃ. ৭১/৭২/৭৩]

২.

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে, ছয় দফা আসলে এক দফা। তারা প্রকাশ্যেই শেখ মুজিবকে লক্ষ করে বলতেন : ছয় দফা কর্মসূচি পাকিস্তান ভেঙে এর পূর্ব অংশকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। সেজন্য তাদের টার্গেট ছিল শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ। ৭ জুন একদিকে যেমন নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে ছয় দফার প্রতি পূর্ব বাংলার মানুষের সমর্থন ঘোষণার দিন, তেমনি ছয় দফার প্রতি, বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর তীব্র আক্রোশ প্রকাশেরও দিন।

কী ছিল ছয় দফায়? কেন এই ছয় দফা? এই দফাগুলোর পটভূমিই বা কী? আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গৃহীত হওয়ার পর 'আমাদের বাঁচার দাবি : ছয় দফা কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এতে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছয় দফার দফাওয়ারি ব্যাখ্যা, পটভূমি, যুক্তি ও এই দফা এবং তাঁকে নিয়ে সমালোচনার জবাব তুলে ধরেন।

['আমাদের বাঁচার দাবি : ছয় দফা কর্মসূচি' শেখ মুজিবুর রহমান; তারিখ : ৪ঠা চৈত্র, ১৩৭২; ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬] এতে নিজেকে 'খাদেম' হিসেবে উল্লেখ কওে শেখ মুজিব বলছেন : 'কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ছয় দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারি সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম।' [এই নিবন্ধে সেই বক্তব্যগুলোর খুবই সংক্ষিপ্ত রূপ, ভাষা অবিকল রেখে তুলে ধরা হলো– নিবন্ধকার]

১ নং দফা : ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করত: পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। তাতে পালামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইন সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

শেখ মুজিব ব্যাখ্যায় বলছেন : ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে আজমসহ সকল নেতার দেয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবি। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করিয়া আমি কোনও নতুন দাবি তুলি নাই।

২ নং দফা : ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

শেখ মুজিব ব্যাখ্যায় বলছেন : বৃটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকীসব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেয়া হইয়াছিল। কংগ্রেস চুক্তি ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া স্টেট বলিয়াছি। ফেডারেটিং

ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেটস্' বলা হইয়া থাকে।

৩ নং দফা : মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে।

ক. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাংক থাকিবে।

খ. দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

শেখ মুজিব ব্যাখ্যা দিচ্ছেন : যদি আমার দ্বিতীয় অল্টারনেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজী না হন, তবেই শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শন স্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নকশার মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে।

৪ নং দফা : সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে

না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিকক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংক সমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

শেখ মুজিব ব্যাখ্যায় বলছেন : আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের দায়িত্ব দেয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মত যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এটাই সরকারী তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তারা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। ৩ নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থ দফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। আমার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রেও এমন বিধান থাকিবে যে, আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য ও আয় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সে টাকায় হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকার আঞ্চলিক সরকারের কোন হাত থাকিবে না।

৫ নং দফা : বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি : ১। দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে। ২। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে। ৩। ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে। ৪। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী রফতানী চলিবে। ৫। ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

শেখ মুজিব ব্যাখ্যা দিচ্ছেন : পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩ নং দফার মতই অত্যাবশ্যক।

পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলাইলেই দেখা যাইবে যে- ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে। খ) পূর্ব পাকিস্তানে মুলধন গড়িয়া না উঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না। গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রফতানী করে আমদানী করে সাধারণতঃ তার অর্ধেকের কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশী। বিদেশ হইতে আমদানী করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা। ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মুল্য তো দূরের কথা আবাদী খরচাটাও দেয়া হয় না। ফলে পাটচাষীদেও ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না।

৬ নং দফা : পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ।

শেখ মুজিব বলছেন : এ দাবী অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম। তাতো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ইপিআর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয়

সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন্ মুখে? মাত্র সতর দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যতঃ আমদেরকে তাই করিয়া রাখিয়াছে। তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। অস্ত্র কারখানা স্থাপন করুন। নৌবাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন।

ছয় দফা নিয়ে যাতে কোনো বিভ্রান্তি না হয়, পশ্চিম পাকিস্তানে সাধারণ মানুষ যাতে ছয় দফাকে ভুল না বোঝেন সেজন্য শেখ মুজিব বলছেন : 'এক. মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ৬-দফা কর্মসূচীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবি স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন। দুই. আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে তখন আমিও আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, এ বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরাই দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মত দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না? কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে।'

শেখ মুজিব নিজের উদারতার চিত্র তুলে ধরে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বলেন :

১। প্রথম গণপরিষদে আমাদের মেম্বর সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশ রক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।

২। পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাই এর দরদ লইয়া আমাদের

৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানীর ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বর নির্বাচন করিয়াছিলাম।

৩। ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবি করিয়াছিলাম।

৪। ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

৫। আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাস আমরা সংখ্যা গুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে যেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল, আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার। থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। ... ... আশা করি, আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ছয় দফা কর্মসূচীর বিচার করবেন। তা যদি তাঁরা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ছয় দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি।

শেখ মুজিব তাঁর দৃঢ় অবস্থান তুলে ধরে বলছেন : পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল জুলুম ভুগিবার তকদির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে সব সহ্য করিবার মত মনের বল আল্লাহ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবির জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছুই আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁর পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা আল্লাহ্‌র দরগায় শুধু এই

দোয়া করিবেন, বাকী জীবনটুকু আমি যেন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি। ইতিহাস সাক্ষী দেবে শেখ মুজিব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর ওয়াদা রক্ষা করেছেন।

৩.

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেন, ইংল্যান্ডের 'ম্যাগনা কার্টা' যেমন বিশ্বকে পরিবর্তিত করেছে, বাংলাদেশের 'ম্যাগনা কার্টা' 'ছয় দফা' তেমনি শুধু বাঙালির ভাগ্য পাল্টায়নি, পৃথিবীর শোষিত মানুষের ভাগ্যবদলের ম্যাগনা ম্যাগনা কার্টা হিসেবেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু যেমন বলতেন, 'পৃথিবী আজ দুই ভাগে বিভক্ত–শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।' ছয় দফার প্রতিটিতেই তাঁর এই দর্শন উজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্ঠিত।

সেজন্য ছয় দফা শুধু বাঙালি জনগোষ্ঠীর নয়, বিশ্বের সকল শোষিত মানুষেরই মুক্তির সনদ।

লেখক : সাংবাদিক

ছয় দফার সঙ্গে তৈরি ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের ছকও

অজয় দাশগুপ্ত

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসনের ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। এ কর্মসূচিতে ছিল–পাকিস্তান ফেডারেশনে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রবর্তন; ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে পৃথক কিন্তু সহজে বিনিময়যোগ্য পৃথক মুদ্রা চালু কিংবা একক মুদ্রা, তবে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপন; সব ধরনের কর ও শুল্কধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে; দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে, অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা থাকবে প্রদেশের হাতে এবং প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী করার জন্য নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থানান্তর, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন ও আধাসামরিক রক্ষীবাহিনী গঠন।

তৎকালীন পাকিস্তানের ক্ষমতার কেন্দ্র লাহোরে তিনি যখন এ কর্মসূচি প্রকাশ করেন, প্রেক্ষাপট ছিল ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। বিশেষভাবে রাজস্ব ভাগ-বাটোয়ারা ও নিজস্ব প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ইস্যু প্রধান্য পায়। রাজনৈতিক মহল, সুধীসমাজ, গবেষক, সাংবাদিক এবং উদীয়মান বাঙালি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণি দ্রুতই বুঝে গেল–মুক্তির পথ চিহ্নিত হয়ে গেল। শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক কৌশলেও অন্য সবাইকে বহু যোজন পেছনে ফেলে দিতে পেরেছিলেন। হরতাল-ধর্মঘট নয়, তিনি কর্মসূচি নিয়ে চলে গেলেন জনগণের কাছে।

পাকিস্তানের শাসকরা বুঝতে পারে, এতদিন যে দাবি নিছক রাজনৈতিক দলের সম্মেলন ও জনসভার প্রস্তাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তা নতুন মাত্রা

পেয়েছে। বাঙালিরা হিসাবের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে প্রস্তুত হয়ে উঠছে। দাবি আদায়ে সংগঠন চাই, আন্দোলন চাই এবং তার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের প্রয়োজন পড়বে সে উপলব্ধিও ততদিনে হয়ে গেছে। নেতাও পেয়ে গেছেন তাঁরা। আগরতলা ষড়যন্ত্রের দায়ে যখন তাঁকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা হয়, তখন জনগণ এই মহান নেতাকে বরণ করে নেয় বঙ্গবন্ধু হিসেবে।

নিজস্ব প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ধারণা অবশ্য বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই সামনে আনেন। বয়স যখন মাত্র ২৯ বছর–আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক–১৯৪৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর আরমানিটোলা ময়দানে ছাত্রলীগ আয়োজিত জনসভায় তিনি বলেছিলেন, 'পাঞ্জাবি সৈন্যরা পূর্ব বাংলার ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত নয়। আমাদের দেশের নিরাপত্তা আমাদেরই নিশ্চিত করতে হবে।'

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি যে সংগঠনের জন্ম দেন, সেই ছাত্রলীগ থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নেওয়ার জন্যই আয়োজন হয়েছিল সম্মেলনের। গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্মেলন ও জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান প্রাপ্তবয়স্ক সকল ব্যক্তিকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রয়োজন পড়লে দেশ রক্ষার জন্য তাদের অস্ত্র সরবরাহের দাবি জানান।

বঙ্গবন্ধুর এটাও জানা হয়ে গেছে, বাঙালির স্বার্থের বিরুদ্ধ শক্তি প্রবল ক্ষমতাধর এবং তাঁকেই আঘাতের টার্গেট করবে। ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরাও বাদ যাবে না। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামের সময়ে বলেছিলেন, 'আমি যদি হুকুম দেবার না পারি...।' অবাক বিস্ময়ে আমরা দেখি, এই ঐতিহাসিক দিনের পাঁচ বছর আগে ছয় দফা প্রদানের পরপরই তিনি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন মুক্ত জীবনে তাঁকে রাখা হবে না। সচেতন প্রয়াসে এমন অবস্থা তৈরি করতে পারেন যেন আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে না যায়। জনগণকে তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। তরুণ সমাজ এগিয়ে এসেছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ের মতো সাহস ও সংকল্প নিয়ে। নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। আদমজী-ডেমরা, টঙ্গী-তেজগাঁওয়ের শ্রমিকরা আন্দোলনে সক্রিয় হচ্ছে। 'বাংলাদেশ' দৃষ্টিসীমানায় এসে পড়েছে। 'স্বাধীনতা' নিষিদ্ধ শব্দ। কিন্তু অনেকেই দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়ে উঠছেন–পিন্ডি বা লাহোর নয়, ঢাকাতেই এ ভূখণ্ডের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

বঙ্গবন্ধু ছয় দফা প্রদানের পর আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করার জন্য ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এবং তাঁর দুষ্কর্মের সহযোগী পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান একের পর এক দুরভিসন্ধি আঁটেন। কিন্তু বাঙালিরা অবাক বিস্ময়ে দেখল, দলের সভাপতি ও অন্যান্য নেতা গ্রেফতার হওয়ার এক মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই গোটা পূর্ব পাকিস্তানে যারা হরতাল আহ্বান করেছিল, তাদের মধ্যে প্রাদেশিক কমিটির শীর্ষস্থানীয় কোনো নেতাই ছিলেন না।

'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থে এই ঐতিহাসিক তারিখে (৭ জুন, ১৯৬৬, মঙ্গলবার) শেখ মুজিবুর রহমান দিনলিপি বা ডায়েরি শুরু করেছেন এভাবে–'সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। কি হয় আজ? আবদুল মোনায়েম খান যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হয় কিছু একটা ঘটবে আজ। কারাগারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে খবর আসলো দোকানপাট, গাড়ি, বাস, রিকশা সব বন্ধ। শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল চলেছে। এই সংগ্রাম একলা আওয়ামী লীগই চালাইতেছে। আবার সংবাদ পাইলাম পুলিশ আনছার দিয়া ঢাকা শহর ভরে দিয়েছে। ...আবার খবর এল টিয়ার গ্যাস ছেড়েছে। লাঠিচার্জ হতেছে সমস্ত ঢাকায়। আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না। কয়েদিরা কয়েদিদের বলে। সিপাইরা সিপাইদের বলে। এই বলাবলির ভিতর থেকে কিছু খবর বের করে নিতে কষ্ট হয় না। ...জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করেছে। তারা ছয় দফা সমর্থন করে আর মুক্তি চায়, বাঁচতে চায়, খেতে চায়, ব্যক্তি স্বাধীনতা চায়। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি, কৃষকের বাঁচবার দাবি তারা চায়–এর প্রমাণ এই হরতালের মধ্যেই হয়ে গেল।'

ছয় দফা প্রদানের পর থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান ঘনিষ্ঠজনদের কাছে বলছিলেন, 'ছয় দফা মানলে ভালো। না মানলে এক দফা।' তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য যে স্বাধীনতা এবং এজন্য ধাপে ধাপে কুশলী পদক্ষেপ নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন–সেটা গোপন করেননি কখনো।

এক দফার আন্দোলন যখন সামনে এলো, তিনি দীর্ঘ দুই যুগের সাধনায় যা কিছু তৈরি করেছেন, একে সব কাজে লেগে গেল–জনগণ প্রস্তুত, সংগঠিত ছাত্র-তরুণরা। দেশব্যাপী নিষ্ঠুর গণহত্যার মধ্যেই ২৫ মার্চের দুই সপ্তাহ যেতে না যেতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন ও সক্রিয় কার্যক্রম শুরু করতে পারা গোটা বিশ্বকেই বিস্মিত করে। আর কী অনন্য দূরদর্শিতা–১৯৪৯

সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দাবি তুলেছিলেন প্রাপ্তবয়স্কদের সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সজ্জিত করার। সেটা পাকিস্তানের শাসকরা করেনি। বাংলাদেশের লাখ লাখ ছাত্র-তরুণ সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে অস্ত্র তুলে নিয়ে ছিল বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে তাড়াতে। ২৬ মার্চ এই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

ছয় দফা থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের কাল পর্ব আমাদের যেসব রাজনৈতিক শিক্ষা দেয়–এক, সঠিক সময়ে সঠিক কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন কৌশল উপস্থাপন। দুই, উপযুক্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি। তিন, জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করা। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ এটা করতে পেরেছিল বলেই ১৯৬৬ সালের ৭ জুনের হরতালে অভাবনীয় সাড়া মিলেছিল, ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির ছাত্র গণঅভ্যুত্থান সফল হয়েছিল এবং ১৯৭১ সালে বিপুল আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছিল স্বাধীনতা।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের প্রস্তুতি চালানোর পর্যায়েই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ছক তৈরি করে ফেলেছিলেন। এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্রসহ কতিপয় ধনবান দেশ ও বিশ্বব্যাংক যে নতুন রাষ্ট্রকে 'বাস্কেট কেস' হিসেবে উপহাস করেছিল, স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সে দেশটিই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের বিপুল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে পারে।

আবার ২১ বছরের দুঃশাসনের পর বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব হাতে নিয়ে যে দেশকে সমৃদ্ধির সোপানে তুলে দিতে অনন্য সফলতা দেখাতে পারে তারও প্রেরণা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশ ভূখণ্ড এবং তার মানুষের ওপর অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা রাখার কারণেই বাংলাদেশে ঘুরে দাঁড়াতে পারছে বহুবিধ বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে। তলাবিহীন ঝুড়ির বদনাম ঘুচিয়ে দেশটিকে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা, কুচক্রী মহলের কারণে বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুতে অর্থ জোগানো বন্ধ করে দেওয়ার পর নিজস্ব অর্থে যোগাযোগ খাতের এ সুবৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে গর্বিত পদচারণা, প্রায় ছয় কোটি ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে আসতে পারা–বাংলাদেশের এ ধরনের আরও উজ্জ্বল উদাহরণ এখন বিশ্বনেতৃবৃন্দই দিচ্ছেন। করোনাত্তোরকালে বাংলাদেশ যে উন্নয়নের সঠিক ও টেকসই ধারায়

চলতে পারবে, সে ভরসাও কিন্তু আমরা পেয়ে যাই বঙ্গবন্ধুকন্যার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী কর্মসূচি ও কর্মকৌশলের কারণে। সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি দৃঢ়সংকল্পে করে ফেলা– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষা যে তিনিই সবচেয়ে বেশি ধারণ করেন।

লেখক : সাংবাদিক

৭ জুন ১৯৬৬; ৭ জুন ২০২০

সুভাষ সিংহ রায়

প্রয়াত সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক ষাটের দশকের কোনো এক সময়ে লন্ডনে বিবিসিতে কর্মরত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু সে সময়ে লন্ডনে গিয়েছিলেন। সৈয়দ শামসুল হক দু-একজন বন্ধুকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে সামনে পেয়েই সৈয়দ হক জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'ছয় দফা কী একটু সহজে বুঝিয়ে দেবেন।' বঙ্গবন্ধু তিনটি আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেন, 'আমার আসলে তিন দফা। কত নিছো? কবে দিবা? কবে যাবা?'

১৯৪০ সালে লাহোর গিয়েছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। উত্থাপন করেছিলেন লাহোর প্রস্তাব। তা গৃহীত হয়েছিল। তৃপ্তমনে ফিরেছিলেন তিনি। কিন্তু জিন্নাহ ১৯৪৬ সালে দিল্লির কনভেনশনে 'স্টেটস'কে 'স্টেস' করে দেন। এই 'এস'-এর মাহাত্ম্য বুঝতে সময় লেগেছে বাঙালির। এর ২৫ বছর পর লাহোর যাত্রা করলেন আরেক বাঙালি, শেখ মুজিবুর রহমান। সেই 'এস'-এর কথা মনে রেখেই করেছিলেন প্রস্তাব। তা প্রত্যাখ্যাত তো হলোই বরং বিচ্ছিন্নতাবাদী উপাধি নিয়ে ব্যর্থ মনে ফিরলেন ঢাকায়। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর লেখা একটি বই 'দুই বাঙ্গালির লাহোর যাত্রা' থেকে কয়েকটি লাইন তুলে ধরা যেতে পারে :

"বাংলার নেতা এ কে ফজলুল হকের জীবনে সবচেয়ে বড় কাজ কোনটি? ঋণসালিসী বোর্ড প্রতিষ্ঠা, না-কি পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন? দুটি দুই মাত্রার কাজ এবং উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ। গোটা পাকিস্তান আমলজুড়ে শুনেছি আমরা যে, হক সাহেব বিখ্যাত এই জন্য যে তিনি লাহোর গিয়ে সেই বিখ্যাত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন, যার ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হ্যাঁ, ঋণসালিসী বোর্ডের ব্যাপারটাও শোনা গেছে। বাংলার কৃষককে মহাজনী শোষণের জোয়াল থেকে মুক্ত করবার জন্য ওই সালিসী বোর্ডের প্রবর্তন

করেছিলেন তিনি। ভালো কাজ, সন্দেহ কী। কিন্তু কোনটা কত ভালো? বাংলাদেশে আজ আমরা কাজ দুটিকে নতুন করে মূল্যায়ন করবো নিশ্চয়ই। আমরা যে কৃষকপ্রিয় হয়েছি হঠাৎ করে তা নয়, তবে পাকিস্তানকে সেই দৃষ্টিতে এখন আর দেখি না, যে দৃষ্টিতে দেখার শিক্ষা পাকিস্তান আমলে আমরা খুব করে পেয়েছিলাম। এখন পরিপ্রেক্ষিত বদলেছে, মূল্যায়নও রূপ নিয়েছে ভিন্নতর। কিন্তু সত্য এটা যে, ১৯৪০-এর সেই প্রস্তাবটি বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হকই উত্থাপন করেছিলেন। প্রস্তাবটি তাঁর নয়, মুসলিম লীগের। ভারতীয় মুসলিম লীগের সুপ্রিম কাউন্সিলে মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয় ওই বছর মার্চ মাসের ২১ তারিখে। পরের দিন অর্থাৎ ২২ তারিখে কাউন্সিল অধিবেশনে ওটি উত্থাপন করার কথা; উত্থাপন মানে ঘোষণা দেওয়া আসলে। কিন্তু ২২ তারিখে তা করা হয়নি; করা হয়েছে ২৩ তারিখে। কারণ আর কিছুই নয়, হক সাহেবের অনুপস্থিতি। ফজলুল হক তখনও এসে পৌঁছাননি, এলেন তিনি ২৩ তারিখে; তাই ২৩ তারিখেই প্রস্তাব উত্থাপন করা হলো। তিনিই করলেন। সেই দিনই তিনি 'শেরে বাংলা' উপাধি পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেলেন। জিন্নাহ সাহেবই দিলেন, হক সাহেবের জনপ্রিয়তা দেখে নয়, সেটা দেখা গিয়েছিল অবশ্যই, উপস্থিত সদস্যরা সকলে উঠে দাঁড়িয়েছিল একসঙ্গে, বাংলার প্রধানমন্ত্রী প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, ধ্বনি উঠেছিল তাৎক্ষণিকভাবে। জিন্নাহ সাহেব বললেন, 'টাইগার অব বেঙ্গল' এসে গেছেন, খুশি করবার জন্যই বললেন মনে হয়, খুশি করা প্রয়োজন ছিল। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ওই প্রস্তাবের তখনো নামকরণ হয়নি, পরে সেটা নাম পেলো পাকিস্তান প্রস্তাবের এবং মোটামুটি তার ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠা ঘটলো পাকিস্তান রাষ্ট্রের, সাত বছর পরে, ১৯৪৭ সালে।

ওই লাহোরেই আরেক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন বাংলার আরেক নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ২৬ বছর পরে, ওই মার্চ মাসের কাছাকাছি সময়েই, ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধীদলীয় নেতাদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো এবং সেখানে প্রস্তাব এলো সম্পূর্ণ উল্টো ধরনের; ৬-দফার; স্পষ্ট কথায় বলতে গেলে পাকিস্তান ভাঙার। এক বাঙালী প্রস্তাব করেছিলেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার, আরেক বাঙালী প্রস্তাব করলেন পাকিস্তান ভাঙার।

একই শহরে সময়ের কিছুটা ব্যবধানে। দুজনের প্রস্তাবই করলেন পাকিস্তান ভাঙার। দুজনের প্রস্তাবই কার্যকর হয়েছে। লাহোরে উত্থাপিত এক

প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আরেক প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ভেঙে চুরমার হয়েছে।

অস্বাভাবিক ছিল কি ওই দুটি কাজ-ওই দুই উত্থাপন; প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এক বাঙালীর, ভাঙার প্রস্তাব আরেকজনের? না, হক সাহেবের কাজটা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। তিনি ছিলেন স্রোতের সঙ্গে। ওই প্রস্তাব উত্থাপন তাঁর জন্য কোনো বিপদ ডেকে আনেনি। কিন্তু শেখ মুজিবের কাজটা ছিল বিপজ্জনক। লাহোর শহর তাঁর ৬-দফার কথা শোনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। আইয়ুব তো সঙ্গে সঙ্গেই গর্জন করে উঠেছিলেন। শেখ মুজিবকে জেলে যেতে হয়েছে, ঝুঁকি নিতে হয়েছে ফাঁসিকাষ্ঠে চড়বার। তবে হ্যাঁ, ওই প্রস্তাব তাঁকে জনপ্রিয় করেছিল বাঙালীদের মধ্যে। যেমন হক সাহেবের প্রস্তাব জনপ্রিয় করেছিল তাঁকে মুসলমানদের মধ্যে।"

ছয় দফার তাৎক্ষণিক পটভূমি হিসেবে ১৯৬৫ সাল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। একই বছর মৌলিক গণতন্ত্রের নামে নির্বাচনী প্রহসন বাঙালিদের ভীষণ ক্ষুব্ধ করে। পরের বছর ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলের জাতীয় কনভেনশন লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছয় দফা কর্মসূচি উত্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। লাহোরে বাধা পেয়ে তিনি ঢাকার তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দর গণমাধ্যমে ছয় দফার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেন। বঙ্গবন্ধু '৬৬-এর ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে সম্মিলিত বিরোধী দলগুলোর এক কনভেনশনে বাংলার গণমানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবিসংবলিত বাঙালির 'ম্যাগনাকার্টা' খ্যাত ঐতিহাসিক ছয় দফা উত্থাপন করে তা বিষয়সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সভার সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এ দাবি নিয়ে আলোচনায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে ১১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে ঢাকা বিমানবন্দরে সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। ২০ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ছয় দফা দলীয় কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। দলীয় কর্মী বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত তরুণ ছাত্রলীগ নেতৃত্বের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'সাঁকো দিলাম, স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য। ১৯৬৬ সালে ১৮ থেকে ২০ মার্চ হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু

সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। এই কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দলীয় ফোরামে পাস হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের ১০ মের মধ্যে আওয়ামী লীগের ৩৫০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধু এটি আঁচ করে সংগঠনকে যতটা পারেন গুছিয়েছেন। কয়েকটি স্তর করা হয়েছিল। এক স্তর গ্রেফতার হলে আরেক স্তর আন্দোলন সংগঠন করবে এই ছিল কৌশল। এই সময় ছাত্রলীগ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিল অধিবেশনটি ছিল বাঙালির ইতিহাসে বাঁক পরিবর্তন; যা '৬৯-এর মহান গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচন ও '৭১-এর মহত্তর মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরি করেছিল। স্বভাবসুলভ কণ্ঠে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে' উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, 'এই আন্দোলনে রাজপথে যদি আমাদের একলা চলতে হয় চলব। ভবিষ্যৎ ইতিহাস প্রমাণ করে বাঙালির মুক্তির জন্য এটাই সঠিক পথ।' কাউন্সিল অধিবেশনের পর বঙ্গবন্ধু সারা দেশ চষে বেড়ান। ৩৫ দিনে মোট ৩২টি জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন। রাজনীতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস হচ্ছে শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা, যিনি দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন ব্যতিরেকেই ছয় দফা উপস্থাপন করেছিলেন। দলের সাধারণ সম্পাদক হলেও শেখ মুজিব ছয় দফা পেশ করেন তাঁর ব্যক্তিগত সুপারিশ হিসেবে। কয়েক সপ্তাহ পরেই আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি দলের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ছয় দফাকে অনুমোদন করিয়ে নেন। ছয় দফা না দিলে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দলের নেতাদের ওপর নির্যাতন নেমে আসত না। সরকার আগরতলা মামলাও হয়তো ফেঁদে বসত না। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ম্যান্ডেটও ও রকম হতো না। তার পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। পূর্ববঙ্গে যারা ছয় দফার সমালোচনা করেছিলেন তাঁদের একটা বড় সংখ্যা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিলেন।

মুক্তিকামী বাঙালির আন্দোলনের খবরে তিনি খুশি হচ্ছেন, তাদের ওপর নির্যাতনের খবরে বিচলিত হচ্ছেন। কিন্তু কখনও তাঁর আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেনি। ১৯৬৬-এর ৬ জুন তিনি লিখেছেন, 'ত্যাগ বৃথা যাবে না, যায় নাই কোনো দিন। নিজে ভোগ নাও করতে পারি, দেখে যেতে নাও পারি, তবে ভবিষ্যৎ বংশধররা আজাদী ভোগ করবে। কারাগারের পাষাণ প্রাচীর আমাকেও পাষাণ করে তুলেছে। এ দেশের লাখ লাখ কোটি কোটি মা-

বোনের দোয়া আছে আমাদের ওপর। জয়ী আমরা হবই। ত্যাগের মাধ্যমে আদর্শের জয় হয়।'

আবার বঙ্গবন্ধু ৮ জুন তাঁর খাতায় লিখেছিলেন এভাবে। 'ছয় দফা যে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রাণের দাবি–পশ্চিমা উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকশ্রেণী যে আর পূর্ব বাংলার নির্যাতিত গরীব জনসাধারণকে শোষণ বেশি দিন করতে পারবে না, সে কথা আমি এবার জেলে এসেই বুঝতে পেরেছি। বিশেষ করে ৭ই জুনের যে প্রতিবাদে বাংলার গ্রামেগঞ্জে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফেটে পড়েছে, কোনো শাসকের চক্ষুরাঙানি তাদের দমাতে পারবে না। পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্য শাসকশ্রেণীর ছয় দফা মেনে নিয়ে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করা উচিত। যে রক্ত আজ আমার দেশের ভাইদের বুক থেকে বেরিয়ে ঢাকার পিচঢালা কাল রাস্তা লাল করল, সে রক্ত বৃথা যেতে পারে না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যেভাবে এ দেশের ছাত্র-জনসাধারণ জীবন দিয়েছিল তারই বিনিময়ে বাংলা আজ পাকিস্তানে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। রক্ত বৃথা যায় না। যারা হাসতে হাসতে জীবন দিল, আহত হলো, গ্রেপ্তার হলো, নির্যাতন সহ্য করল তাদের প্রতি এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের প্রতি নীরব প্রাণের সহানুভূতি ছাড়া জেলবন্দি আমি আর কি দিতে পারি! আল্লাহর কাছে এই কারাগারে বসে তাদের আত্মার শান্তির জন্য হাত তুলে মোনাজাত করলাম। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, এদের মৃত্যু বৃথা যেতে দেব না, সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। যা কপালে আছে তাই হবে। জনগণ তাদের দাম দেয়। ত্যাগের মাধ্যমেই জনগণের দাবি আদায় করতে হবে।'

৭ জুন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। ৮ তারিখের পত্রিকা পাওয়া যায়নি। ৯ জুন দৈনিক সংবাদে সরকারি একটি প্রেস নোট ছাপা হয়েছে, সেটি বিশ্লেষণ করলে রক্ষণশীল একটি হিসাব পাওয়া যাবে। ৭ জুন সম্পর্কে পরবর্তীকালেও বিস্তারিত কেউ লেখেননি। ৮ জুন ইত্তেফাক, সংবাদ বন্ধ থাকে। দৈনিক সংবাদ ৯ জুন তারিখে নাটকীয়ভাবে শিরোনাম দেয়, 'আমাদের নীরব প্রতিবাদ'–'যে মর্মান্তিক বেদনাকে ভাষা দেওয়া যায় না, সেখানে নীরবতাই একমাত্র ভাষা। তাই গতকল্য সংবাদ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। আমাদের এই নীরব প্রতিবাদ একক হইলেও আমাদের পাঠকরাও শরীক হইলেন, ইহা আমরা ধরিয়া লইতেছি।'

নতুন প্রজন্মের সামনে আমরা কি বঙ্গবন্ধুর ছয় দফাসহ তাঁর সংগ্রামের ইতিহাসগুলো উন্মোচন করতে পেরেছি কি না, জানার চেষ্টা করেছি, বোঝার

চেষ্টা করেছি। ১৯৯২ সালে প্রোব বার্তা সংস্থা নামে একটি প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু, মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মাত্র ২০টি প্রশ্ন নিয়ে ঢাকা মহানগরের ২০০টি স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জরিপ করেছিল। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে সেই জরিপে অংশগ্রহণকারী ৮৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। কেননা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর টানা একুশ বছর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তির দখলে ছিল। এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের টানা ১১ বছরে রাষ্ট্র পরিচালনায় থাকার কারণে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে উন্মোচিত হয়েছে।

দুই বছর আগে প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এক আলোচনাসভায় বলেছিলেন, 'দেশে এখন যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তাতে বঙ্গবন্ধুকে জানার, উপলব্ধি করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। নতুন প্রজন্মের কাছে এই আহ্বান থাকবে, তারা যেন বঙ্গবন্ধুকে জানার চেষ্টা করে। নতুন প্রজন্ম যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার চেষ্টা করে।' তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর নাম এ দেশ থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। পারা যায়নি। বঙ্গবন্ধু এমনই এক মানুষ, যিনি আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্জন করেছিলেন।' ১৯৬৬ সালের ৭ জুন আর ২০২০ সালের ৭ জুনের ৫৪ বছরের ব্যবধান। আজ আমরা যে সমৃদ্ধ অগ্রগতি যে জায়গায় এসে পৌঁছেছি, তা বঙ্গবন্ধু ছয় দফার আন্দোলন থেকে উৎসরিত। এই মর্মকথা মর্মে ধারণ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনাকে ধারণ করে উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণে কোন নেতা, কোন রাজনৈতিক দল উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারবে, সেই সিদ্ধান্ত তরুণ প্রজন্মকে ভেবেচিন্তে নিতে হবে। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ১১ বছর ধরে নানা প্রতিকূলতা পায়ে দলে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় তিন গুণ করেছেন, স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করেছেন তাই তাঁকেই নতুন প্রজন্ম সমর্থন দেবে।

লেখক : রাজনৈতিক বিশ্লেষক

আওয়ামী লীগের জন্ম অনিবার্য ছিল

প্রফেসর আবদুল মান্নান

আজ দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এই দিনে স্মরণ করছি প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যদের, যাঁদের অসাধারণ দূরদর্শিতার ফলে এই দিনে ১৯৪৯ সালে ঢাকার রোজ গার্ডেনে দেশ ভাগের পর প্রথম রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এবং সবশেষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছিল। আর আওয়ামী লীগ হচ্ছে এই উপমহাদেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল, যেটির নেতৃত্বে একটি রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালিদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। এই স্বাধীনতার জন্য যাঁরা রক্ত দিয়েছেন সেই ৩০ লাখ শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

দেশের একটি কঠিন সময়ের মধ্যে এই বছর ঐতিহাসিক দলটি তার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করছে। হয়তো চিরাচরিত কোনো অনুষ্ঠান হবে না। সাধারণত এদিন প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দলের নেতাদের নিয়ে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে সম্মান জানান। এবার হয়তো হবে না কোনো সভা-সমাবেশ। হতে পারে তিনি কিছু কাজ ভিডিওর মাধ্যমে করবেন। এমন কঠিন সময় শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বে এর আগে কখনো আসেনি। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী শুধু মুক্তিযুদ্ধের সময় পালন করা হয়নি, কারণ তখন তা করার পরিবেশ ছিল না। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়া যখন আওয়ামী লীগের নাম নেওয়াকে অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন, তখনো দলের কিছু নিবেদিতপ্রাণ নেতা ও কর্মী দিনটিকে ঘরোয়াভাবে পালন করেছেন।

আওয়ামী লীগ কেবল এ দেশেই নয়, সারা ভারতবর্ষে একমাত্র জাতীয় দল, যার জন্ম এই মাটিতেই এবং তার একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

ছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয় এক ইংরেজ বেসামরিক আমলা অ্যালেন অক্টোবিয়াস হিউম দ্বারা ১৮৮৫ সালে। উদ্দেশ্য ভারতীয়দের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর সম্পর্কোন্নয়ন। ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব আর বনেদি বিত্তশালীরা গঠন করেন মুসলিম লীগ তাঁদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের পর ভারতে গঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২০ (মতান্তরে ১৯২৫ সালে) সালে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের চিন্তাধারার মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত দখলপ্রক্রিয়া শুরু করে। পরবর্তী ১০০ বছরে তারা নানা ছলচাতুরী ও বিশ্বাসঘাতকতা করে বস্তুতপক্ষে সারা ভারতবর্ষ দখল করে নেয়। ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধের পর (ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বলেন সিপাহি বিদ্রোহ) ভারতের শাসনভার কোম্পানি থেকে ব্রিটিশ রাজপরিবারের কাছে চলে যায়। ১৮৫৭ সালের পর ইংরেজরা বুঝতে পারে দীর্ঘ ১০০ বছর ধরে ভারতীয়রা তাদের কারণে যে বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে, তাতে সাধারণ জনগণের মাঝে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের ক্ষোভ বিরাজ করছে। তাদের এই ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য তারা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ধীরে ধীরে ভারতীয়রা শিক্ষা-দীক্ষায় একটু উন্নতি লাভ করলে তারা বুঝতে পারে ইংরেজ শাসকরা কীভাবে এবং কত উপায়ে তাদের শোষণ করছে। তখন প্রথমে কংগ্রেস এই শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহ বিলাত থেকে পড়ালেখা শেষ করে এসে প্রথমে কংগ্রেসে যোগ দেন; কিন্তু তাদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের মতো একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে অনেকটা ছিনতাই করে তাকে একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করেন।

জিন্নাহ অত্যন্ত চালাক ও ধূর্ত ছিলেন। আর ছিলেন চরম ক্ষমতালোভী। ভারত ভেঙে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে তিনি একাধারে পাকিস্তানের বড়লাট ও সংসদের প্রেসিডেন্ট (স্পিকার) হয়েছিলেন। খুব করুণ অবস্থায় জিন্নাহর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর শেষ দিনগুলো জানতে হলে পড়তে হবে তাঁর বোন ফাতেমা জিন্নাহর লেখা জিন্নাহর জীবনী 'মাই ব্রাদার'। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি চাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল তাঁদের বিশাল পারিবারিক জমিদারি রক্ষা করা। এই জমিদারি পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বাংলার মুসলমানরা এই পাকিস্তান আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন এটি চিন্তা করে, নিজেদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমি হলে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে। পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙালি মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষাসহ সব কিছুতেই পিছিয়ে পড়েছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কৃষিভূমির মালিক ছিল হিন্দু জোতদার জমিদার, মহাজনরা। বেশির ভাগ মুসলমান তাদের জমিতে বর্গাচাষ করত। নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন আবাসভূমির স্বপ্ন দেখে তারা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিল।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সৃষ্টি হলে তারা দেখেছিল তাদের সেই স্বপ্ন ছিল ভ্রান্ত আর অনেকটা কল্পনাবিলাস। মুসলমানদের জন্য যখন পৃথক আবাসভূমি নিয়ে ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে জিন্নাহ দেনদরবার করছেন, তখন ১৯৪০ সালের লাহোর মুসলিম লীগের সম্মেলনে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে উপমহাদেশে যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, প্রতিটি পৃথক রাষ্ট্র হবে এবং পরবর্তীকালে প্রয়োজনে কনফেডারেশনও করতে পারে। বর্তমান পাকিস্তানের কোনো প্রদেশই তখন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ ছিল না একমাত্র অবিভক্ত বাংলা ছাড়া। জিন্নাহর এক প্রতারণার মাধ্যমে ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে মুসলিম লীগের এক বিশেষ কাউন্সিল সভায় লাহোর প্রস্তাবকে পরিবর্তন করে মুসলমানদের জন্য একাধিক নয়, একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে, যার ফলে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অথচ কলকাতায় যেসব মুসলমান বাঙালি একাধিক পৃথক আবাসভূমির জন্য আন্দোলন করছিলেন (তরুণ শেখ মুজিব তখন রাজপথের একজন কর্মী) তাঁদের ধারণা ছিল অবিভক্ত বঙ্গ পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হবে, কারণ তখন সমগ্র ভারতবর্ষে এই বঙ্গই একমাত্র মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ ছিল। বাংলার মুসলিম লীগ নেতারা মেনে নিলেন, কারণ তাঁদের ধারণা, স্বাধীন হলে বদলে যাবে তাঁদের ভাগ্য। তখন বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী) ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, যিনি পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের সভাপতি হয়েছিলেন (ভারপ্রাপ্ত)। কিছুদিনের জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও।

পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানদের মোহ ভাঙতে বেশিদিন সময় লাগেনি। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে জিন্নাহ ঢাকা এসে রমনা রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় ইংরেজিতে ঘোষণা করলেন, পাকিস্তানের ৬ শতাংশ মানুষের ভাষা, যারা মূলত উত্তর প্রদেশ ও বিহার থেকে পাকিস্তানে মোহাজের হিসেবে এসেছে তাদের ভাষা উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, যার অর্থ

হচ্ছে রাতারাতি বাকি ৯৪ শতাংশ মানুষ সরকারি সব কাজকর্ম থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। এর প্রথম প্রতিবাদ সেই জনসভায়ই হয়। একই দিন সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হলে জিন্নাহর সংবর্ধনা সভায় তিনি আবারও একই কথা বলেন। এবার উপস্থিত ছাত্ররাই, যাঁর মধ্যে তরুণ শেখ মুজিবও ছিলেন জিন্নাহর এই বক্তব্যে প্রতিবাদ করেন। বস্তুতপক্ষে ১৯৪৮ সালেই শুরু হয় বাঙালির জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের সূত্রপাত। আন্দোলন করতে চাই সংগঠন। শেখ মুজিব অন্য ছাত্রনেতাদের নিয়ে গঠন করলেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। ছাত্রদের সংগঠন নিয়ে কোনো রাষ্ট্রীয় আন্দোলন বেশি দূর নিয়ে যাওয়া কঠিন মনে হয়েছিল তরুণ ছাত্রনেতাদের। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন জন্ম হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। এর পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল শেখ মুজিবের। সভাপতি মওলানা ভাসানী, আর সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক। যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিব। শুরু থেকেই আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার আদায় ও সেই লক্ষ্যে পাকিস্তানের এই অংশসহ প্রতিটি প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন।

১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দলটি এ বছর ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করবে এক ভিন্ন পরিস্থিতিতে। এ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ। অনেক বড় ধরনের বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সবকিছু এখন অনেকটা তোলা আছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী তো আর তোলা থাকতে পারে না। এই ৭১ বছরে এই দলটি হাজারো প্রতিকূলতার মাঝেও যা অর্জন করেছে তা এই উপমহাদেশের অন্য কোনো রাজনৈতিক দল অর্জন করতে পারেনি। ভেঙেছেও একাধিকবার। নিষিদ্ধ হয়েছে অন্তত ছয়বার। ১৯৫৪, ১৯৫৬ বা ১৯৭০ নির্বাচনের প্রদেশ কিংবা কেন্দ্রে জয়লাভ করেও পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাদের ষড়যন্ত্রের কারণে ক্ষমতায় যেতে পারেনি। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অনেকের সঙ্গে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা রাজপথে বুকের রক্ত দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে এই দলটির নেতৃত্বে বাঙালি নিজের মাতৃভূমি স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধে গিয়েছিল। এই দলই জাতিকে উপহার দিয়েছিল হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বঙ্গবন্ধুর অন্যতম বড় কীর্তি ১৯৬৬ সালে বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা ঘোষণা, যার ভিত্তিতে ১৯৭০-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আওয়ামী লীগ যখনই নির্বাচনে বিজয় লাভ করেছে তখনই মানুষ কিছু পেয়েছে। ১৯৭০-এর নির্বাচনের পর বাঙালি একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছে।

কিন্তু সেই স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু বেঁচে ছিলেন সাড়ে তিন বছর। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পাকিস্তানের প্রেতাত্মারা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পুরো পরিবারকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করে। বেঁচে যান বিদেশে থাকা তাঁর দুই কন্যা আজকের ক্রান্তিকালের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। দীর্ঘ ২১ বছর পর বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা একটি নির্বাচনের মাধ্যমে দলটিকে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছিলেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আওয়ামী লীগের অর্জন আছে অজস্র। কিন্তু অনেক সময় কাছের মানুষরাই অনেক কিছু পণ্ড করে দিয়েছেন। আশা করব ৭১তম জন্মবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুকন্যা সব প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে দেশকে আরো উন্নত শিখরে নিয়ে যাবেন। এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতাকর্মীদের প্রতি অভিবাদন। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার প্রতি রইল ভালোবাসা। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা এক বিস্ময়কর স্থানে নিজেদের জন্য জায়গা করে নিয়েছেন। সেই স্থানটুকু তাঁদের জন্য নির্ধারিত যেমনভাবে অনিবার্য ছিল আওয়ামী লীগের জন্ম।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

লেখক : সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা ও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছর দশ মাসের মধ্যে পুরনো ঢাকায় ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন অনুষ্ঠিত এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আওয়ামী লীগ বিগত ৭১ বছর ধরে রাজনীতির অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। আওয়ামী লীগের ইতিহাস সংগ্রাম, সৃষ্টি, অর্জন ও উন্নয়নের ইতিহাস। আওয়ামী লীগ ছিল পাকিস্তানে প্রথম কার্যকর কোনো বিরোধী দল। শুধু তা-ই নয়, আওয়ামী লীগের যাত্রাই শুরু হয় বাঙালিদের স্বার্থের সত্যিকার ও আপসহীন প্রতিনিধি হিসেবে। তখন পাকিস্তান রাষ্ট্রে কোনো বিরোধী দল গঠন কিছুতেই সহজসাধ্য ছিল না। শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু আর সকল বাধা-প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের শুধু প্রতিষ্ঠা লাভই সেদিন ঘটেনি, অতি দ্রুত এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কী করে এটি সম্ভব হলো? এর প্রতিষ্ঠার পটভূমিই-বা কী? আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করতে ও এর মূল লক্ষ্য অর্জনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান কী ছিল? এসব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে এ নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

পটভূমি

৪০-এর দশকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অভ্যন্তরীণভাবে দ্বিধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে, সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপ বনাম ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা নাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন গ্রুপ, যা খাজা গ্রুপ নামে পরিচিত ছিল। এ ছিল একদিকে মধ্যবিত্ত, অন্যদিকে অভিজাত-জমিদারি স্বার্থের দ্বন্দ্ব। অনেকে একে 'জনগণ' বনাম 'প্রাসাদ' দ্বন্দ্ব হিসেবে আখ্যায়িত করেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ও দৈনিক আজাদ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী মওলানা

মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছিলেন খাজা গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় অবাঙালি নেতৃত্বের সমর্থন-সহানুভূতিও ছিল এদের প্রতি। সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের পেছনে ছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত ও ছাত্র-তরুণদের নিয়ে গঠিত এক বিশাল কর্মী বাহিনী। এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরাই ছিলেন বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের মূল শক্তি। সোহরাওয়ার্দীর প্রত্যক্ষ সমর্থন নিয়ে ১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরপর বাংলায় লীগকে সুদৃঢ় সাংগঠনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে তিনি নিজেকে সার্বক্ষণিকভাবে নিবেদিত করেন। তাঁর প্রগতিশীল নেতৃত্বের কারণে শতশত ছাত্র-যুবক দলের সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে। তাদের কাজকর্ম, থাকা-খাওয়া চালিয়ে নেওয়ার জন্য ছিল 'পার্টি হাউস'। ঢাকার ১৫০ মোগলটুলী পার্টি হাউস ছিল পূর্ব বাংলার তরুণ লীগ কর্মীদের প্রধান কেন্দ্র। ১৯৪৪ সালে আবুল হাশিমের নির্দেশে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। খাজা গ্রুপের হেডকোয়ার্টার্স ঢাকার 'আহসান মঞ্জিল'-এর বিপরীতে 'মোগলটুলী ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' বা 'পার্টি হাউস' গড়ে উঠেছিল।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম প্রথমে পাকিস্তানে না এসে ভারতে থেকে যান। এর মূলে ছিল মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিদ্বেষী আচরণ। আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ১৯৪৭ সালের ৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে পূর্ব বাংলার জন্য মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সোহরাওয়ার্দীর স্থলে লীগ হাইকমান্ডের প্রিয়ভাজন খাজা নাজিমউদ্দিন নতুন নেতা নির্বাচিত হয়ে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন। এমনকি ১৯৪৮ সালের জুন মাসে সোহরাওয়ার্দী পেশাগত কারণে একবার ঢাকা এলে তাঁকে জোর করে স্টিমারে তুলে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানের গণপরিষদ থেকে তাঁর সদস্যপদ পর্যন্ত বাতিল ঘোষণা করা হয়। যাহোক, এ সময় ১৫০ মোগলটুলী ওয়ার্কার্স ক্যাম্প বা পার্টি হাউস ছিল সোহরাওয়ার্দী-হাশিম সমর্থক ছাত্র ও তরুণ কর্মীদের মিলন কেন্দ্র। এখান থেকে তাঁরা ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপন্থা স্থির করেন। এভাবে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণতান্ত্রিক যুবলীগ এবং ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগ ও নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে (১৯৫৩

সালে সংগঠনের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়া হয়)। উল্লেখ্য, দেশ বিভাগের পর সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৪৭) বঙ্গবন্ধু কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং প্রথমে ১৫০ মোগলটুলী পার্টি হাউসে ওঠেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী সরকারি দল মুসলিম লীগকে কার্যত একটি 'পকেট সংগঠন' বানিয়ে রাখে। লীগের ত্যাগী, পরীক্ষিত নেতাকর্মী, যাদের অধিকাংশ সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের দলে বা সরকারের কোথাও কোনো স্থান হলো না। উদ্ভূত অবস্থায় করণীয় স্থির করার লক্ষ্যে টাঙ্গাইল ও নারায়ণগঞ্জে প্রগতিশীল মুসলীম লীগ কর্মীদের দুটি সভাও ডাকা হয়েছিল।

যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালিরা সর্বাত্মক সমর্থন জ্ঞাপন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছিল, ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান তাদের সেই প্রত্যাশিত রাষ্ট্র ছিল না। পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে তাদের রাষ্ট্রভাবনা ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতের পূর্বাঞ্চলে (বর্তমান বাংলাদেশ ও তদ্‌সংলগ্ন এলাকা) একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। সে লক্ষ্যে দেশ বিভাগের প্রাক্কালে অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম এবং কংগ্রেসের এককালীন কেন্দ্রীয় নেতা ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু, প্রাদেশিক কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি দলের নেতা কিরণ শংকর রায়, কংগ্রেস নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জে এম সেন গুপ্ত প্রমুখদের সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের বাহিরে তৃতীয় 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্র-তরুণ নেতা হিসেবে এ উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত থেকে কলকাতায় স্বাধীন বাংলার পক্ষে একাধিক ছাত্র-জনতার সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। শর্ত সাপেক্ষে ব্রিটিশ সরকারের 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠায় এক ধরনের সম্মতি থাকলেও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বের অবাঙালি হাইকমান্ডের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবে সে উদ্যোগ সফল হতে পারেনি। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Harun-or-Rashid, The Foreshadowing of Bangladesh : Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1906-1947, UPL 2003, pp. 257-322)।

শুরু থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের ওপর নেমে আসে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণ, আঞ্চলিক বৈষম্য ও জাতি-

নিপীড়ন। পাকিস্তানের স্বাধীনতাকে বঙ্গবন্ধু আখ্যায়িত করেছিলেন 'ফাঁকির স্বাধীনতা' বলে। সামগ্রিকভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের অবস্থা দাঁড়ায়, বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, 'এক শকুনির হাত থেকে আরেক শকুনির হাতে পড়া'র মতো। বাংলাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'–পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এই ভাষানীতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে তাদের বাংলা ও বাঙালিবিদ্বেষী ঔপনিবেশিক চরিত্রের প্রকাশ ঘটে। এদিকে রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর শাসকগোষ্ঠীর জুলুম-নির্যাতন চলছিলই। এমতাবস্থায় বিভাগপূর্ব বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী-হাশিম সমর্থকরা একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে থাকেন। অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান সংগঠক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ সময়ে ভারতে অবস্থান করলেও ঢাকার মোগলটুলী ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মী-সংগঠকদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। এদিকে পাশাপাশি সময়ে আরও দুটি ঘটনা বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করেছিল। এর একটি হলো, ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্বদানের কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য ছাত্র নেতৃবৃন্দকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং অপরটি একই মাসে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগের প্রার্থী জমিদার পরিবারের খুররম খান পন্নীকে পরাজিত করে ১৫০ নম্বও মোগলটুলী পার্টি হাউসের প্রগতিশীল লীগ কর্মীদের প্রধান সংগঠক শামসুল হকের (টাঙ্গাইলের শামসুল হক নামে খ্যাত) বিজয় অর্জন। শেষের ঘটনাটি মুসলিম লীগ সরকারবিরোধী লীগ নেতাকর্মীদের বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করে।

রোজ গার্ডেনের কর্মী সম্মেলন

পুরনো ঢাকায় যে রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা, তার জন্য ঢাকা শহরের কোথাও হল বা স্থান না পাওয়া যাওয়ায় কে এম দাস লেনের কে এম বশির ওরফে হুমায়ুন সাহেবের প্রাইভেট বাড়ি 'রোজ গার্ডেন'-এ ২৩ ও ২৪ জুন ১৯৪৯ ওই কর্মী সম্মেলন আহ্বান করা হয়। আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাবেক সভাপতি ও মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মুসলীম লীগ সরকারবিরোধী ত্যাগী নেতাকর্মীদের সঙ্গে পূর্বেই একাত্মতা ঘোষণা করেন। সম্মেলন যাতে সফল না হতে পারে সেজন্য সরকার ও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের অপচেষ্টার অন্ত ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী, ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ এবং সিটি মুসলিম লীগের সভাপতি সৈয়দ সাহেবে আলম ২১ জুন ১৯৪৯ এক বিবৃতিতে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের 'ক্ষমতালোভী', 'পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্টকারী', 'মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী' ইত্যাদি আখ্যায়িত করে ওই সম্মেলনে যোগদান বা কোনোরূপ সংশ্লিষ্টতা না রাখার জন্য পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগণ বিশেষ করে ঢাকাবাসীর উদ্দেশে যৌথ আহ্বান জানিয়ে বলেন–'মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেবের দ্বারা আগামী ২৩ শে ও ২৪ শে জুন তারিখে ঢাকায় মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনের নামে যে সভা আহূত হইয়াছে তাহার সহিত মুসলিম লীগের কোন সম্পর্ক নাই। বস্তুত ইহা দলগত স্বার্থ ও ক্ষমতালাভের জন্য মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টির দ্বারা মুসলমান সংহতি নষ্ট করিয়া পাকিস্তানের স্থায়িত্ব এবং অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে আহূত হইয়াছে।' (আজাদ, ২২ শে জুন ১৯৪৯, পৃ. ৬)।

কর্মী সম্মেলনের পাঁচ দিন পূর্বে তড়িঘড়ি করে ১৮-২০ জুন কার্জন হলে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল সম্মেলন আহ্বান করা হয়। ওই সম্মেলনেও সরকারবিরোধী লীগ কর্মী সম্মেলন আহ্বানের নিন্দা ও মুসলমানদের তাতে যোগদান করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

যাহোক, আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রোজ গার্ডেনের কর্মী সম্মেলনে প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি যোগ দেন। অনেক রাজনৈতিক নেতাও যোগ দিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, খয়রাত হোসেন এমএলএ, বেগম আনোয়ারা খাতুন এমএলএ, আলী আহমেদ খান এমএলএ, আল্লামা রাগীব আহসান, হাবিবুর রহমান চৌধুরী ওরফে ধনু মিয়া প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সম্মেলনের প্রথম দিনেই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি, টাঙ্গাইলের শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে (জেলে বন্দি অবস্থায়) যুগ্ম সম্পাদক ও ইয়ার মোহাম্মদ খানকে কোষাধ্যক্ষ করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করা হয় (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, হারুন-অর-রশিদ, মূলধারার রাজনীতি : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬, বাংলা একাডেমি ২০১৬)। 'আওয়াম' শব্দের অর্থ জনগণ আর 'লীগ' মানে ঐক্য বা সম্মিলনী। অর্থাৎ সরকারি মুসলিম লীগের বিপরীতে

জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা। দলের প্রতিষ্ঠাকালীন সহসভাপতিগণ ছিলেন আতাউর রহমান খান, আব্দুস সালাম খান, আলী আহম্মদ খান, আলী আমজাদ খান ও সাখাওয়াত হোসেন।

নতুন এ দলের জন্য ৪০ সদস্যবিশিষ্ট একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়। দলের নবনির্বাচিত কর্মকর্তা ছাড়াও বেগম আনোয়ারা খাতুন এমএলএ, খয়রাত হোসেন এমএলএ, আব্দুল হামিদ চৌধুরী, মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, নারায়ণগঞ্জের আব্দুল আউয়াল, আলমাস আলী, শামসুজ্জোহা প্রমুখ এর সদস্য ছিলেন। সরকারি হয়রানি-গ্রেফতারের ভয়ে কমিটির বেশ কিছু সদস্য অচিরেই বিবৃতি দিয়ে পদত্যাগ করেন। তাঁদের মধ্যে সাখাওয়াত হোসেন ও এ কে এম রফিকুল ইসলাম ছিলেন। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর আর্থিক অসুবিধা ও সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেলের চাকরিটি তাঁর প্রয়োজন এ কথা বলে তিনিও ওয়ার্কিং কমিটি থেকে অব্যাহতি নেন।

রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন, নতুন দলের প্রতিষ্ঠা ও এর সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু এভাবে বর্ণনা করেন : "...পুরানা লীগ কর্মীরা মিলে এক কর্মী সম্মেলন ডাকল ঢাকায়–ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন সে সভা আহ্বান করা হয়েছিল... আমরা জেলে বসেই সে খবর পাই... আমরা সম্মেলনের ফলাফল সম্বন্ধে খুবই চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলাম। আমার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল, আমার মত নেওয়ার জন্য। আমি খবর দিয়েছিলাম, 'আর মুসলিম লীগের পিছনে ঘুরে লাভ নাই, এ প্রতিষ্ঠান এখন গণবিচ্ছিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরা আমাদের... নিতে চাইলেও যাওয়া উচিত হবে না। কারণ এরা কোটারি করে ফেলেছে। একে আর জনগণের প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। এদের কোনো কর্মপন্থাও নাই।' আমাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমি ছাত্র প্রতিষ্ঠান করব, না রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন হলে তাতে যোগদান করব? আমি উত্তর পাঠিয়েছিলাম, ছাত্র রাজনীতি আমি আর করব না, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই করব। কারণ বিরোধী দল সৃষ্টি করতে না পারলে এ দেশে একনায়কত্ব চলবে... সকলেই একমত হয়ে নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন; তার নাম দেওয়া হল, 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী [মুসলীম] লীগ।' মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতি, জনাব শামসুল হক

সাধারণ সম্পাদক এবং আমাকে করা হল জয়েন্ট সেক্রেটারী। খবরের কাগজে দেখলাম, আমার নামের পাশে লেখা আছে, 'নিরাপত্তা বন্দি'।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১২০-১২১)।

'মুসলিম' শব্দ যুক্ত করে নব প্রতিষ্ঠিত দলের নামকরণ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু বলেন : 'আমি মনে করেছিলাম, পাকিস্তান হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নাই। একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে, যার একটা সুষ্ঠু ম্যানিফেস্টো থাকবে। ভাবলাম, সময় এখনও আসে নাই। তাই যারা বাইরে আছেন তারা চিন্তাভাবনা করেই করেছেন।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১২১)

উল্লেখ্য, আলোচ্য রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন সফল করতে পুরনো ঢাকার দুই কৃতি সন্তান ও নিবেদিতপ্রাণ লীগ কর্মী শওকত আলী ওরফে শওকত মিয়া (১৫০ মোগলটুলী পার্টি হাউসের স্বত্বাধিকারী) ও ইয়ার মোহাম্মদ খান (কারকুন বাড়ি লেন) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শুরুর দিকে শওকত আলীর বাড়িই ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিস।

আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে শামসুল হক 'মূল দাবি' নামে একটি পুস্তিকা ছাপিয়ে বিবেচনার জন্য তা পেশ করেন। পরবর্তীতে কিছু পরিবর্তন-পরিমার্জন করে খসড়া ম্যানিফেস্টো আকারে তা গৃহীত হয়। এর প্রধান দিকসমূহ ছিল : পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, পূর্ণ গণতন্ত্র, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গঠিত দুটি পৃথক আঞ্চলিক ইউনিট এবং এর জন্য পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, জনগণের সার্বভৌমত্ব, সকল সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার সমান অধিকার, সভা-সমাবেশ-সংগঠনসহ পূর্ণ বাকস্বাধীনতা, সর্বজনীন ভোটাধিকার, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যেকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা, বিভিন্ন স্থানে পর্যাপ্ত কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বিপুলসংখ্যক যুবকের কারিগরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, সারা দেশে দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গরিবদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা, বৃদ্ধ, অনাথ, অক্ষম, দুস্থদের রক্ষণাবেক্ষণে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সর্বক্ষেত্রে নারীর সম অধিকার, মাতৃমঙ্গল, শিশুসদন ও শিশু শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মুসলিম দেশসমূহের

পাশাপাশি প্রতিবেশি রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, বিশ্ব শান্তি রক্ষা, পাট, চা, ব্যাংক, বীমা, যানবাহন, বিদ্যুৎ, খনিজ সম্পদসহ প্রাথমিক শিল্প জাতীয়করণ, সমবায় ও যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন, ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ গ্রহণ ইত্যাদি। এছাড়া আশু লক্ষ্য ও কর্মসূচি হিসেবে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টন, মূল শিল্প জাতীয়করণ, প্রশাসন ও সমাজ থেকে দুর্নীতি দূরীকরণ, প্রশাসনের ব্যয় হ্রাস, কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে রাজস্বের ন্যায্য বণ্টন ইত্যাদি তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যাহোক, কর্মী সম্মেলনের পর দ্রুত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের মধ্যে যে দুটি ধারার সৃষ্টি হয়েছিল (যা পূর্বে উল্লেখিত), এর মধ্যে সোহরাওয়ার্দী-হাশিম সমর্থক হিসেবে পরিচিত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রগতিশীল অংশের নেতাকর্মীরা জেলায় জেলায় এ সময়ে নতুন প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে সংগঠিত হতে থাকে। স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশজুড়ে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক রূপ লাভের ক্ষেত্রে এই বিশেষ অবস্থা খুবই অনুকূল হয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন গণদাবি যেমন বিদ্যমান খাদ্যসংকট নিরসনের ব্যাপারে সভা-সমাবেশ, ভুখা মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারের ওপর অব্যাহত চাপ প্রয়োগের নীতি গ্রহণ করায় নতুন এ দলের প্রতি দ্রুত জনসমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতর প্রতিষ্ঠা লাভ করায় আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার শুরুতে নামের সঙ্গে 'মুসলিম' শব্দ যুক্ত রাখতে হয়েছিল। তবে ১৯৫৫ সালে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে (তখন তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক) দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে সংগঠনের সদস্য পদ সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়। বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিস্তারিত কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাই ছিল বাঙালিদের দল হিসেবে। এর চেতনামূলে ছিল বাঙালির জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা। স্বল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দলের নেতৃত্বের অগ্রভাগে চলে আসেন। ১৯৫২ সালে তিনি দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৫৩-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ১৩ বছর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৬৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে সভাপতি

নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগকে তৃণমূল পর্যায় থেকে শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে বাঙালির জাতীয় মুক্তির মঞ্চে পরিণত করতে তিনি সর্বশক্তি নিয়ে আত্মনিয়োগ করেন। এমনকি এজন্য ১৯৫৭ সালে মন্ত্রিত্বের পদ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদকের পদে নিজেকে বহাল রেখেছিলেন। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধোত্তর তাঁর বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা কর্মসূচি (১৯৬৬) (দ্রষ্টব্য হারুন-অর-রশিদ, 'আমাদের বাঁচার দাবি : ছয় দফা'র ৫০ বছর', বাংলা একাডেমি ২০১৬), তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা (১৯৬৮) মোকাবিলা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচনে ছয় দফা প্রশ্নে বাঙালিদের আওয়ামী লীগের পক্ষে গণরায় বা ম্যান্ডেট লাভ ও বিপুল বিজয় অর্জন, 'নির্বাচনের রায় বানচাল করতে ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর ২-২৫ মার্চ ১৯৭১ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক, ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণে বাঙালিদের প্রতি আহ্বান, ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্ত বঙ্গবন্ধুর সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ গঠিত মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। এরই সঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার অন্তর্নিহিত চেতনা এবং বাঙালি ও বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ লালিত নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন ঘটে। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য এখানেই।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা'। দেশের ঐতিহ্যবাহী, বৃহত্তম ও জনগণের দল আওয়ামী লীগের ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এটিই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

লেখক : উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

১৫ই আগস্ট : নেপথ্য জানতে কমিশন চাই

মনজুরুল আহসান বুলবুল

দাবিটি অনেক দিনের। বিষয়টি জরুরি, ইতিহাসের স্বার্থেই।

কবিরা কি অন্তর্যামী হন? দেশের তখ্‌তে তখন লেবাস পাল্টে সেনাশাসক। জাতির পিতার খুনে রাঙ্গা বাংলায় ঘাতকদের উল্লাস। ১৬ জুলাই ১৯৭৮ এক তরুণ ছড়াকার লেখেন : 'রক্তঝরার অভিষেকে বসেছিলে তখ্‌তে/ তোমার মরণ হবেই বাবা/ এমনি ধারার রক্তে'।

মাত্র তিন বছরের মাথায় ছড়ার ছন্দ সত্য প্রমাণিত হলো। ১৯৮১-তে উল্টে গেল তখ্‌ত। রক্তের অভিষেকে যিনি তখ্‌তে বসেছিলেন রক্তেই তাঁর পরিসমাপ্তি। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে জানা হয় না, এই ক্ষমতায় যাওয়ার রক্তের সিঁড়িটি তৈরির ক্ষেত্রে নেপথ্যে কার কী ভূমিকা ছিল।

পদ্মায় মেঘনায় অনেক জল গড়ায়। জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়। সময় লাগে প্রায় ১২ বছর। কিছু খুনির ফাঁসি হয়েছে, কিছু খুনি পালিয়ে আছে। কেউ কেউ এমন বলেন, এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের মধ্য দিয়ে জাতি দায়মুক্ত হয়েছে। আমি বলি, শেখ মুজিবকে হত্যার মধ্য দিয়ে জাতি যে অপরাধ করছে, তা থেকে এই জাতির কোনোদিন মুক্তি নেই। মুজিব হত্যার পাপের গ্লানি এই জাতিকে বয়ে বেড়াতে হবে অনাদিকাল। তবুও খুনের বিচারটা তো হয়েছে। কিন্তু সেই বিচারটাও কি পুরোপুরি হয়েছে? জবাব হচ্ছে : 'না'। প্রকাশ্যে যাদের দেখি, সেই খুনিদের বিচার হয়েছে, কিন্তু এই হত্যা ও যড়যন্ত্রের নেপথ্যের কুশীলবদের বিচার আজও হয়নি। এমনকি প্রামাণিক সত্যি দিয়ে তাদের দায়ও নিরূপণ করা হয়নি।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় মাননীয় বিচারপতিগণের পর্যবেক্ষণ : খন্দকার মোশতাক আহমদের কুমিল্লার দাউদকান্দির বাড়ি ও কুমিল্লার বার্ড থেকে ষড়যন্ত্রের শুরু। এরই ধারাবাহিকতায় পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড। হত্যাকাণ্ডটি যথেষ্ট পরিকল্পনাভিত্তিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে করা হয়েছে।

ষড়যন্ত্রের চেহারা স্পষ্ট হয়, সেনানিবাসের বালুর ঘাটে। পঁচাত্তরের মার্চে যে ষড়যন্ত্রের শুরু, তার চূড়ান্ত পরিণতি আগস্টে মোশতাক আহমদের মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমে।

রায়ে এক সম্মানিত বিচারপতি বলেছেন : ষড়যন্ত্রের অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকলেই হবে যে, কোনো ব্যক্তির কার্যক্রম, বিবৃতি ও লেখা অপরাধ সংঘটনে ষড়যন্ত্র করেছে। কোনো ব্যক্তি কথা বা কাজের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে পারে। সকল ষড়যন্ত্রকারীকে অভিন্ন উদ্দেশ্যে একমত হতে হবে। আরেক সম্মানিত বিচারপতি বলেন, দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় অভিন্ন ইচ্ছার উপাদান হলো কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অপরাধমূলক কাজ করার জন্য কতিপয় ব্যক্তির মনের মিল। অভিমতে আরও বলা হয়, 'আমরা কখনোই নিশ্চিতভাবে জানব না, দণ্ডিতরা ছাড়া আর কে বঙ্গবন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। তাই এ মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণ সতর্কতার সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।'

এ সকল অভিমত অনুসরণ করেই কয়েকটি খণ্ডচিত্রে খুঁজে দেখার চেষ্টা; দণ্ডিতরা ছাড়াও এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে কারা, কীভাবে জড়িত। কাদের 'অভিন্ন ইচ্ছার মনের মিল' অপরাধটি সংঘটনে ভূমিকা রেখেছে।

সাংবাদিক এ এল খতিব তাঁর বিখ্যাত 'হু কিলড মুজিব' বইয়ে লিখছেন : [১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট সকালে] রেডিও স্টেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে মোশতাকের ভাষণের লিখিত কপি বিতরণ করা হয়। তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ ভাষণের কপিটি পড়ে তার প্রশংসা করেন। জবাবে মোশতাক বলেন : 'আপনার কি মনে হয় এ ভাষণটি এক দিনে লেখা হয়েছে?'

যে প্রশ্নের জবাব জানা জরুরি : কবে থেকে এই ভাষণের খসড়া প্রণয়ন শুরু হয়েছিল? কারা এই খসড়া প্রণয়ণের সাথে জড়িত? এই ভাষণের পরিকল্পনা আর ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা একই সূত্রে গাঁথা, সন্দেহ নেই।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার কয়েকজন সাক্ষীর বক্তব্যের কিছু অংশ তুলে ধরা যাক। কী বলছেন তাঁরা, কার বা কাদের নাম বলছেন, সেদিকে নজর দেওয়া জরুরি।

লে. কর্নেল (অব.) আবদুল হামিদ (তখন ঢাকার স্টেশন কমান্ডার ছিলেন) : ১৪ আগস্ট বিকেলে জেনারেল জিয়াউর রহমান, জেনারেল মামুন,

কর্নেল খোরশেদ ও আমি টেনিস খেলছিলাম। তখন আমি চাকরিচ্যুত মেজর ডালিম ও মেজর নূরকে টেনিস কোর্টের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখি।... জেনারেল সফিউল্লাহ আমাকে বলেন : এরা চাকরিচ্যুত জুনিয়র অফিসার, এরা কেন টেনিস খেলতে আসে? আমাকে তিনি বলেন, 'এদের মানা করে দেবেন, এখানে যেন এরা না আসে।' খেলা শেষে আমি মেজর নূরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা কার অনুমতি নিয়ে এখানে খেলতে আসো?' জবাবে নূর জানায়, জেনারেল জিয়ার অনুমতি নিয়ে তারা এখানে খেলতে আসে।

প্রশ্ন : একজন ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিশ্চয়ই সেনানিবাসের সাধারণ নিয়ম জানেন। চাকরিচ্যুতদের সাথে তাঁর কীই-বা সখ্য? কেন তিনি এদেরকে সেনানিবাসে খেলতে যাওয়ার অনুমতি দেন?

কর্নেল (অব.) শাফায়েত জামিল (৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার) : [১৫ আগস্ট সকালে] আমি দ্রুত ইউনিফরম পরে মেজর হাফেজসহ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের দিকে রওনা দিই। পথে জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসায় যাই। ঘটনা শোনার পর তিনি (জিয়া) বললেন, 'সো হোয়াট, প্রেসিডেন্ট ইজ কিলড; ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ দেয়ার, আপ হোল্ড দ্য কনস্টিটিউশন।'

জাতির পিতা হত্যার খবর শুনে, একজন নির্বিকার ডেপুটি চিফ অব স্টাফের সংবিধান রক্ষার এই নির্দেশনা কি এতটাই সহজভাবে নেওয়ার বিষয়?

মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিন আহম্মেদ (ডিজিএফআই ঢাকা ডিটাচমেন্টের ওসি ছিলেন) : ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর একটি কর্মসূচি পাই। ডিজিএফআই থেকে আমাকে বঙ্গবন্ধুর পারসোনাল বডিগার্ড হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।... ১৪ আগস্ট দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক লাইব্রেরি এলাকায় কয়েকটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

কারা সেদিন এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল? তার সাথে ১৫ই আগস্টের ঘটনার যোগসূত্রই বা কী?

জিয়াউদ্দিন বলছেন : আমি সেদিন [১৫ আগস্ট] সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে যাই। দেখতে পাই রাষ্ট্রপতির রুমে বসে খন্দকার মোশতাক, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, জেনারেল সফিউল্লাহ, জেনারেল জিয়াউর রহমান, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, এয়ার এবং নেভি চিফদ্বয়, মেজর ডালিম, মেজর শাহরিয়ার, মেজর রশিদ, মেজর ফারুক, মেজর নূর, মেজর মহিউদ্দিন

(ল্যান্সার), মেজর আজিজ পাশা আলোচনারত। এই সময় বিভিন্ন দেশের রেডিও মনিটরিং নিউজগুলি খন্দকার মোশতাকের কাছে এনে দেওয়া হয়। তিনি সবাইকে পড়ে শোনান যে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর আধাঘণ্টা হতে এক ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তান সরকার মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। এ সংবাদ শোনার পর মেজর ফারুক, মেজর রশিদ ও মেজর ডালিমকে উল্লসিত ও গৌরবান্বিত মনে হচ্ছিল।

এই উল্লাসের সূত্র ধরেই দেশের বাইরের কুশীলবদের চেহারা উন্মোচন খুবই সহজ।

মেজর জেনারেল (অব.) সফিউল্লাহ (সেনাপ্রধান) : '১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল আমাকে চিফ অব আর্মি স্টাফ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। জিয়াউর রহমানকে টেলিফোনে আমার দায়িত্ব পাওয়া ও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপের বিস্তারিত জানাই। জিয়া তখন বলেন, 'ওকে সফিউল্লাহ। গুড বাই।'... 'আমি যখনই কোনো অফিসারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে ব্যবস্থা নিয়েছি, তখন ওই সব অফিসার জেনারেল জিয়ার নিকট শেল্টার নিয়েছে।'

একজন চিফ অব স্টাফের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাদেরকে ডেপুটি শেল্টার দিচ্ছেন, সেটিও কি কোনো বড় চক্রান্তের আভাস নয়? চিফের কাছে শাস্তি পাওয়া কাউকে শেল্টার দেওয়া তো সেনা শৃঙ্খলারও পরিপন্থি।

লে কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমানের জবানবন্দি : ...তৎকালীন ডেপুটি চিফ অব আর্মি স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান আমার বাসায় হেঁটে আসতেন। তিনি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতেন এবং একসময় বলছিলেন, 'তোমরা ট্যাংকটুংক ছাড়া দেশের আর খবরাখবর রাখো কী?' আমি বলি, দেখতেছি তো দেশে অনেক উল্টা-সিধা কাজ চলছে। আলাপের মাধ্যমে আমাকে ইন্সটিগেট করে বলেছিলেন, 'দেশ বাঁচানোর জন্য একটা কিছু করা দরকার।'...এ নিয়ে মেজর রশীদের সঙ্গে দেশের অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, একমাত্র শেখ মুজিবকে ক্যান্টনমেন্টে এনে তাঁকে দিয়ে পরিবর্তন করা ছাড়া দেশে পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। এ ব্যাপারে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আলাপ করার সিদ্ধান্ত হয়। এপ্রিল মাসের এক রাত্রে তাঁর বাসায় আমি যাই। ...সাজেশন চাইলে তিনি [জিয়া] বলেন, 'আমি কী করতে পারি, তোমরা করতে পারলে কিছু করো।'... রশীদ পরে জিয়া ও খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মেজর রশীদ, ডালিম ও খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে আলোচনা করে যে,

বাকশালের পতন ঘটাতে হবে এবং প্রয়োজনে শেখ মুজিবকে হত্যা করতে হবে, নইলে দেশ ও জাতি বাঁচবে না। যৌক্তিকভাবে আমিও ধারণাকে সমর্থন করি। খন্দকার রশীদ জানায় যে, শেখ মুজিবকে হত্যা করতে পারলে জিয়াও আমাদের সমর্থন দেবে। ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট রাতে মিলিটারি ফার্মে নাইট ট্রেনিংয়ের সময় কো-অর্ডিনেশন মিটিং করে ১৫ আগস্ট ভোরে চূড়ান্ত অ্যাকশনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৫ আগস্ট ঘটনার পর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে চিফ অব আর্মি স্টাফ করার বিষয়ে সাইফুর রহমানের বাড়িতে মিটিং হয়। জিয়া, রশীদ ও সাইফুর রহমান মিটিং করেন। পরে জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট হবেন, সাইফুর ও রশীদ মন্ত্রী হবেন, ওই উদ্দেশ্যে জিয়াউর রহমানকে চিফ অব আর্মি স্টাফ করা হয়।

এই সাক্ষ্য থেকে কি স্পষ্ট হয় না যে, মূল খুনিদের নেপথ্যে কে, কীভাবে কাজ করেছে? দেশ বাঁচানোর নামে একটা কিছু করা এবং তার কে কী পেতে চান, সেই বাটোয়ারার চিত্রও তো স্পষ্ট।

লে. কর্নেল খন্দকার আবদুর রশীদের স্ত্রী জোবায়দা রশীদের জবানবন্দি : মেজর ফারুক জেনারেল জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করত ছোটবেলা থেকেই। একদিন রাতে মেজর ফারুক জিয়ার বাসা থেকে ফিরে আমার স্বামীকে জানায় যে, সরকার পরিবর্তন হলে জিয়া প্রেসিডেন্ট হতে চায়। জিয়া নাকি বলে 'ইফ ইট ইজ এ সাকসেস দেন কাম টু মি। ইফ ইট ইজ অ্যা ফেইলার দেন ডু নট ইনভলব মি। শেখ মুজিবকে জীবিত রেখে সরকার পরিবর্তন সম্ভব নয়।' এর কদিন পর মেজর ফারুক আমার বাসায় এসে রশীদকে বলে যে, জিয়া বলেছে, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব খুঁজতে হবে যে দায়িত্ব নিতে পারবে। সে মোতাবেক রশীদ খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ১৫ আগস্ট বিকেলে বঙ্গভবনে জেনারেল জিয়াউর রহমান রশীদের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল যাতে তাকে চিফ অব আর্মি করা হয়। ১৬ অথবা ১৭ তারিখ সাইফুর রহমানের গুলশানের বাসায় সাইফুর রহমান, আমার স্বামী ও জিয়ার উপস্থিতিতে জিয়াকে চিফ অব আর্মি স্টাফ করার বিষয় ঠিক হয়।

কুশীলবদের কার কী ভূমিকা সেটি বুঝতে আর কিছু কি বাকি থাকে?

তাহের উদ্দিন ঠাকুর (বঙ্গবন্ধুর সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী) : ১৯৭৫ সালের মে বা জুনের প্রথম দিকে ঢাকার গাজীপুর সালনা

হাইস্কুলে ঢাকা বিভাগীয় স্বনির্ভর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সালনাতে মোশতাক সাহেব সেনা অফিসারদের জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের আন্দোলনের অবস্থা কী?' জবাবে তারা জানায় যে, 'বস সবকিছুর ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আমরা তাঁর প্রতিনিধি...।' ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট খন্দকার মোশতাক বলেন, এ সপ্তাহে ব্রিগেডিয়ার জিয়া দুইবার এসেছিলেন। তিনি এবং তাঁর লোকেরা তাড়াতাড়ি কিছু একটা করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন।

জানা দরকার : 'বস'টি কে? একজন ব্রিগেডিয়ার কেন তাঁর সাথে দুইবার দেখা করতে গিয়েছিলেন? তাড়াতাড়ি কিছু করার জন্য কার বা কাদের এত তাড়া?

সীমিত পরিসরে কয়েকটি খণ্ডচিত্র বিশ্লেষণে যা বের হয়ে এলো, তাতে পরিষ্কার, ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডটি একটি রাতের ঘটনামাত্র নয়, কয়েকজন ঘাতকের কাজমাত্র নয়। নেপথ্যে আছেন বহু কুশীলব। দেশে ও দেশের বাইরে। দেশি ও বিদেশি।

এ তো গেল খুনিদের বিচারের সময়কার কথা। যদি দৃষ্টি দিই একটু আগে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে : ১৫ই আগস্টের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাবে না বলে খুনি মোশতাক একটি অধ্যাদেশ জারি করে ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। এটিই সেই কুখ্যাত' ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ'। ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল এই অধ্যাদেশটিকে সংবিধানের অংশ করে নেন সে সময়কার 'উর্দিখোলা' রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। এখানেই শেষ নয়, ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর যখন জাতীয় সংসদে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হলো তার বিরুদ্ধে রিট করেছিল খুনি কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমানের মা মাহমুদা রহমান ও আরেক খুনি কর্নেল শাহরিয়ার রশীদ খান। এই ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের সময় বিএনপি ও জামায়াত সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেছিল। জাতীয় পার্টির এমপি এন কে আলম চৌধুরী ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের আগে জনমত যাচাই করার প্রস্তাব করেন।

দেখা যাচ্ছে : খুনি মোশতাকের সাথে হত্যাপূর্ববর্তী ষড়যন্ত্র, হত্যা-পরবর্তী পদ-পদবি ও শেষে রাষ্ট্র ক্ষমতাপ্রাপ্তি, খুনের বিচার না করাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্তি, সংসদ থেকে ওয়াক আউট এবং বছরের পর বছর বিচার বিলম্বিত করার প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি বা দলের ভূমিকা সবই খুব স্পষ্ট।

১৯৮০ সালের ১ আগস্ট সেই তরুণ ছড়াকার আবার বলছেন : 'পালাবে কোথায়? কী দিয়ে মোড়াবে, বসে থাকা অই তখ্‌তো/ তোমার গায়ে, ছোপ ছোপ অই জনক খুনের রক্ত/ থু থু দিই আজ, অভিশাপ দিই, তোর বংশের গায়ে/ জনম জনম ফাঁসি চাই তোর, জনক খুনের দায়ে'। এই থুথু বর্ষণ চলছেই।

১৫ই আগস্টের ঘটনায় প্রত্যক্ষ কয়েকজন খুনির সাজা হয়েছে। কিন্তু দেশের ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের সব কুশীলবকে আনতে হবে প্রকাশ্যে। এমনকি তারা যদি মারাও গিয়ে থাকে, ইতিহাসের সত্যির খাতিরে তাদের দায় ও অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন একটি জাতীয় কমিশন গঠন। আজ এটিই জরুরি দাবি।

লেখক : সাংবাদিক

জুলিও কুরি বঙ্গবন্ধু

সুভাষ সিংহ রায়

১৯৭৩ সালের ২৩ মে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের উত্তর প্লাজায় উন্মুক্ত চত্বরে সুসজ্জিত প্যান্ডেলে বিশ্ব শান্তি পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক কূটনীতিদের বিশাল সমাবেশে বিশ্ব শান্তি পরিষদের তৎকালীন মহাসচিব রমেশ চন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রদান করেন। এরপর তিনি বলেন, 'শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন, আজ থেকে তিনি বিশ্ব বন্ধুও বটে।'

বঙ্গবন্ধুর আগে যাঁরা 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ফিদেল কাস্ত্রো, হো চি মিন, ইয়াসির আরাফাত, সালভেদর আলেন্দে, নেলসন ম্যান্ডেলা, ইন্দিরা গান্ধী, মাদার তেরেসা, কবি ও রাজনীতিবিদ পাবলো নেরুদা, জওহরলাল নেহেরু, মার্টিন লুথার কিং, নিওনিদ ব্রেজনভ প্রমুখ। আমরা জানি, মারি কুরি ও পিয়েরে কুরি ছিলেন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী। রেডিওলজির ওপর উইলিয়াম রঞ্জেনের আবিষ্কারের পথ ধরে কুরি দম্পতি তাঁদের গবেষণা চালিয়ে যান এবং পলোনিয়াম ও রেডিয়ামের মৌল উদ্ভাবন করেন। তাঁদের উদ্ভাবন পদার্থবিদ্যায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। বিশ্ব শান্তির সংগ্রামে এই বিজ্ঞানী দম্পতির মহান অবদান চিরস্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে বিশ্ব শান্তি পরিষদ ১৯৫০ সাল থেকে ফ্যাসিবাদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে, মানবতার কল্যাণে শান্তির সপক্ষে বিশেষ অবদানের জন্য বরণীয় ব্যক্তি ও সংগঠনকে জুলিও কুরি শান্তি পদকে ভূষিত করে আসছে। জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রদান অনুষ্ঠানে ভারতের ৩৫ জন প্রতিনিধির নেতা কৃষ্ণ মেনেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা জন রিড উপস্থিত ছিলেন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত ওই এশীয় শান্তি সম্মেলনের ঘোষণায় এই উপমহাদেশে শান্তি ও প্রগতির শক্তিগুলোর অগ্রগতি নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বিশ্ব শান্তি ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রদান এক বিরল ঘটনা। বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন বিশ্ব পরিস্থিতি, শান্তি, প্রগতি, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর এবং গণতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়েছিল এ সময় উপমহাদেশে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের ভেতর সৎ প্রতিবেশীমূলক সম্পর্ক স্থাপন ও উপমহাদেশে শান্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। মুক্তিযুদ্ধের কালপর্বে ভারত-সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি ১৯৭১ এবং বাংলাদেশ-ভারত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি ১৯৭২, বাংলাদেশের মৈত্রী সম্পর্কে এই উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তি স্থাপনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল।

পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিপরীতে বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ এবং শান্তি ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান গ্রহণের নীতির ফলে বাংলাদেশ বিশ্বসভায় একটি ন্যায়ানুগ দেশের মর্যাদা লাভ করে। সবার প্রতি বন্ধুত্বের ভিত্তিতে বৈদেশিকনীতি ঘোষণা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি যে অর্থ ব্যয় করে মানুষ মারার অস্ত্র তৈরি করছে, সেই অর্থ গরিব দেশগুলোকে সাহায্য দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে।'

সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির সভায় বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলন এবং বিশ্ব শান্তির সপক্ষে বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রদানের জন্য শান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশ চন্দ্র প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। পৃথিবীর ১৪০টি দেশের শান্তি পরিষদের ২০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদকে ভূষিত করার পেছনে বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আলী আকসাদেরও যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।

শান্তি পরিষদের ওই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের মে মাসে এশিয়ান পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি কনফারেন্স অনুষ্ঠান উপলক্ষে শান্তি পরিষদ ঢাকায় দুই দিনব্যাপী এক সম্মেলনের আয়োজন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

থেকে বিশ্ব শান্তি পরিষদের শাখাগুলোর বহু প্রতিনিধি এই সভায় মিলিত হন। এসব প্রতিনিধি ছাড়াও আপসো, পিএলও, এএমসি সোয়াপো ইত্যাদি সংস্থার অনেক প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন।

উপমহাদেশের শান্তি ও প্রগতি সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছিল দেশে-বিদেশে তাঁর বিভিন্ন বিবৃতিতে। ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে কলকাতায় তাঁর সম্মানে প্রদত্ত নাগরিক সংবর্ধনায় তিনি পাকিস্তানের প্রতি দৃষ্টি রেখে বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি না প্রতিশোধ গ্রহণে কোনো মহৎ কর্তব্য পালন করা যায়।' ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, সন্ধ্যায় কলকাতার রাজভবনে তাঁর সম্মানে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রদত্ত ভোজসভায় তিনি একটি ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমার একান্ত কামনা, উপমহাদেশে অবশেষে শান্তি ও সুস্থিরতা আসবে। প্রতিবেশীদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতার বন্ধ্যা নীতির অবসান হোক। আমাদের জাতীয় সম্পদের অপচয় না করে আমরা যেন তা আমাদের দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যবহার করি। দক্ষিণ এশিয়াকে একটি শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করায় আমরা সচেষ্ট রইব, যেখানে আমরা সুপ্রতিবেশী হিসেবে পাশাপাশি বাস করতে পারি এবং যেখানে আমাদের মানুষের মঙ্গলার্থে আমরা গঠনমূলক নীতিমালা অনুসরণ করতে পারি। যদি আমরা সেই দায়িত্বে ব্যর্থ হই, ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।' উপমহাদেশের উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে, যখন রণাঙ্গন থেকে রক্তের দাগও মুছে যায়নি, আঞ্চলিক সহযোগিতা বিকাশের এই উদাত্ত আহ্বান, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের একজন রাষ্ট্রনায়কের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আর পরিপক্কতার পরিচায়ক দেশে বঙ্গবন্ধু করেছিলেন একই কথার পুনরাবৃত্তি। ১৯৭৪ সালের মার্চের ৪ তারিখে তিনি কুমিল্লার দাউদকান্দিতে এক জনসভায় বলেছিলেন, 'এই উপমহাদেশে আমরা বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল আর শ্রীলঙ্কা মিলে শান্তিতে বসবাস করতে চাই। আমরা কারও সঙ্গে বিবাদ চাই না। আমরা স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে, আত্মমর্যাদার সঙ্গে একে অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে বাস করতে চাই। আমি চাই না যে আমাদের বিষয়াদিতে কেউ হস্তক্ষেপ করুক। আমরাও অন্যের বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নই।' ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসেই বার্মার (বর্তমানের মিয়ানমার) সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের জন্য বঙ্গবন্ধু সেই দেশে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। সেই দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন সেই সময়ে রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াঙ্গুন) বাংলাদেশের

রাষ্ট্রদূত খাজা কায়সার। প্রতিনিধিদলটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ফারুক চৌধুরী, সেই সময়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার হারুনুর রশিদ আর চিফ হাইড্রোগ্রাফার আবু হেনা। সেটাই ছিল মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সমঝোতার প্রথম পদক্ষেপ। আমরা এখন সবাই জানি, বঙ্গবন্ধু সমুদ্র আইন করেছিলেন ১৯৭৪ সালে আর জাতিসংঘ তা করেছে ১৯৮২ সালে। বঙ্গবন্ধুর ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৃজনশীল কূটনৈতিক দক্ষতায় ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধের নিষ্পত্তি করেছেন। এটি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার আরেকটি অনন্য সাধারণ উদাহরণ।

১৯৭৫ সালের মে মাসে জ্যামাইকার কিংস্টনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনের যুগ্ম ইশতেহারের ১৪ অনুচ্ছেদে রয়েছে একটি ঘোষণা। তাতে বলা হয়েছে যে কিছু অমীমাংসিত সমস্যার জন্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কষ্টের সৃষ্টি হয়েছে, হয়েছে জাতীয় পুনর্গঠনের গতি শ্লথ। তার মধ্যে রয়েছে 'মানুষের স্বদেশ পুনঃপ্রেরণ এবং সম্পত্তির বাটোয়ারা'। সেই ঘোষণায় কমনওয়েলথ সরকারপ্রধানরা আশা করেন যে 'সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর' মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যাবলির সমাধান ঘটবে।

এই ধরনের একটি প্রস্তাব পাস করানো ছিল বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অভিপ্রায়। পাকিস্তানের কূটনীতিবিদদের প্রতি ভুট্টোর আদেশ ছিল যে বাংলাদেশের এই উদ্যোগ বানচালের যেন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হয়। সেই উদ্দেশ্যে কিংস্টনে এসেছিল কানাডায় পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইফতেখার আলী। বাংলাদেশে ভুট্টোর সফর সম্বন্ধে তিনি অন্য সরকারপ্রধানদের জ্ঞাত করা এবং বাংলাদেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া। বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই জ্যামাইকার প্রধানমন্ত্রী মাইকেল ম্যানলি বললেন যে তাঁর মতে, যুগ্ম ইশতেহারে বাংলাদেশের বক্তব্যটি ব্যক্ত হওয়া উচিত এবং কী ব্যক্ত হবে তার একটি খসড়া যেন বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল প্রণয়ন করে। স্বাগতিক দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মাইকেল ম্যানলি ছিলেন সেই সম্মেলনের সভাপতি। তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব তাই ছিল অনেক। সেই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই বক্তব্য প্রদান করলেন হ্যারল্ড উইলসন। তিনি বললেন যে বাংলাদেশের দাবি ব্রিটেন সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে। তাঁর ভাষায়, ইতিহাসের এমন কোনো নজির নেই যে দুই জাতিতে পরিণত রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পত্তির যথাযথ বাটোয়ারা

হয়নি। ("No precedence in history when a country separated into two nations and the assets were not equitably shared.")

শুধু বাদ সাধলেন তানজানিয়ার জুলিয়াস নায়েরেরে। তাঁর বক্তব্য, তিনি বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল। তবে কমনওয়েলথ একটি ক্লাব। পাকিস্তান তার সদস্য নয়। অতএব এই ক্লাবটির কি উচিত হবে সেই দেশকে জড়িয়ে কোনো প্রস্তাব পাস করা? বোঝা গিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য আর মাইকেল ম্যানলি ও হ্যারল্ড উইলসনের সমর্থন বঙ্গবন্ধুর সপ্তাহ শেষের পরিকল্পনা উদ্ভূত। উপস্থিত সবাই উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন এই ভেবে সেই প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু কী বলবেন জুলিয়াস নায়েরেরের কথার জবাবে। বঙ্গবন্ধু চোখ থেকে তাঁর কালো ফ্রেমের চশমাটি অপসারণ করে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন জুলিয়াস নায়েরেরের দিকে।

তারপর বললেন, 'তুমি ঠিকই বলছ, জুলিয়াস। কমনওয়েলথ একটি ক্লাব। কিন্তু আমি সেই ক্লাবেরই একজন সদস্য। অন্য সদস্যরা যদি সামান্য একটি প্রস্তাব পাস করে আমাকে সাহায্য না করেন, তাহলে এই ক্লাবের সদস্য হওয়ার আমার কীই-বা প্রয়োজন ছিল? একটি দরিদ্র দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আমি। কেন তবে আমি অর্ধেক পৃথিবী পেরিয়ে এসেছি এই সম্মেলনে?' অখণ্ডনীয় যুক্তি। হতবাক জুলিয়াস নায়েরেরে। হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, মুজিব। তুমি যা চাও, তা-ই হবে।' বঙ্গবন্ধু আজ উপস্থিত না থাকলেও তাঁর মহান আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ আছে। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন, চিরকাল বেঁচে থাকবেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তির বার্তা নিয়ে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে চলছে।

২০১৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'প্রজেক্ট সিন্ডিকেট'-এ প্রকাশিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে ছাপা হয়েছিল। প্রজেক্ট সিন্ডিকেটের এই লেখাটি ১৫৫টি দেশে ১৩টি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানটির সারা পৃথিবীতে ৪৫৯টি মিডিয়া আউটলেট রয়েছে এবং বাংলাদেশের শুধু উল্লিখিত দুটি পত্রিকার সাথে চুক্তি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখার শিরোনাম ছিল 'অভিবাসন ব্যবস্থাপনা সঠিক হতে হবে'। লেখার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লাইন এ পরিসরে উপস্থাপন করছি। "গন্তব্যে পৌঁছাতে গিয়ে ৪ হাজার ৩০০ জনেরও বেশি অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে। কেবল ভূমধ্যসাগরেই

প্রাণহানি হয়েছে ৩ হাজার ২০০ মানুষের। আর বঙ্গোপসাগরের ঠিক পূর্বে আন্দামান সাগরে হাজারো অভিবাসী কোথাও ভিড়তে না পেরে নৌকায় আটকে থেকেছে অথবা পাচারকারীদের হাতে জিম্মিদশায় পতিত হয়েছে।... এই প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের সদস্য-সরকারগুলোর উচিত গত বছর যেসব উচ্চাশার প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছিল, তার সঙ্গে বাস্তবতার ব্যবধান এবং বহু অভিবাসী যে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এ মাসের অধিবেশনে, বিশেষত অভিবাসন ও শরণার্থী বিষয়ে এই অভূতপূর্ব সম্মেলন বিশ্বনেতারা এই দায় মেটাতে পারেন।....

....নীতিনির্ধারকদের উচিত, অভিবাসনের অর্থনৈতিক সুফল সর্বোচ্চকরণে কাজ করা; অভিবাসীরা যাতে বেআইনি বিকল্পের দিকে পা না বাড়ায়, তার জন্য আইনি পথ প্রশস্ত করা। উচিত কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রার বাধা কমিয়ে আনা; অনিয়মিত অভিবাসন প্রবাহকে সামলানো এবং এ বছর যেমনটা হয়েছে; বিশেষত যুদ্ধাঞ্চলে অথবা যখন অভিবাসন সংকটজনক পর্যায়ে চলে আসে, তখন অভিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি।"

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন।

লেখক : রাজনৈতিক বিশ্লেষক

'শান্তির পায়রা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

নাসরীন জাহান লিপি

'শান্তি, মুক্তি ও মানবতার অগ্রদূত' শিরোনামে গত ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে উদযাপিত হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে 'মুজিব চিরন্তন' শীর্ষক মূল প্রতিপাদ্যের দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা'র অষ্টম দিন। 'শান্তি, মুক্তি ও মানবতার অগ্রদূত' হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তুলে ধরার এই আয়োজনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডা. লোটে শেরিং। জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং তাঁর বক্তব্যে বললেন, 'বিশ্ববাসীকে বলার মতো একটি সুন্দর গল্প বাংলাদেশকে দিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।'

তিনি আরও বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি, অন্যকে বলার মতো একটি গল্প প্রত্যেক মানুষ ও জাতির থাকা উচিত।'

কী সৌভাগ্য আমার এবং আমার মতো বাংলাদেশের সব মানুষের! অন্যকে বলার মতো একটি অসাধারণ গল্প আছে আমার, আছে বাংলাদেশের সব মানুষের, বাঙালি জাতির। বিশ্ববাসীকে বলার মতো এই অসাধারণ গল্পটি আমাকে এবং আমাদের সবাইকে উপহার দিয়ে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য কী?
শান্তি, মুক্তি ও মানবতা।

পাকিস্তানের দখলদারি মনোভাবের ফলে অশান্তির আগুনে জ্বলতে থাকা এই ভূখণ্ডের স্বাধীনতা এনে দিয়ে কেবলমাত্র বাংলাদেশেই শান্তি আনেননি

তিনি, দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তির বীজ বপন করে গেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন আয়োজনে অংশ নিতে বাংলাদেশে এসেছিলেন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষে। ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে রক্ষিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে পরিদর্শন বইয়ে তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশ ও সারা বিশ্বের সব শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে শ্রদ্ধার এই পবিত্র স্থানটি আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ ও আলোড়িত করেছে।'

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিধন্য ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর তাঁর কাছে বাংলাদেশ ও সারা বিশ্বের সব শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে শ্রদ্ধার পবিত্র স্থান। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিধন্য প্রতিটি স্থান আসলে তা-ই। সেই অর্থে বিশ্বের কাছে গোটা বাংলাদেশই আজ পরিণত হয়েছে শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য শ্রদ্ধার পবিত্র স্থান। বাংলাদেশ কেবলমাত্র বঙ্গবন্ধুর জন্যই শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে আলোচিত হয়েছে, স্বীকৃত হয়েছে এবং বাংলাদেশ সবসময় শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করবে বলে বিশ্ববাসীর চাওয়া হিসেবে পরিণত হয়েছে।

১৯৭১ সালে লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জন করা বাংলাদেশের স্বাধীনতা। স্বাধীন বাংলাদেশে শান্তির পায়রা উড়িয়ে এই বারতা প্রথম দিয়েছেন তো শান্তিপ্রিয় সেই মহান নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এর স্বীকৃতি হিসেবে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রায় এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ পেয়েছিল আন্তর্জাতিক সম্মান। সে-ই প্রথম। বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বাধীনতার স্থপতি, গণতন্ত্র ও শান্তি আন্দোলনের পুরোধা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভূষিত হলেন 'জুলিও কুরি' শান্তি পদকে। এই পুরস্কারপ্রাপ্তি ছিল বঙ্গবন্ধুর কর্ম ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, যা তিনি এসে দিতে পেরেছিলেন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের মানুষকে, যাদের তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

১৯৭৩ সালের ২৩ মে। বিশ্ব শান্তি পরিষদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদকে ভূষিত করে। বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্তির ৪৮তম বার্ষিকী উদযাপনের এই দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যথাযোগ্য মর্যাদায় এই দিনটিকে আনন্দের সাথে উদযাপনে জাতির

আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে করোনা মহামারি। রোগ-শোকে ক্লান্ত পৃথিবীতে এখনও চলছে যুদ্ধের হানাহানি। মিয়ানমারে প্রতিদিন রক্ত ঝরছে নিরীহ জনগণের। দখলদার ইসরায়েল প্রতি মিনিটে শত বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কেড়ে নিচ্ছে শিশু-নারীসহ সাধারণ মানুষের প্রাণ। 'শান্তি, মুক্তি ও মানবতার অগ্রদূত' বঙ্গবন্ধু তাই এখনও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ এখনও পৃথিবীতে শান্তি অধরা। এই প্রাসঙ্গিকতায় এ বছরের ২৩ মে অনেক বেশি আলোচনার দাবি রাখে।

'জুলিও কুরি' শান্তি পদকের সাথে জড়িয়ে আছে বিশ্ববিখ্যাত দুই পদার্থবিজ্ঞানী মেরি কুরি ও পিয়েরে কুরি'র নাম। বিশ্ব শান্তির সংগ্রামে এই বিজ্ঞানী দম্পতির অবাদন অনস্বীকার্য। তাঁদের অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে বিশ্ব শান্তি পরিষদ ১৯৫০ সাল থেকে তাঁদের নামে এই শান্তি পদক প্রবর্তন করে। ফ্যাসিবাদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে ও মানবতার কল্যাণে শান্তির সপক্ষে বিশেষ অবদানের জন্য ব্যক্তি ও সংগঠনকে 'জুলিও কুরি' পদক প্রদান করা হয়। কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো, ভিয়েতনামের হো চি মিন, প্যালেস্টাইনের ইয়াসির আরাফাত, চিলির সালভেদর আলেন্দে, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, ভারতের ইন্দিরা গান্ধী, মাদার তেরেসা, চিলির কবি ও রাজনীতিবিদ পাবলো নেরুদা, ভারতের জওহরলাল নেহেরু, আমেরিকার মার্টিন লুথার কিং, রাশিয়ার (সোভিয়েত ইউনিয়ন) লিওনিদ ব্রেজনেভ প্রমুখ বিশ্বনেতাদের এই পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির সভায় বিশ্বের ১৪০টি দেশের শান্তি পরিষদের ২০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বাঙালি জাতির মুক্তির আন্দোলন ও বিশ্ব শান্তির সপক্ষে বঙ্গবন্ধুর জোরালো ভূমিকা ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রদানের জন্য বিশ্ব শান্তি পরিষদের তৎকালীন মহাসচিব রমেশ চন্দ্র বঙ্গবন্ধুর নাম প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বিশ্ব শান্তি পরিষদের বাংলাদেশ প্রতিনিধি ছিলেন বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব আলী আকসাদ। বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক ভূষিত করার পেছনে তাঁর আন্তরিক ভূমিকার কথা স্বীকার করতেই হবে।

পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল আগ্রাসী নীতির বিপরীতে বঙ্গবন্ধু সরকার ঘোষণা করেছিল জোটনিরপেক্ষ নীতি। 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারোর সাথে বৈরিতা নয়'–এই নীতির মাধ্যমে শান্তি ও ন্যায়ের পক্ষে বঙ্গবন্ধু সরকারের অবস্থান স্পষ্ট হয়েছিল। বিশ্বশান্তির জন্য এই নীতির গ্রহণযোগ্যতা কতখানি, এর প্রমাণ মিলল 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক অর্জনের মধ্য দিয়ে। সবার প্রতি বন্ধুত্বের ভিত্তিতে বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করে জাতির পিতা বলেছিলেন, 'পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি যে অর্থ ব্যয় করে মানুষ মারার অস্ত্র তৈরি করছে, সেই অর্থ গরিব দেশগুলোকে সাহায্য দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে।' বঙ্গবন্ধুর এই উক্তি এখনও কী ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক! কোভিড-১৯ সৃষ্ট মহামারি ঠেকাতে টিকা পেতে হবে পৃথিবীর মানুষকে। সব দেশ এখনও সেই টিকা পায়নি। টিকা-বাণিজ্য, টিকা-রাজনীতির শিকার হচ্ছে ক্ষমতাহীন রাষ্ট্রের জনগণ। পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি সবার জন্য টিকা সুলভ করতে অর্থ সহযোগিতা করতে পারত, যে আহ্বান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতাবান পক্ষকে বারবার করেছেন। অথচ বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা বাদ দিয়ে মানুষ মারার অস্ত্র তৈরিতে ব্যয় করা হচ্ছে অস্ত্র।

ফিরে যাই ১৯৭৩ সালের ২৩ মে তারিখে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের উত্তর প্লাজায় উন্মুক্ত চত্বরে সুসজ্জিত প্যান্ডেলে বিশ্ব শান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশ চন্দ্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রদান করেন। আন্তর্জাতিক কূটনীতিকদের বিশাল সমাবেশ ছিল সেদিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা জন রিড উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন ভারতের বিখ্যাত শান্তিবাদী নেতা কৃষ্ণ মেনেন। সেই সমাবেশে মহাসচিব ঘোষণা করলেন, 'শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন, আজ থেকে তিনি বিশ্ববন্ধুও বটে।'

কেবলমাত্র বাংলার বন্ধু তিনি নন, বিশ্বেরও বন্ধু বটে। বাংলার শান্তির পায়রা বিশ্বময় শান্তির প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত হলেন। রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। আর ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে জাতিসংঘের মাতৃভাষা বাংলায় প্রথমবার ভাষণ দিলেন বঙ্গবন্ধু। সেই ভাষণেও তিনি স্পষ্ট উচ্চারণে বলেছিলেন শান্তির অমোঘ বাণী। বলেছিলেন শান্তির পক্ষে তাঁর

বিশ্বাসের কথা– 'মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি অত্যন্ত জরুরি এবং তাহা সমগ্র বিশ্বের নর-নারীর গভীর আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটাইবে। এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তিই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'জুলিও কুরি' শান্তি পদকপ্রাপ্তির ৪৮তম বার্ষিকীতে শান্তির পক্ষে উচ্চারিত বঙ্গবন্ধুর এই বিশ্বাস অতি দ্রুত বাস্তবায়িত হোক, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হোক, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

লেখক : প্রধান মিডিয়া কর্মকর্তা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি

বঙ্গবন্ধু ও জুলিও কুরি শান্তি পদক

রিপন আহসান ঋতু

সময়টা মহামারির। মারণ ভাইরাস দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চারপাশ। এই অবস্থাতেও যুদ্ধ ও দখলের রক্তাক্ত ইতিহাস পৃথিবীকে ছেড়ে যায়নি। প্রতি পদে ঘুরে যাচ্ছে মৃত্যুর সার্চলাইট। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক উদ্বেগ এখন চরমে। পৃথিবীর মানুষ আজ একটি নতুন মানবিক বিশ্বব্যবস্থা প্রত্যাশা করছে, কিন্তু কোনোভাবে মানুষকে আর মানবিক করে তোলা যাচ্ছে না। একবিংশ শতকের এই চরম উৎকর্ষের সময়েও তাই জুলিও কুরি শান্তি পদকের প্রয়োজনীয়তা বিশ্বব্যাপী অনুভূত হচ্ছে। মানুষের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের জীবনকে খুব মায়া করেন, ভালোবেসে থাকেন। একমাত্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুই ছিলেন ব্যতিক্রম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু নিজের জীবনকে সারাটা জীবনই তুচ্ছ করে গেছেন বাঙালি জাতির কল্যাণে। জাতির প্রতি তাঁর এ টান, মমতা ও ভালোবাসা তাঁকে আন্তর্জাতিকতায় উত্তীর্ণ করে তুলেছিল।

গোটা বিশ্বে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তি বিঘ্ন করার যেকোনো কার্যক্রমের বিরোধী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। যেখানেই মানবতার অবক্ষয় দেখেছেন সেখানেই তিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন, বিশ্ব বিবেককে জাগানোর চেষ্টা করেছেন এবং বিশ্বসভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। শান্তির জন্য এই ব্যাকুলতা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের অপরিহার্য অংশ হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যও তিনি শান্তিপূর্ণ পথেই অগ্রসর হয়েছেন সবসময়। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে তিনি ছিলেন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। কিন্তু তাঁর হাতে ক্ষমতা না দিয়ে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল স্থগিত ঘোষণা করে কুখ্যাত অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনা করল। পাকিস্তানি বর্বর আর্মি বাঙালিদের হত্যা করতে থাকে নির্বিচারে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শুরু করেন শান্তিপূর্ণ অসহযোগ

আন্দোলন। ১ মার্চ থেকেই বাংলাদেশ ভূখণ্ডের প্রশাসন, অর্থনীতি, আইন-শৃঙ্খলা সবকিছু চলছে তাঁর নির্দেশে। অবশেষে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন বিশ্ব পরিস্থিতি, শান্তি, প্রগতি, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর এবং গণতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্রে মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন করেন। একই সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংঘাতময় পরিস্থিতি উত্তরণে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন জোরালোভাবে।

এ সময় উপমহাদেশে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের ভেতর সৎ প্রতিবেশীমূলক সম্পর্ক স্থাপন ও উপমহাদেশে শান্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। মুক্তিযুদ্ধের কালপর্বে ভারত-সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি ১৯৭১ এবং বাংলাদেশ-ভারত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি ১৯৭২, বাংলাদেশের মৈত্রী-সম্পর্কে এই উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তি স্থাপনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিপরীতে বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ এবং শান্তি ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান গ্রহণের নীতির ফলে বাংলাদেশ বিশ্বসভায় একটি ন্যায়ানুগ দেশের মর্যাদা লাভ করে।

সবার প্রতি বন্ধুত্বের ভিত্তিতে বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি যে অর্থ ব্যয় করে মানুষ মারার অস্ত্র তৈরি করছে, সেই অর্থ গরিব দেশগুলোকে সাহায্য দিলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে।' এমন মানবিক, উদারচিত্তের নেতাকে বিশ্ববাসী গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবে, এটাই স্বাভাবিক। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে যখন চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে বিশ্ব শান্তি পরিষদ বিশ্ব শান্তি ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অনন্য অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেটা আকস্মিক কোনো বিষয় ছিল না। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফরাসি বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক জুলিও কুরি ছিলেন বিশ্ব শান্তি পরিষদের পুরোধা ব্যক্তি। তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে প্রবর্তিত পুরস্কার বঙ্গবন্ধুকে প্রদানের জন্য ঢাকায় এসেছিলেন শান্তি পরিষদ মহাসচিব রমেশ চন্দ্র। অনুষ্ঠানে বিশ্বের নানা প্রান্তের শান্তি আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ২৩ মে

জাতীয় সংসদের উত্তর প্লাজায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকে পদক পরিয়ে দেওয়ার সময় রমেশ চন্দ্র বলেন, 'শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন, বিশ্ববন্ধুও'।

বঙ্গবন্ধুর জুলিও-কুরি শান্তি পদক অর্জন তাই আপামর বাঙালির এক বিরল সম্মান। এ মহান অর্জনের ফলে জাতির পিতা পরিণত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধুতে। কিন্তু এ প্রাপ্তি বা অর্জন দেশি-বিদেশি অনেকের কাছেই চোখের বালি বা ঈর্ষণীয় বিষয় ছিল। একটি ছোট্ট দেশ, তাও অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ, এ গরিব মানুষের এত শান্তির দরকার কী? ধনী বিশ্বের আশা-আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, গরিব মানুষদের শান্তি নিশ্চিত করা হলে তার নিজের সুখ-শান্তির ঘাটতি হয়ে থাকে। তাই ধনী বিশ্বের প্রচণ্ড ক্ষোভ আর ঈর্ষা ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতি। অথচ এ সম্মান পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছিলেন, "এ সম্মান কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়। এ সম্মান বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে আত্মদানকারী শহিদদের, স্বাধীনতাসংগ্রামের বীর সেনানীদের। 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক সমগ্র বাঙালি জাতির।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখনও প্রতিহিংসার রাজনীতি করেননি। ঘোরতর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের জন্যও ছিল তাঁর বুক উজাড় করা ভালোবাসা। বাঙালির প্রিয় নেতা ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশে ফিরেই পাকিস্তানি বর্বরদের উদ্দেশ করে বলেন, 'তোমরা আমার লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছ, মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছ, অসংখ্য ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছ এবং আমার এক কোটি মানুষকে তাড়িয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। এর পরও তোমাদের প্রতি আমি কোনোরূপ বিদ্বেষ পোষণ করি না।' গোটা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ সেদিন অবাক বিস্ময়ে শুনেছে জাতির পিতার সেই অমিয় বাণী। বঙ্গবন্ধু ছিলেন উদার, মানবিক এবং সংবেদনশীল একজন মানুষ।

১৬ বছর আগে বিবিসি বাংলার শ্রোতারা নির্বাচন করেছিলেন সর্বকালের সেরা ২০ জন বাঙালিকে। সেই জরিপে যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়, তখন কারো কারো মধ্যে যে বিস্ময় দেখা দেয়নি, তা নয়। রাজনীতি-সাহিত্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিজ্ঞান-সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা-সংস্কারের শত শত বছরের ইতিহাসে সব বাঙালিকে ছাড়িয়ে শেখ মুজিব কীভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হলেন তার উত্তর অত্যন্ত সহজ–তিনি বাঙালির ইতিহাসে প্রথম স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, জাতির পিতা। শেখ মুজিব একদিকে যেমন ইতিহাসের নায়ক,

বরপুত্র আবার অন্যদিকে তিনি ইতিহাসস্রষ্টা। পুঁথিগতবিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, সৃজনশীলতায় তার চেয়ে সেরা বাঙালি হয়তো আরও এক বা একাধিক পাওয়া যাবে, কিন্তু শেখ মুজিবের মতো অসম সাহসী, দূরদর্শী এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী এমন রাজনৈতিক নেতা বাঙালিদের মধ্যে আর একটাও নেই। তিনি জীবনের পাঠশালা থেকে শিক্ষা নিয়ে ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রম করেছেন, যা বিশ্বের সকল শান্তিকামী মানুষের কাছে অনুকরণীয়। বঙ্গবন্ধুর দর্শন আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই তিনি বিশ্ববন্ধু হিসেবে সবার কাছে স্মরণীয় হয়ে উঠেছেন।

বর্তমান বিশ্বে আজকের এই দুঃসময়ে যখন করোনাভাইরাস মানবজাতির হাজার হাজার অর্জনকেই শুধু নয়, মানব অস্তিত্বকেই চ্যালেঞ্জের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে, তখন আমরা বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হতে পারি। 'সবার জন্য স্বাস্থ্য'–এ স্লোগান ছিল বঙ্গবন্ধুর। আমরা দেখছি এই একই স্লোগানকে সামনে নিয়ে বিশ্বশান্তি স্থাপনে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বাবার দেখানো সেই পথেই হাঁটছেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনা দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। যদিও সেটি বিদ্যমান স্থূল সমাজ বাস্তবতায় একরকম দুঃসাধ্য চ্যালেঞ্জ। কিন্তু এরই মধ্যে বিশ্বশান্তি স্থাপনে তাঁর অনন্য ভূমিকার প্রশংসা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রশংসা করেছেন টনি ব্লেয়ার পর্যন্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবং খ্যাতনামা সব প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে দিয়েছেন শান্তি পদক। বিশ্বশান্তি পুরস্কার তিনি পেয়েছেন একাধিক। নিজ দেশে পার্বত্য শান্তি চুক্তি, রোহিঙ্গা সমস্যায় শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় দৃঢ় অবস্থান, ভারতের সঙ্গে বড় বড় বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান ও মৈত্রী সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার কথা উঠেছে বারবার। পাননি হয়তো ক্লিনটন পরিবারের জন্য। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হয়তো নোবেল পুরস্কার পাননি, কিন্তু বিশ্বের শান্তিকামী কোটি মানুষের হৃদয়কে জয় করে নিয়েছেন। সেটাও তো আমাদের জন্য অনেক বড় পুরস্কার।

লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক

শেখ মুজিব কেন স্বাধীনতার ঘোষক ও জাতির পিতা

মুহাম্মদ শামসুল হক

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে নানাজনের ভূমিকা বা অবদান স্বীকার করে নিয়েই ইতিহাসে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বস্তুত ১৯৪৮ ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত বাঙালিদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা আন্দোলন-সংগ্রামে সামনের কাতারে থেকে দুঃসাহসী ভূমিকা রাখার মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবের জাদুকরী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। ১৯৬৬ সালে বাংলার মানুষের মুক্তিসনদ হিসেবে তাঁর ঘোষিত ছয় দফা কর্মসূচি বাংলাদেশের মানুষের মনে যতই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধুও ততই মুক্তির দিশারি হিসেবে মানুষের হৃদয়ে ঠাঁই পেতে থাকেন। নানা বাধা-বিপত্তি, অপপ্রচার, বিশেষ করে কথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলায় তাঁকে জড়িয়ে স্বাধিকার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার সরকারি নীলনকশা উড়িয়ে দিয়ে ছাত্র-জনতা তাঁকে বঙ্গবন্ধু তথা বাংলার বন্ধু হিসেবে আলিঙ্গন করেন। ছয় দফার ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগের প্রতি নিরঙ্কুশ জনরায় তাঁকে বাংলার অবিসংবাদিত নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত করে। বঙ্গবন্ধুর হাতে পাকিস্তানিদের ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানার প্রেক্ষাপটে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের আহ্বানে ৩ মার্চ পল্টনে আয়োজিত বিশাল সমাবেশেই বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক ও জাতির পিতা ঘোষণা করা হয়। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে মওলানা ভাসানীর সমর্থন দানের ঘোষণা, '৭০-এর নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যদের সভায় যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ–এ সব কিছু মিলিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করার কিংবা দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার একমাত্র বৈধ অধিকারী ছিলেন।

কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর ক্ষমতাসীন সরকার সমকালীন প্রজন্মের সামনে স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস গোপন করে বিকৃত তথ্য তুলে ধরতে থাকে। বই-পত্রে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' অংশে বঙ্গবন্ধুর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাগুলোকে এমনভাবে আড়াল করা হয়, যাতে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামে জাতির একজন নেতা ছিলেন, তাও সমকালীন বা পরবর্তী প্রজন্ম বুঝতে না পারে। ওই সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী বিভিন্ন ব্যক্তি ও রাজনৈতিক শক্তি ধর্মীয় প্রচারণার আড়ালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং পর্যায়ক্রমে সরকারি-আধাসরকারি ও গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জায়গা করে নেয়। তারা কথায় কথায় আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে নানারকম কুৎসা রটাতে থাকে। এর ফলে পঁচাত্তর-পরবর্তী অন্তত দুই দশকের বেশি সময় ধরে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের উল্লেখযোগ্য অংশ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মনোভাবাপন্ন হয়ে বেড়ে উঠেছে মানসিকভাবে–তাঁদের অনেকে বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকে ইতিহাস তার নির্ধারিত পথে যাত্রা শুরু করে। স্বাধীনতাসংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্ব কতটুকু নিরঙ্কুশ এবং তিনি কেন জাতির পিতার মর্যাদার অধিকারী তা উপলব্ধি করতে হলে তাঁকে মূল্যায়ন করে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মন্তব্য জানা নতুন প্রজন্মের জন্য জরুরি। কয়েকজনের মন্তব্য তুলে ধরছি।

"ইন্দোনেশিয়ার জাতির পিতা ছিলেন সে দেশের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ সুকর্ণ। সেখানে সুকর্ণকে উৎখাত করে জেনারেল সুহার্তো ক্ষমতায় বসেন। সে সময়ে ইন্দোনেশিয়ায় কেউ সে দেশের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ সুকর্ণের নাম উল্লেখ করতে পারেনি। তবে সুকর্ণই যে ইন্দোনেশিয়ার জাতির পিতা সে কথা সুহার্তো সরকার কোনোদিন অস্বীকার করেনি। অথচ আমাদের দেশে যে জিয়াউর রহমান ১৯৭২ সালে তাঁর প্রবন্ধে প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেই জিয়ার শাসনামলে স্বাধীনতাসংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকাকে চাপা দিয়ে স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসকে বিভ্রান্তির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসের ক্রোড়পত্রসহ সরকারি বিভিন্ন প্রকাশনায় আমাদের শত্রুদের কথা উল্লেখ থাকলেও কখনোই জাতিকে জানানো হতো না যে সেই শত্রুবাহিনী কোন দেশ থেকে এসেছিল। বলা হতো হানাদার বাহিনীর কথা, কিন্তু 'পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহার করা হতো না।"

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসন থেকে আলাদা হয়ে এককভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয় ১৭৭৬ সালে ২ জুলাই। ৪ জুলাই টমাস জেফারসন প্রণীত স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি কংগ্রেসে অনুমোদিত হয় এবং ওই দিনই যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবস পালন করে যদিও ওয়াশিংটনের জাতীয় আর্কাইভে সংরক্ষিত স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি কংগ্রেসম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় ১৯ জুলাই এবং পরবর্তী কয়েক দিনে।

স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাব রীতি অনুসারে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই তোলেন। এই অধিকার অন্য কারো নেই। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়নি। টমাস জেফারসন ঘোষণাটির প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট জন হ্যানকক ঘোষণাটি স্বাক্ষর করেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাসংগ্রামে এই দুই নেতার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু টমাস জেফারসন কিংবা জন হ্যানককে যুক্তরাষ্ট্রে জর্জ ওয়াশিংটনের সঙ্গে তুলনা করা হয় না।

ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। তাই বলে তিনি পাক-ভারতে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে স্বীকৃত নন কিংবা তাঁকে কেউ মহাত্মা গান্ধী কিংবা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সমতুল্য বলে দাবি করেন না। একইভাবে রাশিয়ায় লেনিন, চীনে মাও সে তুং এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে অন্যদের তুলনা করা হয় না।

'কোনো দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এখানে অপরিহার্য। মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক ছিলেন, এই দাবি ঐতিহাসিক পটভূমিতে অবাস্তব এবং অগ্রহণযোগ্য। যাঁরা এই দাবি করেন তাঁরা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বিশ্বাস করেন না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নামে একটি বাণী পাঠককে বঙ্গবন্ধুর পাশে দাঁড় করাবার অপচেষ্টা বাণী পাঠককে মহিমান্বিত করবে না; বরং পাঠক হিসেবে প্রাপ্য সম্মান থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করবে।'

'বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে অস্বীকার করা সংবিধান লঙ্ঘন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র স্বাধীন বাংলাদেশের মূল ভিত্তি। একে শুধু সংবিধানের অংশ বললে খাটো করে দেখা হবে। মূলত ঘোষণাপত্রকে অস্বীকার করা স্বাধীন বাংলাদেশকে অস্বীকার করার শামিল। ঘোষণাপত্রে স্পষ্টভাবে লেখা আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষক। এই ঘোষণা অস্বীকার করা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে অবমাননার তুল্য। এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ।'

'কেউ বলেন, তিনি (বঙ্গবন্ধু) স্বাধীনতা চাননি; কেউ বলেন, তিনি বাংলাদেশ চাননি; কেউ বলেন, তিনি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। কেউ বলেন, তিনি পতাকা উড়ানানি; কেউ বলেন, তিনি পাকিস্তানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এর জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এর জবাব একটি। ২৬ মার্চ রাতে রেডিও মারফত ইয়াহিয়া সাহেব যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণে শুধু একটি নামই ছিল, সেই নাম শেখ মুজিব। কত লোক স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন, কত লোক পতাকা উড়িয়েছেন, কত লোক প্রাণ দিয়েছেন, কত লোক দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন, নাম কারো আসেনি ইতিহাসের পাতায়। নরাধম ইয়াহিয়ার খাতায় একটি নামই ছিল, 'মুজিব, ইজ এ ট্রেইটর টু দ্য নেশন, দিজ টাইম হি উইল নট গো আনপানিসড'। জিজ্ঞাসা করুন তাদেরকে, যে মানুষ কিছুই করল না, স্বাধীনতা ঘোষণা করল না, বাংলাদেশ চাইল না, পতাকা উড়াল না, তাঁর ওপর তোমাদের কেন এত রাগ? আমরা এত কিছুই করলাম, আমাদের নাম তো তোমাদের খাতায় উঠল না। ...বিন্দু থেকে বিন্দুর যে অস্তিত্বের মধ্যে মানুষের জীবন, এই অস্তিত্বের মধ্যে শেখ মুজিব একটি স্ফুলিঙ্গের মতো জন্মে ছিলেন।'

বিএনপির উপদেষ্টা পরিষদের প্রয়াত সদস্য এম এম রেজাউল করিমের মতে, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর নামে এবং তাঁর পক্ষ হয়েই স্বাধীনতার ঘোষণা দান করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'আমাকে কয়েকজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিএনপির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আমি কেমন করে বঙ্গবন্ধুকে প্রশংসা করে কাগজে লিখি। এতে সংশয়, অবিশ্বাস জন্মাতে পারে আমার প্রতি। আমার উত্তর ছিল সহজ। যা বর্ণনা করা হয়েছে এ সবগুলোই ছিল ঐতিহাসিক ঘটনা। সত্য আজ না হোক কাল উদ্ঘাটিত হবেই। এটা সময়সাপেক্ষ। এ ছাড়া, এমনকি রাজনীতির পক্ষেও সত্য সুন্দর হওয়ার কিছু প্রয়োজন আছে বৈকি! আর এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, যাঁরা মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাথায় রেখেই কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন এবং এসব বীর মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ছিলেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানও, যিনি বঙ্গবন্ধুর নামে এবং তাঁর পক্ষ হয়েই স্বাধীনতার ঘোষণা দান করেছিলেন।'

মূলত বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান রাষ্ট্রের যাত্রার শুরু থেকেই বাঙালিদের প্রতি শাসন-শোষণের ব্যাপারে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর দুরভিসন্ধি বুঝতে

পেরেছিলেন। পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমান, বিশেষ করে মুসলিম লীগের তৎকালীন নেতাদের বড় অংশের ক্ষমতালিপ্সা ও আপসকামী মনোভাবও জানা হয়ে গিয়েছিল তাঁর। তিনি বুঝেছিলেন পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অধীনে থেকে স্বাধীন, সমৃদ্ধশালী আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বাঙালিরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তাই তখন থেকেই বাংলার মানুষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের আন্দোলন, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে কারাগারে অনশন, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক সংগঠনে রূপান্তর, সাতান্নতে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দলের হাল ধরা, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের গণবিরোধী সকল কাজ ও নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম ও সাহসের সঙ্গে কথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মোকাবিলা এবং সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ী করার মধ্য দিয়ে বাংলার অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এরপর একাত্তরে অসহযোগ আন্দোলন, ৭ই মার্চে স্বাধীনতাসংগ্রামের আহ্বানসংবলিত ভাষণ দিয়ে জাতিকে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা এবং ২৫ মার্চ আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেন তিনি। যুদ্ধের ৯ মাস পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকলেও তাঁর আহ্বান ও নেতৃত্বকে মাথায় নিয়েই তাঁর সহকর্মীরা ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনাকে পরাজিত করে যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। তবে এই বিজয় অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল নেতা মুজিবের অনুপস্থিতিতে। অবশেষে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ জানুয়ারি স্বাধীন স্বদেশে ফিরে আসেন জনতার নেতা মুজিবর। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে একটি স্বাধীন দেশ 'বাংলাদেশ' ও বাঙালিদের জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব যাঁর, তিনিই তো জাতির পিতা। মানুষের মনের পাশাপাশি দেশের সংবিধানেও স্বীকৃত হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

লেখক : সাংবাদিক ও গবেষক

মুজিববর্ষে বিজয় দিবসের স্বপ্ন

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

১.

যারা ১৯৭১-কে নিজের চোখে দেখেছে তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাদের জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় মুহূর্ত কোনটি তাহলে নিশ্চিতভাবেই তারা বলবে সেটি হচ্ছে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। আমার মনে হয়, যারা ১৯৭১ সালকে নিজের চোখে দেখেছে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ। কারণ জীবনের সবচেয়ে দুঃসময়ে এই দেশের সাধারণ মানুষ যে নিজের জীবন বিপন্ন করে কত বড় আত্মত্যাগ করতে পারে, দেশকে কত তীব্রভাবে ভালোবেসে কত অবহেলায় নিজের প্রাণটি বিলিয়ে দিতে পারে এবং সবচেয়ে বড় কথা এই দেশের সবচেয়ে বড় অর্জনটি তারা কীভাবে ছিনিয়ে আনতে পারে, সেটি নিজের চোখে দেখেছে, তারা যদি সৌভাগ্যবান না হয়, তাহলে কারা সৌভাগ্যবান হবে? আবার অন্যভাবে দেখলে তারা এক ধরনের দুর্ভাগা মানুষ হতে পারত, কারণ তাদেরকে নিজের চোখে পৃথিবীর নৃশংসতম একটি গণহত্যা দেখতে হয়েছে, পাকিস্তানি মিলিটারি এবং তাদের পদলেহী অনুচররা যে কত নৃশংস হতে পারে, সেটি দেখে তারা যদি পুরো মানবজাতির ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলত তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না।

সৌভাগ্যক্রমে সেটি হয়নি, সময়ের কোমল পরশে, বিভীষিকার স্মৃতি আনন্দের স্মৃতি দিয়ে ঢাকা পড়েছে, দুঃখের তীব্রতা কমে সহনসীমায় এসেছে, মানুষ নূতন জীবনের স্বপ্ন দেখতে শিখেছে। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যারা ১৯৭১ দেখেছে তারা যে শুধু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থেকেছে তা নয়, তারা একই সাথে মানবতার এমন একটি রূপ দেখেছে, যেটি সারা জীবনে কখনোই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। এই দেশে যে মানুষগুলো সেই সময়টুকুর ভেতর দিয়ে এসেছে তাদের ভেতরে একটি মৌলিক পরিবর্তন হয়ে গেছে,

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুঃসময়টি নিজের চোখে দেখেছে বলে তারা এখন যেকোনো পরিস্থিতিতে অবিচল থাকতে পারে, ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারে, আশাবাদী হতে পারে। তাই আমি মনে করি, আমাদের প্রজন্ম হচ্ছে একটি অতি সৌভাগ্যবান প্রজন্ম।

২.

প্রায় অর্ধশতাব্দী বছর পরেও আমার ১৯৭১-এর বিজয় দিবসের কাছাকাছি দিনগুলোর কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ডিসেম্বরের শুরু থেকে অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে আমরা সবাই বুঝতে শুরু করেছি যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি পাল্টে গেছে, এটি শেষ হতে যাচ্ছে, তবে কত রক্তপাত হয়ে এটি শেষ হবে, সেটি কেউ তখনো জানে না। বাসার ছাদে দাঁড়িয়ে যুদ্ধবিমানের ডগ ফাইট দেখা যায়। অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গানের গুলির সুবিন্যস্ত আলোতে রাতের আকাশ আলোকিত, কর্কশ শব্দে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত। মিলিটারি কনভয় যাচ্ছে, সেখানে নিষ্ঠুর চেহারার পাকিস্তানি মিলিটারি পাথরের মতো মুখ করে বসে আছে। যারা ঢাকা শহরের প্রান্তসীমানায় আছে তারা দেখছে পিচ করা রাস্তায় দাগ কেটে কেটে ঘড়ঘড় শব্দ করতে করতে ট্যাংক যাচ্ছে। কামানের গর্জন, নিরবচ্ছিন্নভাবে শেলিং হচ্ছে। বিবিসিতে বলছে, আমেরিকার সপ্তম নৌবহর শত শত যুদ্ধবিমান নিয়ে বঙ্গোপসাগর দিয়ে বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে আসছে। স্থানীয় রেডিও খুললেই শোনা যাচ্ছে পাকিস্তানি মিলিটারিকে আত্মসমর্পণ করার জন্য ক্রমাগত বলা হচ্ছে 'হাতিয়ার ঢাল দো' অস্ত্র সমর্পণ করো! আকাশ থেকে লিফলেট ফেলা হচ্ছে সেখানে আত্মসমর্পণের অবিরাম আহ্বান। আমরা টের পাচ্ছি যুদ্ধ মানে শুধু গোলাগুলি নয়, যুদ্ধ হচ্ছে একই সাথে প্রচণ্ড মানসিক চাপ! তখনো আমরা জানি না জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন আলবদর বাহিনীরা নিশ্চিত পরাজয়ের আভাস পেয়ে এই দেশের সোনার সন্তানদের একজন একজন করে ধরে নিয়ে হত্যা করতে শুরু করেছে।

ডিসেম্বর মাস, প্রচণ্ড শীত, যেখানে আশ্রয় নিয়েছি সেখানে বেশ কিছু অবোধ শিশু, তাদের নিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে একটা বাংকারে নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছি। প্রচণ্ড অনিশ্চয়তা, কী হবে কেমন করে হবে আমরা কিছু জানি না। তখন হঠাৎ শুনতে পেলাম তীক্ষ্ণ গলায় একজন গলা ফাটিয়ে কোথা থেকে জানি চিৎকার করে উঠল, জয় বাংলা!

একমুহূর্তে সকল অনিশ্চয়তা কোথায় উড়ে গেল, সকল দুর্ভাবনা মুছে গেল কেউ বলে দেয়নি, কিন্তু বুঝে গেলাম যে দিনটির জন্য এতদিন অপেক্ষা

করে আছি, বনের পশুর মতো দেশের আনাচ-কানাচে ছুটে বেড়িয়েছি সেই দিনের অবসান হয়েছে। যে দেশটির জন্য আমার কত আপনজন বুকের রক্ত দিয়েছে, সেই দেশটি আমাদের হাতে ধরা দিয়েছে। এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে, কিন্তু কী আশ্চর্য, প্রথম সেই খবরটি পাওয়ার পর আমাদের সবার চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু।

আমার এখনও বিশ্বাস হয় না, এই দেশে সেই জয় বাংলা স্লোগানটি কত দীর্ঘকাল নির্বাসিত ছিল।

৩.

অনেক স্বপ্ন নিয়ে দেশটি স্বাধীন হয়েছিল। সেই বিজয় দিবসটিতে আমরা সবাই নূতন জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলাম। দেশটি শত্রুমুক্ত হলেও বঙ্গবন্ধু তখনো পাকিস্তানের কারাগারে, জানুয়ারির ১০ তারিখ তিনি ফিরে এলেন, আমাদের কী আনন্দ! তিনি আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার কাজে হাত দিলেন। দেশে তখন লক্ষ লক্ষ ঘর-বাড়িহীন মানুষ, বাবা হারানো পরিবার, ছেলে হারানো মা, নির্যাতিতা মেয়ে, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা, হতদরিদ্র দেশের মানুষ। তাদের অনেকের ঘর নেই, বাড়ি নেই, মাথা গোঁজার জায়গা নেই, মুখে দেওয়ার খাবার নেই। দেশে রাস্তা-ঘাট নেই, যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছে বলে সেতু নেই। মিলিটারি ক্যাম্প করে ছিল বলে স্কুল নেই, কলেজ নেই, বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে বলে বই নেই, খাতা নেই, অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, তবু এই দেশের মানুষের বুকে বিশাল প্রত্যাশা। নিশ্চয়ই এই দেশ মাথা তুলে দাঁড়াবে, যত শোষণ ছিল, বঞ্চনা ছিল সেগুলো দূর হবে। এই দেশে অন্যায় থাকবে না, অধর্ম থাকবে না; শুধু থাকবে সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল মানুষের জন্য বুক ভরা ভালোবাসা।

কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে সেই দেশ গড়ে তোলার সময় দেওয়া হলো না। সাড়ে তিন বছরের ভেতর আগস্ট মাসের ১৪ তারিখ ভোরবেলায় পৃথিবীর সবচেয়ে নির্মম একটি হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলো। বঙ্গবন্ধুর রক্তে রঞ্জিত হলো এই অভাগা দেশের মাটি, সেই মুহূর্তে আধুনিক বাংলাদেশটি পথ হারিয়ে আশাহীন-স্বপ্নহীন ধর্মান্ধতার অন্ধকার কানাগলিতে হারিয়ে গেল। যে যুদ্ধাপরাধীদের তাদের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য জেলখানায় রাখা হয়েছিল তারা ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখ পিলপিল করে সেখান থেকে বের হয়ে এলো। এই দেশটি হয়ে গেল যুদ্ধাপরাধীদের অভয়ারণ্যে।

৪.

তারপর অনেক কিছু হয়েছে, সেই ইতিহাস কালিমাময়। একসময় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্যা কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আবার তার সেই হারানো পথ খুঁজে পেয়েছে। এই দেশে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার করে দেশকে গ্লানিমুক্ত করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে দেশটিকে তার হারিয়ে যাওয়া আত্মসম্মান ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিশু-কিশোরেরা আবার বঙ্গবন্ধুর কথা জানতে পারছে, তারা আবার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অহংকার করতে শিখেছে। দেশটির অর্থনৈতিক সক্ষমতা লাফিয়ে লাফিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, কার দুঃসাহস আছে এখন এই দেশটিকে তলাহীন বাস্কেট বলবে?

কিন্তু আমাদের ১৯৭১-এর স্বপ্ন কি পূরণ হয়েছে? আমরা সবাই জানি, সত্যিকারের স্বপ্ন হয় আকাশছোঁয়া; তাই সেই স্বপ্ন কখনোই পূরণ হওয়ার নয়, আমরা সারা জীবন শুধু সেই স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে কাজ করে যাই। কিন্তু যদি কখনও দেখি আমরা চোখে সেই স্বপ্ন নেই, তখন দুর্ভাবনা হয়।

আমাদের সামনে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ–প্রকৃতি নিয়ে চ্যালেঞ্জ, পরিবেশ নিয়ে চ্যালেঞ্জ, অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে চ্যালেঞ্জ, শিক্ষা নিয়ে চ্যালেঞ্জ, স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে চ্যালেঞ্জ, কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক দেশ তৈরির চ্যালেঞ্জ। বঙ্গবন্ধুর আজীবন স্বপ্ন ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। আমরা সেই বাংলাদেশ এখনও পাইনি। বাংলাদেশে এখনও আমাদের ধর্মান্ধ-মৌলবাদী গোষ্ঠীর আস্ফালন শুনতে হয়।

মুজিববর্ষের এই বিজয় দিবসে আমাদের স্বপ্ন হোক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের একটি সত্যিকারের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ।

লেখক : সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ

মহামানবের জন্মশতবার্ষিকী

গৌরাঙ্গ নন্দী

সবাই সবকিছু পারে না। একেকজন মানুষের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা বা গুণ থাকে, যা তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করে। যে মানুষটির মধ্যে বিশেষ গুণাবলি অনেক, তিনি অনন্য। মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করা, আকৃষ্ট করা, বুঝতে এবং বোঝাতে পারা মানুষের অনন্য গুণগুলোর মধ্যে পড়ে। সব মানুষ পারে না অন্যদের বুঝতে এবং পরিস্থিতি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে বা কোনো একটি বিষয়ে সকলকে এক কাতারে দাঁড় করাতেও পারে না। এই গুণ বা বৈশিষ্ট্য যেসব মানুষের থাকে, তিনি বা তাঁদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি রয়েছে আর সেই কারণেই তাঁদের নেতা বলা হয়ে থাকে।

যিনি অবস্থিত সমাজের অগ্রসরমান ব্যক্তি তিনি হলেন নেতা। নেতা নিজেকে ছাড়িয়ে অন্যের সমস্যা নিয়ে ভাবেন, সমস্যা সমাধানে আগুয়ান হন, সমাধান করে মানুষের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেন। মানুষও নেতাকে আস্থায় নেয়, তাদের সুখ-দুঃখের সাথি বলে মনে করে, তাঁকে পথপ্রদর্শক মনে করে। এ কারণে সাধারণ মানুষ নেতার কথা শোনে ও মান্য করে। তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও পারে। আর নেতাও মানুষকে উদাত্ত আহ্বান জানাতে পারেন। এমনি একটি অবস্থা, আমরা এই বাঙালি জাতির জীবনে দেখেছি। নেতা এলেন এবং তর্জনী উঁচিয়ে বললেন, 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা প্রস্তুত থাকবা; ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।'

একজন নেতা কতটা আত্মবিশ্বাসী, জনগণের প্রতি আস্থাশীল হলে বলতে পারেন, 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি'। তিনি যদি হুকুম দিতে না পারেন, যদি দিকনির্দেশনা দিতে না পারেন; অর্থাৎ সংশয় ছিল, যদি শত্রুপক্ষ তাঁকে তাঁর প্রিয় মানুষদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়; এ

কারণেই তিনি বলেছেন, তখন নির্দেশনার জন্য আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। যার কাছে যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে যেন জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হ্যাঁ, নেতার কথা জনগণ অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছে, পালন করেছে। সত্যিই নেতাকে শত্রুরা ধরে নিয়ে আটকে রেখেছে; আর জনতা নেতার আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে মাঠে নেমেছে। মার খেয়েছে, মরেছে; মেরেছেও। যেহেতু শত্রুরা ছিল সংঘবদ্ধ, পরিকল্পিত আক্রমণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, আর তাই তারা বাঙালিদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল বলে সাধারণের ওপর বর্বর নির্যাতন করেছে। বাড়ি-ঘরে আগুন দিয়েছে। মা-বোনদের ওপর পাশবিক নির্যাতন করেছে। সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। সর্বোপরি হত্যা করেছে বেশুমার।

বলা হয়, ত্রিশ লক্ষ শহিদের কথা, দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম হারানোর কথা; প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে আরও বেশি মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে; লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ফলে সম্পদহানিও হয়েছে বিপুল পরিমাণে। মানুষ অকাতরে ওই নেতার আহ্বানেই জীবন দিল, সম্ভ্রম বিলিয়ে দিল, সম্পদ হারাল। সেই নেতা কে? কে সেই মহান মানুষ, মহামানব? তিনি আর কেউ নন; তিনি বাঙালির নয়নমণি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ছাত্ররা ভালোবেসে তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু উপাধি পাওয়ার দুই বছর পর তিনি জনতাকে তর্জনী উঁচিয়ে আহ্বান জানালেন, আর মানুষ ওই নেতার ডাকে সাড়া দিয়ে আত্মোৎসর্গ করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো। দীর্ঘ ৯ মাসের লড়াই-সংগ্রাম, নিপীড়ন-হত্যাকাণ্ড শেষে দেশ দখলদার বাহিনীর মুক্ত হলো।

নেতা জনতার মাঝে আবারও এলেন, প্রকৃতপক্ষে নেতাকে হাজির করতে প্রতিপক্ষরা বাধ্য হলো। নেতা মানুষের মাঝে এলেন। আবারও সেই উদাত্ত আহ্বান। এবারে দেশ গড়ার সংগ্রাম। যুদ্ধবিধ্বস্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশটিকে আবারও সাজানো-গোছানোর পালা। জনতাও নেতাকে অনুসরণ করল। তবে পরাজিত হায়েনারা থেমে ছিল না। তারা সুযোগ বুঝে নেতাকে, নেতার পরিবারের সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করল। হত্যা করল তাঁর প্রধান চার সহযোগীকে, যারা নেতার অনুপস্থিতিতে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। অবশ্য,

আগেই তাদের জেলখানায় পোরা হয়েছিল, সেই জেলখানায় তাদের হত্যা করা হলো। কী নির্মম! নিষ্ঠুরতা!! জাতি তার পিতাকে হারিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। দিশাহীন হয়ে পড়ে। দেশটি ছেয়ে যায় কালো অন্ধকারের দৈত্য-দানোরা এসে মানুষের ওপর খবরদারি করতে থাকে। মানুষদের পিষে মারতে থাকে। সকল ধরনের বর্বরতা নেমে আসে সবখানে। নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে না বলে আইন করা হয়। ভাবা যায়, খুনিদের বিচার করা যাবে না, খুনিদের নিরাপদে দেশের বাইরে পাঠানো হয়। নিকষ কালো আঁধারে সময় শুষে নিতে থাকে। কতদিন আর অন্ধকার যাত্রা চলতে পারে। মানুষ শিকলভাঙ্গার গান গেয়ে ওঠে, আবারও মানুষ ঘুরে দাঁড়ায়। ওই মহামানবের কন্যা শেখ হাসিনা। এবার নতুন নেতা। ইস্পাত দৃঢ়কণ্ঠে, দৃপ্ত পদভারে ওই মানুষের ওপর ভর করেই এগিয়ে যাওয়া।

জনতার রায়ে ক্ষমতাসীন হয়ে ওই সেই কালো বাধা, পিতা হত্যার খুনিদের বিচার করা যাবে না, এ কলঙ্কতিলক মুছে ফেলা। খুনিদের বিচার করা এবং মুক্তিযুদ্ধকালের বিরোধিতাকারীদের মানবতাবিরোধী অপরাধীদের সাজা দেওয়া। প্রচলিত আইনে সেসব যুদ্ধাপরাধী, মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো; আইনে অপরাধী সাব্যস্ত করে দণ্ড দেওয়া এবং তা বাস্তবায়ন করা। পাশাপাশি দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য একের পর এক দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া। এবং সবচেয়ে আশাপ্রদ, সুখকর হচ্ছে, যুদ্ধাপরাধীদের সাজা কার্যকর করে, পিতা হত্যার বিচার করে সেই পিতা, মহামানবের সাড়ম্বরে জন্মশতবর্ষ উদযাপন করা।

হ্যাঁ, জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ। এক শ বছর আগে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ ফরিদপুর অধুনা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেওয়া খোকা, শেখ মুজিবুর রহমান। যে ছাত্রাবস্থায়ই নেতৃত্বগুণে অনেকের আস্থাভাজন হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ উত্তরকালে পূর্ব পাকিস্তান পর্বে পাকিস্তানি প্রায় ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁর ধারাবাহিক লড়াই, মানুষকে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে একজোট করে পথে নামানো, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে দেশ স্বাধীন করা, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা–এ এক অনন্য কীর্তি। যা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব হয়েছিল এ কারণেই যে, মানব থেকে তিনি

নিজেকে মহামানবে উন্নীত করেতে পেরেছিলেন। যা সকলে পারে না। কালে-ভদ্রে দু-একজন পারে। সেই মানুষ বাঙালির আপনজন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের দিন থেকেই শুরু হচ্ছে জন্মদিনের ক্ষণগণনা। আসুন, তাঁর জন্মশত বছরে নানা আয়োজনের মধ্যে তাঁকে স্মরণ করি।

লেখক : সাংবাদিক ও গবেষক। খুলনা অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা এবং পরিবেশবিষয়ক একাধিক গ্রন্থপ্রণেতা

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও তাঁর জন্মশতবর্ষের ক্ষণগণনা

মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। পাকিস্তানি বাহিনী বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আত্মসর্মপণ করলেও সেদিন বাঙালিরা তৃপ্ত ছিল না। চারদিকে যেন একটা শূন্যতা বিরাজমান ছিল। সেই শূন্যতা হলো বিজয় এসেছে, কিন্তু বিজয়ের নায়ক নেই। যিনি ১৯৪৮-এর পর থেকে একটু একটু করে বাঙালিকে একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখান এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে 'যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকবিলা' করার ডাক দেন তিনি। বিজয়ের মাহেন্দ্রক্ষণে জনতার মাঝে তিনি নেই। যাঁর নামে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়, পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থেকেও যিনি মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে অনুপ্রেরণা ও শক্তির উৎস তিনিই বিজয়ের দিনে অনুপস্থিত। তাই বিজয়োৎসব খুব বেশি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ইয়াহিয়া খান যখন বঙ্গবন্ধুকে তথাকথিত দেশদ্রোহিতার জন্য বিচার শুরু করেন, তখন বিশ্ববিবেক সোচ্চার হয়ে ওঠে। তাঁর মুক্তির জন্য সারা পৃথিবী থেকেই দাবি ওঠে। ইতোমধ্যে পাকিস্তানে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো ইয়াহিয়া খানের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি বিশ্বনেতৃবৃন্দের চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি পাওয়ার পূর্বমুহূর্ত থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়কাল বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘটনাবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ।

মুক্তি দেওয়ার অব্যবহিত পূর্বে জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে কিছু অঙ্গীকার আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এ ক্ষেত্রেও তীক্ষ্ণ

কূটনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। ভুট্টো এ ধরনের একটি প্রস্তাব দেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একসাথে থাকতে পারে কি না। তখন বঙ্গবন্ধু উত্তর দেন যে, আমি আগে আমার মানুষের কাছে ফিরে যাই, তারপরে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেব (সূত্র : Stanley Wolpert, Zulfi Bhutto of Pakistan, His Life and Times, Oxford University Press, 1993, P. 173-174)।

তিনি লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ঢাকায় তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। লন্ডনে কয়েক ঘণ্টার যাত্রাবিরতিকালে তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং হিথ তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আসেন। অতঃপর রয়াল এয়ারফোর্সের বিমানে করে দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে আসেন এবং ভারত রাষ্ট্র ও জনগণের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়। তাঁর এই যাত্রাবিরতিকালে এক ফাঁকে তিনি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাকে জিজ্ঞেস করেন যে, বাংলাদেশে অবস্থানরত মিত্রবাহিনী কখন ভারতে ফিরে আসবে। ইন্দিরা গান্ধী তখন উত্তর দেন যে, আপনি (বঙ্গবন্ধু) যেদিন চাইবেন, সেদিনই। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি তাঁর উড়োজাহাজ রাজহংসে চড়ে বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশে আসার জন্য অনুরোধ করেন। বঙ্গবন্ধু বিনয়ের সাথে এ বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

তিনি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপতি তা প্রতিমুহূর্তে তাঁর আচরণে প্রকাশ পায়। তিনি রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় দাঁড়িয়ে ভুট্টোর উদ্দেশে বলেন যে 'তুমি ভালো থাকো। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে'। পাকিস্তান থেকে লন্ডন, লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে ঢাকা। পথের দূরত্বও যতখানি, ঠিক ঘটনাগুলোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রকৃত বিজয় দিবস। কারণ বঙ্গবন্ধু এই সময়ে বা দ্রুত ফিরে না এলে অনেক বিষয় অমীমাংসিত থেকে যেত। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ধৈর্যের কারণে বাংলাদেশের অনুকূলে বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি ঘটেছে। অন্য কারও পক্ষে ওই বিষয়গুলোর দ্রুত সমাধান সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। এজন্য ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যথার্থভাবে ১০ জানুয়ারিকে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনার দিন ধার্য করা হয়েছে। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে তাঁর জন্ম যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ১০ জানুয়ারিও তেমনি তাৎপর্যময়। জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা শুরু হওয়ায় ১০ জানুয়ারি ইতিহাসে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা অনেকাংশে প্রতিভাত হবে।

মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এখনও বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁর উন্নয়ন-ভাবনা বিষয়ে আলোচিত হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ও বিষয়ে এই উদ্যোগগুলো গ্রহণ করবে এবং অসংখ্য বইপত্র প্রকাশিত হবে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হলে পরবর্তী ১৫-২০ বছরে বাংলাদেশ উন্নয়নের কোন স্তরে অবস্থান করত, তার একটি সমীকরণও হবে এসব আলোচনা ও লেখালেখিতে।

লেখক : উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

শতবর্ষে আরও উজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু

ড. হারুন রশীদ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী বাঙালির জন্য অনন্য এক প্রাপ্তি। তিনি এমন এক নেতা, যিনি বাঙালিকে দিয়েছেন একটি দেশ, পতাকা ও মানচিত্র। একটি সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। তাই তো তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। কবির ভাষায় 'পুরুষোত্তম তুমি, জাতির পিতা'। যতই দিন যাচ্ছে বাঙালির কাছে বঙ্গবন্ধুর অপরিহার্যতা আরো বাড়ছে। শতবর্ষে আরও উজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন স্বাধীনতার স্থপতি। তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বের গুণে তিনি কেবল বাংলার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবেই পরিগণিত হননি, নিজেকে তিনি নেতৃত্বের এমন এক সুমহান স্তরে সমাসীন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে একাত্তরে অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর নাম বলতে বলতেই দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন।

একাত্তরের ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে পাকবাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে কারাবন্দি করে। কিন্তু কী আশ্চর্য! বন্দি মুজিব আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। রণাঙ্গনে প্রতিজন যোদ্ধাই হয়ে উঠলেন এক একজন মুজিব। তাঁর নামেই পরিচালিত হলো মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অবশেষে বাঙালি পেল দীর্ঘপ্রতীক্ষিত স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতার জন্য বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, '৬৬-এর ছয় দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে ধীরে ধীরে তৈরি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কারান্তরীণ রাখা হয় বঙ্গবন্ধুকে। কিন্তু তাঁর নামেই পরিচালিত হয় মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালি পায় তার বহুদিনের লালিত স্বপ্নের লাল-সবুজ পতাকা আর স্বাধীন দেশের মানচিত্র। অবশেষে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা স্বাধীন দেশের নেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য

হয়। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (যার নামে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে) স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পাকিস্তানের অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির অবিসংবাদিত নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধু সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে তাঁকে গ্রেফতার করে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে আটক রাখা হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে ৯ মাস যুদ্ধের পর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে জাতি বিজয়ের পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর আগমন বাঙালি জাতির জন্য একটি বড় প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা, আন্দোলন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার প্রশ্নে বাঙালি যখন কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি, তখন পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। ২৯০ দিন পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুযন্ত্রণা শেষে লন্ডন-দিল্লি হয়ে মুক্ত স্বাধীন স্বদেশের মাটিতে ফেরেন বঙ্গবন্ধু।

তেজগাঁও বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমানটি অবতরণ করার পর খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে জনসমুদ্রের ভেতর দিয়ে রেসকোর্স ময়দানে এসে পৌঁছাতে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। সেদিনকার রেসকোর্স ময়দান ছিল লোকে লোকারণ্য। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১৭ মিনিট জাতির উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন, যা ছিল জাতির জন্য দিকনির্দেশনা। বাংলাদেশের আদর্শগত ভিত্তি কী হবে, রাষ্ট্রকাঠামো কী ধরনের হবে, পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যারা দালালি ও সহযোগিতা করেছে তাদের কী হবে, বাংলাদেশকে বহির্বিশ্ব কর্তৃক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ, মুক্তিবাহিনী, ছাত্রসমাজ, কৃষক, শ্রমিকদের কাজ কী হবে–এসব বিষয়সহ বিভিন্ন দিক নিয়ে নির্দেশনা ছিল ভাষণে। তিনি ডাক দিলেন দেশ

গড়ার সংগ্রামে। রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত মন্ত্রমুগ্ধ জনতা দু'হাত তুলে সেই সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সেদিন তিনি বলেন, 'আজ থেকে আমার অনুরোধ, আজ থেকে আমার আদেশ, আজ থেকে আমার হুকুম ভাই হিসেবে, নেতা হিসেবে নয়, প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, আমি তোমাদের ভাই, তোমরা আমার ভাই, এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না পায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি আমার বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়, এই স্বাধীনতা পূর্ণ হবে না। যদি এ দেশের মা-বোনেরা ইজ্জত ও কাপড় না পায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণতা হবে না যদি এ দেশের মানুষ, যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।'

১৯৬৭ সালের ১৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান 'কারাগারের রোজনামচায়' লিখেছিলেন, 'আজ আমার ৪৭তম জন্মবার্ষিকী। এই দিনে ১৯২০ সালে পূর্ব বাংলার এক ছোট্ট পল্লীতে জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মবার্ষিকী আমি কোনোদিন নিজে পালন করি নাই, বেশি হলে আমার স্ত্রী এই দিনটাতে আমাকে ছোট্ট একটা উপহার দিয়ে থাকত। এই দিনটিতে আমি চেষ্টা করতাম বাড়িতে থাকতে। খবরের কাগজে দেখলাম ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ আমার জন্মবার্ষিকী পালন করছে। বোধ হয়, আমি জেলে বন্দি আছি বলেই। আমি একজন মানুষ, আর আমার আবার জন্মদিবস! দেখে হাসলাম।' এই হলেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতার অকৃত্রিমতা।

শোষক ও স্বেচ্ছাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধু পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির শৃঙ্খল থেকে তিনি বাঙালি জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করার ও স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্বপ্ন তিনি বাস্তবায়ন করেছেন। এ মুক্তির সংগ্রামে তিনি নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই প্রতিবাদী ছিলেন। তিনি সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের কথা বলেছেন। সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে তিনি কখনও দূরে সরে যাননি। ভীতি ও অত্যাচারের মুখেও সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পথে থেকে শোষিত মানুষের অধিকারের কথা বলেছেন। শোষিত মানুষের পক্ষে নির্ভীক অবস্থানের কারণে তিনি কেবল বাংলাদেশ নয়, সারাবিশ্বে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পান।

২০২০ সালের ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মগ্রহণের শততম বছর পূর্ণ হবে। বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকী উদযাপনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শেখ রেহানাসহ ১০২ সদস্যের জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এটি অনন্য গৌরবের বিষয় যে জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে উদযাপন করার ঘোষণা দিয়েছে জাতিসংঘের বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক সংস্থা–ইউনেস্কো। গত ২৫ নভেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কো সদর দফতরে সংস্থার চল্লিশতম সাধারণ পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে মুজিববর্ষ উদযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মহান এই নেতার জন্মশতবার্ষিকী বাঙালি জাতিকে দেবে নতুন এক দিশা। দেশাত্মবোধে নতুন করে উদ্বুদ্ধ হবে জাতি। বর্তমানে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনটি জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ১৯৯৭ সালের ১৭ মার্চ প্রথমবারের মতো এই দিনটি শিশু দিবস হিসেবে সরকারিভাবে পালন করা হয়।

জাতির পিতা জন্মদিনটিকে শিশু দিবস হিসেবে পালন করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, আজকের শিশুই আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। আগামীতে দেশ গড়ার নেতৃত্ব তাদের হাতেই। শিশুরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, মর্যাদা ও মহিমায় সমৃদ্ধ হোক–এটাই ছিল তাঁর একান্ত চাওয়া।

বর্তমানে দেশের প্রায় ১৭ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৬ কোটিই শিশু। শিশুরা যাতে একটি সুষ্ঠু স্বাভাবিক উপায়ে বেড়ে উঠতে পারে সেটি নিশ্চিত করাটা অত্যন্ত জরুরি। শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদের আগামীর সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দিতে হবে। তবেই বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন শিশু দিবস হিসেবে পালন করা সার্থক হবে।

বঙ্গবন্ধুর জীবনী শিশুদের জন্য তো বটেই, সবার জন্যই এক শিক্ষণীয় বিষয়। তাঁর অপরিসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষার জন্য আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি। স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছি। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি যেমন আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, তেমনি দেশের জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাই বাঙালি জাতি চিরকাল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করবে। কবির ভাষায়, 'যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান'।

লেখক : সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন যদি না হতো

সুভাষ সিংহ রায়

এটা একটা বড় প্রশ্ন, ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যদি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন না করতেন কী অবস্থা দাঁড়াত। কৃষি ধ্বংস হওয়ায় ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ৪০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি হয়। এমনই সংকটময় পরিস্থিতিতে আমাদের ৯০ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি, আটক ৩৭ হাজার রাজাকার ও সোয়া লাখ ভারতীয় সৈন্যের খাদ্য সরবরাহের এক কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়। বঙ্গবন্ধু মাত্র ১ হাজার ৩১৪ দিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে গেছেন। ফলে ১ লাখ ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি সরকারি হয়। আর্থিক সংকট থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু সরকার পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু শিক্ষকদের ৯ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ ও ৯০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাইস্কুল ভবন পুনর্নির্মাণ করেন। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বছরে ৭ শতাংশেরও বেশি অর্জিত হয়েছিল। তিনি ১১ হাজার কোটি টাকার ধ্বংসস্তূপের ওপর আরও ১৩ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন স্তম্ভ দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১২ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে নির্ধারিত হয় জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, রণসংগীত, শরণার্থী পুনর্বাসন ও দেশের অভ্যন্তরে ৪৩ লাখ বাসগৃহ পুনর্নির্মাণে ত্রাণ কমিটির রূপরেখা প্রণয়ন, ভারতীয় সৈন্যদের দেশে ফেরত, মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন, শহিদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন, মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের বিচারের জন্য 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ' প্রণয়ন, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, ধ্বংসপ্রাপ্ত যোগাযোগব্যবস্থা পুনর্গঠন বা পুনর্নির্মাণ, টেলিযোগাযোগব্যবস্থা চালু করা, কৃষি পুনর্বাসন, ১৩৯টি দেশের স্বীকৃতি অর্জন, সংবিধান প্রণয়ন,

প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ, আন্তর্জাতিক অনুদানপ্রাপ্তির কূটনীতি, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ, ব্যাংক-বীমা সংস্কার, পাট ও বস্ত্রকল জাতীয়করণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু, ১৯৭১ সালের মার্চ-ডিসেম্বরকালীন ছাত্র বেতন মওকুফ, প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ, ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ঘোষণা, বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ, ধ্বংস হওয়া স্কুল-কলেজে নির্মাণসামগ্রী সরবরাহ, শিক্ষকদের ৯ মাসের বন্ধ বেতন দেওয়া, জরুরিভাবে ১৫০টি আইন প্রণয়ন, কৃষকদের (২৫ বিঘা পর্যন্ত) খাজনা মওকুফ, পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন, রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ঘোষণা।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন প্রণয়ন করেছিলেন, যা ছিল অনন্য সাধারণ উদাহরণ। কেননা জাতিসংঘ এই আইন করেছিল ১৯৮২ সালে। উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের আইনজ্ঞরা যখন মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, তখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রসিয়াসের এই গ্রন্থটি জেনেভা থেকে এনে তাঁদের দিয়েছিলেন। অপরাধীদের যাতে সুষ্ঠু বিচার হয় সে জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও নামকরা তরুণ ও প্রবীণ আইনজীবীদের বিচারের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তিনি সবিতা রঞ্জন পাল (এসআর পাল নামে খ্যাত) ও সিরাজুল হককে চিফ প্রসিকিউটর নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁদের সহায়তা করার জন্য ছিলেন আমিনুল হক, মাহমুদুল ইসলাম, ইসমাইল উদ্দিন সরকার ও আবদুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া। তাঁদের অনেকে পরবর্তীকালে অ্যাটর্নি জেনারেল ও বিচারক হয়েছিলেন। পুলিশের ডিআইজি নুরুল ইসলাম ছিলেন প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা।

১৯৭২ সালের দালাল আদেশ ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকেই কার্যকর হওয়ার আইনি নির্দেশনা থাকায় দেশব্যাপী দালাল আটক অভিযান শুরু হয় এবং ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও শান্তি কমিটির ৩৭ হাজার ৪৭১ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ২৬ হাজার ৮৩৫ জনকে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে আটক করা হয়। এতসব আইনগত বিধান, ছাড় ও ক্ষমতা দেওয়া সত্ত্বেও গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মাত্র ২ হাজার ৮৪৮টি মামলার নিষ্পত্তি হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল ৭৫২ জন। এর মধ্যে ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ

অভিযোগকৃত ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের তিন-চতুর্থাংশই অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। যদিও সরকার আইনগত ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিল। তার পরও ২২ মাসে ২ হাজার ৮৪৮টি মামলার বিচারকাজ সম্পন্ন হলে মাসে ১৩০টি এবং দিনে ৩-৪টি মামলার বেশি বিচার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

আশ্চর্য সাবলীলতায় সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি শেষ হতে না হতেই প্রায় ৫০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের স্বীকৃতির পথ সুগম করে দিল। ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে, ততদিনে বাংলাদেশ ১২০টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ সবই সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন বলেই। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় আমরা চীন ও সৌদি আরব ছাড়া বিশ্বের সব দেশেরই স্বীকৃতি লাভ করেছিলাম। ১৯৭১ সালে ৯ মাস কারাবাসকালে বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন তাঁর বিচারের প্রহসন-মৃত্যুদণ্ড। পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি জেলে অবস্থানকালে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেখানে তাঁর কবর খোঁড়ার আয়োজন। বহু বছর কারাবাসের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শেখ মুজিব জেলে বসেই স্থাপন করেছিলেন জেলের ডিআইজি শেখ আবদুর রশিদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক।

এলো ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। আমাদের বিজয় দিবস। বাংলাদেশে পরাজিত জেনারেল নিয়াজির বাড়িও মিয়ানওয়ালিতে। সেখানেই কারাগারে রয়েছেন বঙ্গবন্ধু। পাকিস্তানের পরাজয়ের কোনো হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া যদি মিয়ানওয়ালি জেলে ঘটে, সেই ভয়ে শেখ রশিদ বঙ্গবন্ধুকে স্থানান্তরিত করলেন তাঁর বাসস্থানে। অন্তরীণ অবস্থাতেই। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের মুহূর্ত থেকেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের গৌরবজনক আসন প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন সচেষ্ট। ৮ জানুয়ারি ১৯৭২, রাওয়ালপিন্ডি থেকে লন্ডনে পদার্পণের পর থেকে ১০ জানুয়ারি ঢাকায় তাঁর জনসভায় ভাষণদান পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ছিল মাত্র ৫০ ঘণ্টার কিছু বেশি। কিন্তু সে সময়টুকুর মধ্যে বন্দিত্ব থেকে মুক্তির আস্বাদ লাভের সেই প্রথম প্রহরগুলোতে আন্তর্জাতিক সমাজে বাংলাদেশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ডের বিবরণ আগ্রহ-উদ্দীপক। কারণ, সেই আবেগপূর্ণ সময়টির

মধ্যেও এক আশ্চর্য সাবলীলতায় তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির কাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২, বঙ্গবন্ধুর দিল্লি পৌঁছানোর সেই স্মরণীয় প্রভাতে মুজিব আর ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে হয়েছিল পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। তিনি ঢাকার রেসকোর্সের সেই সভায় ঘোষণা করেছিলেন, 'তাঁর (ইন্দিরা গান্ধী) সঙ্গে আমি দিল্লিতে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেছি। আমি যখনই চাইব ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে নেবে।' তার দুই মাসের মধ্যেই ১২ মার্চ ১৯৭২, ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ থেকে শেষ ভারতীয় সৈন্যদের বিদায় ছিল সমতার ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

৮ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে লন্ডনে পৌঁছেই সংবাদ সম্মেলনে দেওয়া বিবৃতিতে বিশ্ববাসীর কাছে বঙ্গবন্ধু জানান দুটি আবেদন–'বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করুন' আর 'আমার ক্ষুধার্ত কোটি প্রাণের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসুন'। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে তাঁর সেদিন হয়েছিল ঘণ্টাব্যাপী সাক্ষাৎ। তিনি সেই সাক্ষাতে বাংলাদেশকে যথাসম্ভব শিগগির স্বীকৃতি ও সাহায্য প্রদানের জন্য ইংল্যান্ডের প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন। এপ্রিল ১৯৭২, বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করেছিল।

বঙ্গবন্ধু স্বীকৃতি-ভিক্ষায় কোনো দেশে যাননি কখনও। ১৯৭২ সালে তিনি লন্ডনে তাঁর অস্ত্রোপচারের পর জেনেভায় ছিলেন দ্রুত আরোগ্যের পথে। মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত তাঁকে সেখানে বাংলাদেশে ফেরার পথে কায়রো সফরের জন্য জানালেন আমন্ত্রণ। কিন্তু মিসর তখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবু সাদাত জানালেন যে কায়রোতে তিনি বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্বাগত জানাবেন আর বাংলাদেশকে তখনই প্রদান করবেন স্বীকৃতি। মনে পড়ে, স্বীকৃতি কামনায় কারও কাছে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যাওয়াকে বঙ্গবন্ধু অশোভন বিবেচনা করেছিলেন। তাঁর শরীরের অবস্থা উল্লেখ করে মিসর সফরের অপারগতা তিনি কূটনৈতিক ভাষায় প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে জানিয়েছিলেন। তার দুই বছর পর ১৯৭৪ সালে প্রেসিডেন্ট সাদাতই প্রথম বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তার পরই গিয়েছিলেন ফিরতি রাষ্ট্রীয় সফরে মিসর। দেশের সম্মান রক্ষায় আপসহীন ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিব।

অটোয়াতে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু গিয়েছিলেন কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে। তখনও নাইজেরিয়া আমাদের স্বীকৃতি দেয়নি। সাংবাদিকদের একটি অনুষ্ঠানে নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়াকুবু গাওয়ানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দেখা। সাদা পায়জামা, পাঞ্জাবি, কালো মুজিবকোট আর চাদর পরিহিত বঙ্গবন্ধু ছিলেন সেই অভ্যর্থনাসভার সবচেয়ে দৃষ্টিকাড়া রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর চারপাশে অনেক বিদেশি সাংবাদিক। হঠাৎ দেখলাম তিন পিস ধোপদুরন্ত স্যুট পরিহিত জেনারেল ইয়াকুবু গাওয়ান এগিয়ে আসছেন বঙ্গবন্ধুর দিকে। তিনি সম্ভাষণ জানালেন বঙ্গবন্ধুকে। তারপরে করলেন অপ্রত্যাশিত একটি প্রশ্ন।

বললেন, 'আচ্ছা প্রধানমন্ত্রী, বলুন তো, অবিভক্ত পাকিস্তান ছিল একটি শক্তিশালী দেশ। সেই দেশটিকে কেন আপনি ভেঙে দিতে গেলেন?' আমরা জানতাম যে নাইজেরিয়ার সে সময়কার বিচ্ছিন্নতাবাদী বিয়াফ্রা আন্দোলন ছিল গাওয়ানের দুশ্চিন্তার কারণ। বাংলাদেশের সফল সংগ্রাম থেকে বিয়াফ্রাবাসী অনুপ্রেরণা পেতে পারে সেই ভয় তাঁর ছিল। তবু একজন রাষ্ট্রনায়কের কাছ থেকে অন্য একজন রাষ্ট্রনায়কের প্রতি এ ধরনের প্রশ্ন প্রত্যাশিত নয় মোটেও। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্চহাসিতে চারপাশের অবাক নীরবতা ভাঙালেন বঙ্গবন্ধু। তারপর গম্ভীর তর্জনী-সংকেতে বললেন, 'শুনুন মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আপনার কথাই হয়তো ঠিক। অবিভক্ত পাকিস্তান তো শক্তিশালী ছিল, তার চেয়েও শক্তিশালী হয়তো হতো অবিভক্ত ভারত। তার চেয়েও শক্তিশালী হতো সংঘবদ্ধ এশিয়া, আর মহাশক্তিশালী হতো একজোট এই বিশ্বটি। কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সবকিছু চাইলেই কি পাওয়া যায়?' কথাটি বলেই তাঁর গলার সাদা চাদরটি হাতে নিলেন বঙ্গবন্ধু। তুলে দিলেন হতবাক নিশ্চুপ প্রেসিডেন্ট গাওয়ানের হাতে। বললেন, 'এই নিন বাংলাদেশের জনগণের তরফ থেকে আমার ক্ষুদ্র উপহার।' কুশলী কূটনীতিবিদ শেখ মুজিব। ১৩৬তম দেশ হিসেবে জাতিসংঘের সদস্যপদ পায় বাংলাদেশ। যদিও এই প্রাপ্তির পথটা ছিল ভীষণ জটিলতায় পরিপূর্ণ। মূলত সেটিই ছিল বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে প্রধান চ্যালেঞ্জ। জুলফিকার আলী ভুট্টোর সময়ে পাকিস্তানের প্ররোচনায় নিরাপত্তা পরিষদে চীনের ভেটো প্রয়োগের কারণে পর পর দুবার জাতিসংঘের সদস্য হতে ব্যর্থ হয় বাংলাদেশ। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য চীন বাংলাদেশকে প্রথমত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও অনানুষ্ঠানিকভাবে সে দেশের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সরকার সম্প্রীতিমূলক সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিলেন, যার জন্য চীনের 'ভেটো' প্রত্যাহার করিয়ে বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সদস্যপদ লাভ করে। সেটিই মূলত

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদার বিজয়ের স্বীকৃতি। যেহেতু সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি, তাই বাংলাদেশের নাগরিকদের হজব্রত পালন করতেও বাধা এসেছিল।

আলজেরীয় মুক্তিসংগ্রামের নেতা কর্নেল হোয়ারি বুমেদিয়ান ছিলেন বঙ্গবন্ধুর বিশেষ ভক্ত; তাঁর মধ্যস্থতায় বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনায় হজের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে বন্যায় সৌদি আরব আমাদের দিয়েছিল ১০ মিলিয়ন ডলারের অনুদান। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন তৎপর ও দূরদর্শী। ১৯৭৪ সালের শেষার্ধে বঙ্গবন্ধুর কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর এই অঞ্চলে বাংলাদেশিদের কর্মলাভের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। ১৯৭৪ সালের প্রথমার্ধে বঙ্গবন্ধুর দিল্লি সফরকালে ভারতের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৭৫ সালের প্রারম্ভেই শুরু হয়েছিল দুই দেশের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের প্রক্রিয়া। ফারাক্কার পানি বণ্টনে বঙ্গবন্ধুর সরকার শুষ্ক মৌসুমে পেয়েছিল ৪৪ হাজার কিউসেক পানির নিশ্চয়তা। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর তা গিয়ে ঠেকেছিল ১৩ হাজার কিউসেক পানিতে।

আজ ২০২০ সালের ১০ জানুয়ারির সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ৩২-৩৩ বিলিয়ন ডলার মজুদ আছে। হয়তো এই খবর অনেকের কাছে নেই–কীভাবে শুরু হয়েছিল আমাদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার। কানাডা সরকার তখন বঙ্গবন্ধুকে আড়াই মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের উপহার স্বর্ণে প্রদান করেন। সেটাই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে শুরু করা হয় বাংলাদেশ ব্যাংক। যে রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধু সমগ্র বাঙালি জাতিকে সর্বাত্মক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছিলেন, সেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি খুব স্পষ্ট করে বলেছিলেন, 'গত ৯ মাসে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বাংলাকে বিরান করেছে। বাংলার লাখো মানুষের আজ খাবার নাই, অসংখ্য লোক গৃহহারা। এদের জন্য মানবতার খাতিরে আমরা সাহায্য চাই। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আমি সাহায্যের আবেদন জানাই। বিশ্বের সকল মুক্ত রাষ্ট্রকে অনুরোধ করছি, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন।'

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে এ দেশের মানুষ শুধু ইতিহাস দখলের ইতিহাস দেখেছে। দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে যে বাংলাদেশের জন্ম হয়, তার হত্যাকাণ্ডে জাতিগত সব অর্জন ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেল। তিনি বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ অনেক আগেই মালয়েশিয়া কিংবা সিঙ্গাপুরের মতো অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জায়গায় দাঁড়িয়ে যেত। বঙ্গবন্ধু অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে

একটি মর্যাদাবান জাতিতে পরিণত করতে পেরেছিলেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারির পর অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বে তিনি ছিলেন এক ও অদ্বিতীয়। তিনি দেশে ফিরে না এলে অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার কেউ ছিলেন না। বঙ্গবন্ধু স্বদেশে এসেছিলেন বলেই ভারতীয় সৈন্য দ্রুততম সময়ে প্রত্যাবর্তন করেছিল। পৃথিবীর কোনো দেশের স্বাধীনতার পর এত কম সময়ে মিত্রশক্তি দেশ ছাড়ে না।

এই মহামানুষটা দেশে প্রত্যাবর্তন না করলে গোটা পৃথিবী বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াত না। কেননা বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ছিল খুবই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। যুদ্ধশেষের দিনগুলোতে পাকিস্তানি ব্যবসায়ীরা সর্বশেষ কড়িটিও পশ্চিমে নিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কাছে পাওনা আদায়ের ব্যাপারে ভীষণ রকমের তৎপর ছিলেন। ১৯৭৫ সালে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রের প্রধানদের সম্মেলনেও তিনি এই ইস্যু উত্থাপন করেন। এমনকি ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনেও প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন হলো আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। কিন্তু জাতিসংঘের সদস্য হতে চার বছর তার লেগে গেল কেন? চীন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্যদের অস্ত্র, গুলি আর রাইফেল দিয়েছিল। চীনের বাধার কারণেই জাতিসংঘের যে সদস্যপদ আমরা ১৯৭২ সালেই পেতে পারতাম, তা পেতে ১৯৭৪ সাল লেগে গেল। বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের ঐতিহাসিক সেই বক্তৃতা মঞ্চটিতে আরোহণ করলেন ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪। বঙ্গবন্ধু ছিলেন এই অধিবেশনে প্রথম এশীয় নেতা, যিনি এই অধিবেশনের সবার আগে বক্তৃতা করেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আজকের দিনে জাতিসংঘ কোন পথ বেছে নেবে? ধ্বংসের পথ, নাকি ক্ষুধা দূর করার পথ!' তিনি বাংলাদেশের সেই সময়ের প্রবল বন্যার কথা বললেন। সবশেষে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'মানুষের অসম্ভবকে জয় করার ক্ষমতা ও অজেয়কে জয় করার শক্তির প্রতি বিশ্বাস রেখে বক্তৃতা শেষ করতে চাই। আমরা দুঃখ ভোগ করতে পারি, কিন্তু মরব না।' আমরা কি কখনও ভাবি বঙ্গবন্ধু যদি দেশে না ফিরতেন, তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতাম? বাঙালি জাতির সৌভাগ্য বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করছেন এবং এ জন্যই বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিচয়ে বাংলাদেশ সারাবিশ্বে পরিচিত হচ্ছে। তিনি এখন একজন বিশ্বনেতা। যুক্তরাষ্ট্রের টাইম করপোরেশনের বাণিজ্যবিষয়ক

ম্যাগাজিন 'ফরচুন'-এর জরিপে বিশ্বের শীর্ষ ১০ নেতার তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন বঙ্গবন্ধু-সুকন্যা শেখ হাসিনা। নিউ ইয়র্কভিত্তিক সাপ্তাহিক 'টাইম' ম্যাগাজিনে ২০১৮ সালে বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের সাথে অন্তর্ভুক্ত হন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সবকিছু সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারিতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন বলেই।

লেখক : রাজনৈতিক বিশ্লেষক

মুজিব জন্মশতবর্ষ : জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশন

মুহ. সাইফুল্লাহ

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদষ্টা ও স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দেশ-বিদেশে বছরব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারির করাল গ্রাসে মুজিববর্ষের এ কর্মসূচি অনেকটাই সীমিত করতে হয়। জাতির পিতাকে স্মরণ করে জাতীয় সংসদে একটি বিশেষ অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল মার্চেই। করোনাভাইরাসের কারণে সে অধিবেশন পিছিয়ে অনুষ্ঠিত হলো ৫ থেকে ১৫ নভেম্বর ২০২০। এতে জাতির পিতার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, কর্ম, আদর্শ ও দর্শনের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। ২০২০ সালের ৯ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের ভাষণের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ অধিবেশন শুরু হয়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের পর জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনার মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সংসদ কার্যবিধির ১৪৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সংসদে সকল দলের সংসদ সদস্যদের পাঁচ কর্মদিবসের আলোচনায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী উত্থাপিত প্রস্তাব ১৫ নভেম্বর কণ্ঠভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রপতি ৯ নভেম্বর জাতীয় সংসদ অধিবেশনে তাঁর ভাষণে বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। বাংলাদেশকে জানতে হলে বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হবে, বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। এই দুই সত্তাকে আলাদাভাবে দেখার চেষ্টা যাঁরা করেছেন, তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। আজকের বাস্তবতা এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নাম নয়,

বঙ্গবন্ধু একটি প্রতিষ্ঠান, একটি সত্তা, একটি ইতিহাস। জীবিত বঙ্গবন্ধুর মতোই অন্তরালের বঙ্গবন্ধু শক্তিশালী। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাঙালি থাকবে, এ দেশের জনগণ থাকবে, ততদিনই বঙ্গবন্ধু সবার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের মুক্তির আলোকবর্তিকা হয়ে তিনি বিশ্বকে করেছেন আলোকময়। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে বঙ্গবন্ধুর নীতি, আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বেড়ে উঠতে পারে, সে লক্ষ্যে সবাইকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান মোঃ আবদুল হামিদ।

যারা দেশের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ার আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বাধীনতার সুফল প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ঐক্য। জনগণের ঐক্য, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ঐক্য। যে ঐক্য একাত্তরে আমাদের এক করেছিল, সে ঐক্যই গড়ে তুলতে হবে সাম্প্রদায়িকতা, অগণতান্ত্রিকতা, অসহিষ্ণুতা ও হিংসার বিরুদ্ধে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে রাজনৈতিক দলগুলোকে পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। যারা বাস্তবকে অস্বীকার করে কল্পিত কাহিনি ও পরিস্থিতি বানিয়ে দেশের সরলপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে, দেশের শান্তি অগ্রগতির ধারাকে ব্যাহত করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে একাত্তরের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই প্রতিষ্ঠিত হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা, সার্থক হবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন।

জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তাব উত্থাপনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু একটি স্বাধীন দেশ, লাল-সবুজ পতাকা ও সংবিধান উপহার দিয়েছেন, বিশ্বসভায় বাঙালিকে আত্মপরিচয় দিয়ে গর্বিত জাতি রূপে মাথা উঁচু করে চলার ক্ষেত্র রচনা করেছেন। স্বাধীনতার পর একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তোলার জন্য মাত্র সাড়ে তিন বছর সময় পেয়েছিলেন তিনি। সেই সময়ের মধ্যেই দেশের উন্নয়নের সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেন।

সংসদ নেতা বলেন, '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা নির্মমভাবে নিহত না হলে বাংলাদেশ বহু আগেই উন্নত দেশে পরিণত হতো। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থেকে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করতে পারাকে সৌভাগ্য হিসেবে বর্ণনা করেন প্রধানমন্ত্রী। এজন্য তিনি জনগণের

প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। বঙ্গবন্ধুর হত্যা-পরবর্তী বাংলাদেশের চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একসময় বঙ্গবন্ধুর নাম এবং ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে তাঁর অবদান ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হয়। তিনি বলেন, এমনকি '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। সে ঐতিহাসিক ভাষণ এখন বিশ্বপ্রামাণ্য হেরিটেজ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইতিহাস মুছে ফেলা সহজ নয়, ইতিহাসও প্রতিশোধ নেয়। তিনি বলেন, এখন থেকে আর কেউ ইতিহাস থেকে সেই নাম (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান) মুছতে পারবে না, এটাই বাস্তবতা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা', 'আমার দেখা নয়া চীন' পড়ে জনগণ প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারবে। 'পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট অন ফাদার অভ্ দ্য ন্যাশন' থেকেও প্রকৃত ইতিহাস জানা যাবে। প্রধানমন্ত্রী জানান, 'স্মৃতিকথা' শিরোনামে জাতির পিতার লেখা আরেকটি বইয়ের প্রকাশের কাজ চলছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বিশ্বাস করতেন দেশের মানুষ তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসে এবং তারা তাঁকে মারতে পারবে না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে, বাঙালি জাতি জাতির পিতার সে বিশ্বাস রক্ষা করতে পারেনি।

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু (মৃত্যুর আগে) বিশ্বাসঘাতকদের দেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু পেছনের ষড়যন্ত্রকারীদের তিনি দেখে যেতে পারেননি। তিনি বলেন, বিরাটসংখ্যক নয়, গুটিকয়েক ব্যক্তি এ ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানি জেল থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন দেশে ফিরে প্রথম ভাষণে জাতির পিতা দেশবাসীকে বলেছিলেন, ষড়যন্ত্র চলছে, ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। কিন্তু তারা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকতে ব্যর্থ হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা আজ আমাদের মাঝে নেই। তাঁর আদর্শ, তাঁর প্রতিটি কথা, বাক্য আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এগুলো আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে জাতির পিতার আজন্ম স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সংসদে তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসে নবাব সিরাজউদ্দৌলা, ফকির মজনু শাহ, তিতুমীরসহ অনেকেই স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, কিন্তু সফল হননি। কেবল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই সফল হয়েছেন এবং আমাদের একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়ে গেছেন

সংসদে বঙ্গবন্ধুর ওপর আলোচনার দ্বিতীয় দিনে (১০ নভেম্বর) জ্যেষ্ঠ সংসদ সদস্য তোফায়েল আহমেদ বলেন, ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধু ৩৫ দিনে ৩২টি জনসভা করেছিলেন। এ সময় ৮ বার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তোফায়েল আহমেদ বলেন, এই পৃথিবীতে অনেক নেতা আসবেন, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো আর কোনো নেতা আসবেন না। তিনি ছিলেন বিশ্বের মর্যাদাপূর্ণ নেতা। তিনি মৃত্যুবরণ করেননি, তিনি আছেন, থাকবেন।

ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি বলেন, ছয় দফা বঙ্গবন্ধুকে একক নেতায় পরিণত করেছিল। তিনি কেবল একটি দলের নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন দেশের নেতা, মানুষের নেতা। তিনি শুধু আওয়ামী লীগের নেতা নন, তিনি জাতির পিতা।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, খুনিরা বুঝেছিল, বঙ্গবন্ধুর রক্তের ছিটেফোঁটাও যদি থাকে, তাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াবে। এ কারণে তারা শিশু রাসেলকে পর্যন্ত ক্ষমা করেনি, কাউকেই রেহাই দেয়নি। সৌভাগ্যক্রমে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বেঁচে যান। বঙ্গবন্ধুর অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তৃতীয় দিনের (১১ নভেম্বর) আলোচনায় অংশ নিয়ে ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান।

সংসদ সদস্য আবদুল মতিন খসরু কমিশন গঠনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের 'মাস্টারমাইন্ড'দের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের নামের সাথে ব্রিগেডিয়ার বা কর্নেলের মতো র‍্যাংক ব্যবহার না করার কথা বলেন।

মুজিববর্ষে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনের চতুর্থ দিনের (১২

নভেম্বর) আলোচনায় আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমু এমপি বলেন, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্রে নিহত বঙ্গবন্ধু তাঁর সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণ করতে পারেননি, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি হাসানুল হক ইনু এমপি বলেন, বঙ্গবন্ধু একটি পতাকা, একটি আন্দোলন, একটি বিপ্লব, একটি ইতিহাস। বঙ্গবন্ধু একজন রাজনীতির কবি এবং ইতিহাসের একজন মহানায়ক। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু বিশ্বের সবচেয়ে মেধাবী রাজনীতিবিদ এবং 'স্ট্যাটেজিস্ট'। তিনি সকল বাঙালিকে একেকজন মুজিবে পরিণত করেছিলেন।

সংসদে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ মসিউর রহমান রাঙ্গা বলেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড ইতিহাসের ভয়াবহ ঘটনা। এ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পুরো জাতি অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। যদিও খুনিদের বিচার হয়েছে, কিন্তু হত্যাকাণ্ডের পেছনের কুশীলবরা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসর রাজাকার-আলবদরদের স্থান এ সংসদে হবে না, এ দেশের কোথাও হবে না।

বিএনপিদলীয় সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদ মুজিববর্ষের বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতাকালে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছার একটি লেখা পাঠ করেন, যেখানে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে হারুনুর রশীদ বলেন, ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। তিনি যদি পালিয়ে যেতেন বা ভারতে আশ্রয় নিতেন, তাহলে তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা বলা হতো। বিএনপি নেতা বলেন, মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান যে দীর্ঘ সংগ্রাম করেছেন, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা বেগম রওশন এরশাদ আলোচনার শেষ দিনে (১৫ নভেম্বর) তাঁর বক্তৃতায় বলেন, যারা বঙ্গবন্ধুর নাম ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল, তারাই ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।'

জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী অধিবেশনে সভাপতিত্বকালে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ আর বঙ্গবন্ধুর দর্শন ধারণ করে তাঁর হাতে

রচিত ১৭২-এর সংবিধানের ভিত্তিতেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হবে।

সংসদে কণ্ঠভোটে জাতির পিতাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রস্তাব পাসের ঠিক আগে পঞ্চম দিনে (১৫ নভেম্বর) আলোচনায় অংশগ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ–বাকশাল গঠন করেন। কিন্তু পুরো ধারণাটা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। সংসদ নেতা বলেন, সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়নে জাতির পিতা দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি সংবিধান সংশোধন করেন এবং ৫ বছরের কর্মসূচি হাতে নেন। শেখ হাসিনা বলেন, 'আমার বিশ্বাস, তিনি যদি সে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারতেন, আজ বাংলাদেশ বিশ্বের একটি উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতো।' কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁকে তা করতে দেওয়া হয়নি।

যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন থাকবে বঙ্গবন্ধুর নাম। জাতি যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করবে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে জাতীয় সংসদের এ বিশেষ অধিবেশন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ইতিহাসে প্রথম বিশেষ অধিবেশন, যা একাদশ জাতীয় সংসদের দশম অধিবেশন। এর আগে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশন আর হয়নি। তবে দুটি বিশেষ বৈঠকের কথা জানা যায়। ১৯৭৪ সালের ৩১ জানুয়ারি ও ১৮ জুন অনুষ্ঠিত সংসদের বিশেষ বৈঠকে ভাষণ দেন যথাক্রমে তৎকালীন যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্ট মার্শাল যোসেফ ব্রোজ টিটো এবং ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি।

লেখক : সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় শিক্ষার গুরুত্ব

পাশা মোস্তফা কামাল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর এক জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ জাতিকে শৃঙ্খলমুক্ত করে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের স্বপ্নই ছিল একটি শিক্ষিত ও উন্নত জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। শিক্ষা ছাড়া কখনও কোনো জাতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করাতে পারে না, এটা তিনি জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ধাপের আন্দোলন-সংগ্রাম এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য তাঁর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ রকম একটি পরিষ্কার চিত্রই ফুটে উঠবে। শিক্ষা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনার ভিত্তিমূলে ছিল আধুনিক, গণমুখী, অসাম্প্রদায়িক ও সর্বজনীন শিক্ষা।

বাঙালির শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে দেওয়ার জন্য পাকিদের প্রথম পদক্ষেপ ছিল আমাদের মাতৃভাষার ওপর আঘাত। ১৯৪৮ সালে ভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানের সাথে আমাদের বিরোধের শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন ভাষাকে ধ্বংস করে দেওয়া মানে শিক্ষাকে ধ্বংস করে দেওয়া। বাঙালি জাতিকে অশিক্ষিত করে রাখার পাকিস্তানি ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিতে তিনি আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন। পাকিস্তানি শাসকদের দীর্ঘ অনিয়ম, শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করতে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন সবার আগে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ এবং গুরুত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সংগঠিত করা শুরুই করেছিলেন তিনি।

তখন থেকেই বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নই দেখেননি, তিনি একটি উন্নত-সমৃদ্ধ সুখী বাংলাদেশ, তাঁর কথায়, 'সোনার বাংলার' স্বপ্নও দেখেছিলেন। তিনি বলতেন, 'সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই'। অর্থাৎ দক্ষ, যোগ্য, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক, আধুনিক, শিক্ষিত

সন্তান বা মানবসম্পদ। আর তা সৃষ্টির জন্য থাকা চাই সত্যিকার মানুষ গড়ার শিক্ষা বা সুশিক্ষা।

পাকিস্তানি শাসন আমলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালির জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালিদের জন্য একটি গণতান্ত্রিক, কল্যাণকামী ও অসাম্প্রদায়িক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। শাসকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক ধাঁচের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতিবিরোধী বাংলার ছাত্রসমাজের শিক্ষা আন্দোলন জাতীয় মুক্তির বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে গৃহীত খসড়া মেনিফেস্টোতে বলা হয়েছিল, 'রাষ্ট্রের প্রত্যেকের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে থাকিবে এবং প্রত্যেক নারী-পুরুষের পক্ষে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক থাকিবে। দেশের সর্বত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিক্ষা সহজলভ্য করিতে হইবে। উচ্চতর শিক্ষা বিশেষ করিয়া কারিগরি শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র খুলিতে হইবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারি বৃত্তির সাহায্যে উচ্চতর শিক্ষা উৎসাহিত করিতে হইবে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে হইবে।'

১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বজনীন শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জোরালোভাবে উত্থাপিত হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগের ১৯৫৪ সালের গঠনতন্ত্রে 'নীতি ও উদ্দেশ্য' হিসেবে ঘোষণা করা হয় 'জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে সকল পাকিস্তানি নাগরিকের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করা। সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজনীয় খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ন্যায়সঙ্গত উপার্জনের ব্যবস্থা করা।'

১৯৫৫ সালের ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের শিক্ষানীতির পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে বলেন, 'শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা কর্মসূচিতে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। আজ পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলন হয়নি, কচি ছেলে-মেয়েদের স্কন্ধে আজও তিন-চারটি বিদেশি ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে চেপে রয়েছে। স্কুল-কলেজের উন্নতির কোনো প্রচেষ্টাই নেই। ছাত্রদের বেতন হ্রাস ও আবাসস্থলের ব্যবস্থা করার কোনো ইচ্ছা সরকারের দেখা যাচ্ছে না।'

ওপরের আলোচনা বিশ্লেষণে একটি বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তখন আস্তে আস্তে ঘনীভূত হতে থাকে তার ভেতরে শাসন কাঠামো পরিবর্তনের বিষয়টির সাথে সাথে যে বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে তা হলো সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার। বঙ্গবন্ধু এই আন্দোলনের পুরোভাগে শিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে প্রাধান্য দিয়েছেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনেও আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পাই। পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে বঙ্গবন্ধু দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন একটি অন্যতম মাইলফলক।

১৯৭০ সালে ছয় দফা দাবিকে সামনে রেখে নির্বাচনে নামেন বঙ্গবন্ধু। বলা হয়ে থাকে ছয় দফার পক্ষে ম্যান্ডেট গ্রহণ করার জন্যই তিনি নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই নির্বাচন উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া বেতার-টেলিভিশন ভাষণ থেকে তাঁর শিক্ষা-ভাবনা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না।... নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটা 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণির জন্য খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিক্যাল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মেধাবী ছাত্রদের জন্য অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।'

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধনকালে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও নারী শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন, 'শতকরা ২০ জন শিক্ষিতের দেশে নারীর সংখ্যা আরও নগণ্য। ... ক, খ, শিখলেই শিক্ষিত হয় না, সত্যিকারের আলোকপ্রাপ্ত হইতে হইবে।'

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেন এবং প্রত্যেক নাগরিকের জন্য শিক্ষা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা

হয়। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদের (ক)-তে বলা হয়েছে 'রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'

১৯৭২ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কুদরাত-এ-খুদা কমিশন দেড় বছর কঠোর পরিশ্রম করে ১৯৭৪ সালের ৩০ মে বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কারের একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সরকারের নিকট দাখিল করে। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতি ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ বঙ্গবন্ধুই নিয়েছিলেন।

কমিশন রিপোর্ট প্রদানের আগেই বঙ্গবন্ধু বেশ কিছু জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মার্চ '৭১ থেকে ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত সময়কালের ছাত্রদের সকল বকেয়া টিউশন ফি মওকুফ করেন; শিক্ষকদের ৯ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করেন; আর্থিক সংকট থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ করেন এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে তিনি দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করেন। এর ফলে ১ লাখ ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি সরকারি হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকার ৯০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাইস্কুল পুনর্নির্মাণ করেন। বঙ্গবন্ধুর আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন প্রদান।

ওপরের আলোচনা থেকে শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনাগুলোর স্বরূপ নির্ণয় করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাগ্রে যে কথাটি বলতে হয় তা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে সবচেয়ে অপরিহার্য মৌলিক অধিকার হিসেবে মনে করতেন। তিনি মনে করতেন একটি সুষ্ঠু দেশ-জাতি-সমাজ গড়ার জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষাকে কোনো শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে একে সর্বজনীন করে দেওয়ার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল লক্ষণীয়। তিনি মনে করতেন শিক্ষা হবে অভিন্ন, গণমুখী ও সর্বজনীন বা সবার জন্য শিক্ষা। নারী শিক্ষার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ

করেছেন তিনি। তিনি মনে করতেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় ভবিষ্যতের জন্য শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ।

তাঁর ভাবনায় ছিল কেউ নিরক্ষর থাকবে না, সকলেই হবে সাক্ষর; নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। নির্দিষ্ট শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা হবে অবৈতনিক ও সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। পাঁচ বছর বয়সী সকল শিশুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গমন নিশ্চিত করতে 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' গ্রহণ। স্বাধীন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হবে সমাজ চাহিদা ও জাতীয় প্রয়োজন পূরণে সক্ষম আলোকিত মানুষ তৈরি করা। সবার জন্য অন্তত মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখা। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; মেডিক্যাল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ। অর্থাভাবে কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষা লাভ যাতে ব্যাহত না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে মেধার লালন ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করা। বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি মনে করতেন। যার কারণে আমরা দেখতে পাই তিনি একসাথে ১ লাখ ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি সরকারীকরণ করেছিলেন এবং একই সাথে ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের ঘোষণা দিয়ে জাতিকে অবাক করে দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু অনুভব করেছিলেন, দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য, উন্নয়নের জন্য, সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষা। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় শিক্ষার ভিত মজবুত করা সম্ভব হবে না। টোল, মক্তব, মাদ্রাসা, পাঠশালার শিক্ষা, ব্রিটিশ ভারতের-পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। এটি ছিল একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। সদ্য স্বাধীন একটি দেশে আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক টানাপোড়েনের মধ্যে এত বড় ব্যয় সংকুলান করে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ছিল একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তিনি দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে গেছেন। উচ্চশিক্ষার উন্নয়নেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠন করে গেছেন। শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে একটি আধুনিক, শিক্ষিত ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন করার মহৎ প্রত্যয় ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের সেরা স্তম্ভ।

লেখক : ছড়াকার ও প্রাবন্ধিক

২৬ মার্চ : বাঙালির স্বাধীনতা, বাঙালির বন্ধনমুক্তির দিন

অনুপম সেন

বাংলা ভাষাভাষী বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে কয়েকটি দিন অসীম ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান থাকবে বাঙালির প্রেরণার উৎস হয়ে। এই দিনগুলো হলো ২১ ফেব্রুয়ারি, ৭ মার্চ, ২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর। বাঙালির সর্বকালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামের মাধ্যমে ২৬ মার্চ বাঙালির স্বাধীনতার যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা-ই পূর্ণতা পায় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

বাঙালি জাতিসত্তা কয়েক হাজার বছর ধরেই গড়ে উঠেছে অস্ট্রিক, মঙ্গোলয়েড, ককেশীয় ইত্যাদি বর্ণের মিলনে। এই জাতিসত্তা এই উপমহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বাঙালি জাতি হিসেবে একসময় পরিচিতি লাভ করে। তার জন্মভূমিও পরিচিতি পায় বঙ্গভূমি হিসেবে। এই বাঙালি জাতিসত্তারই মুখের ভাষা বাংলা। বাংলা ভাষা তার বর্তমান রূপের প্রাথমিক রূপ পেয়েছিল আজ থেকে হাজার বছর আগে বৌদ্ধ চর্যা ও দোঁহা পদে। এই বাংলা ভাষাভাষী বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে বিভিন্ন রাজা, বাদশাহ, সুলতান, নবাব কখনো স্বাধীন, কখনো পরাধীনভাবে রাজত্ব করেছে। সেই রাজত্বে সাধারণ বাঙালি সবসময় প্রজাই ছিল। কখনো স্বাধীন নাগরিক হয়নি। বাঙালি প্রথম স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে এই ঔপনিবেশিক শোষণের নিগড় থেকে বন্ধনমুক্তি ঘটলেও বাঙালি দেখল তাকে আরও নিষ্ঠুর ঔপনিবেশিক শোষণে আবদ্ধ করা হয়েছে। এই উপলব্ধি সামান্য কিছু মানুষের তখনই এসেছিল, যখন তাঁরা দেখলেন পাকিস্তানের ৫৫ শতাংশ জনগণ বাঙালি হলেও তার রাজধানী, কেন্দ্রীয় প্রশাসন, সবকিছুরই কেন্দ্রস্থল হলো পশ্চিম

পাকিস্তান। আরো রূঢ় আঘাত হিসেবে তাঁরা দেখলেন, তাঁদের মুখের ভাষার অধিকারও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহের হোসেন, ড. এনামুল হক প্রমুখ বাঙালি অধ্যাপক ও পণ্ডিতরা; সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে। এই প্রতিবাদে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন সেই সময়ের তরুণ ছাত্র, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রতিবাদটি উত্থিত হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ যখন 'ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকায় হরতাল ঘোষণা করে। তাঁরা প্রায় ৭০-৭৫ জন ছাত্র হরতালের দিন গ্রেপ্তার হন। যেহেতু সেই সময় পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক সংসদের অধিবেশন চলছিল, তাই প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন এক ধরনের আপসের মাধ্যমে 'ভাষা সংগ্রাম পরিষদের' শীর্ষনেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সঙ্গীসহ কারাগার থেকে ১৫ মার্চ মুক্তি দেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদদের রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন পূর্ণতা পায়।

বাঙালির এই রাজনৈতিক পরাধীনতা প্রবলভাবে মূর্ত হয় যখন ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়ী হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলেও তা দুই মাসের বেশি স্থায়ী হলো না। ১৯৫৬ সালে, দীর্ঘ ৯ বছর পরে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র বা সংবিধান রচিত হয়। কিন্তু এই সংবিধানের ভিত্তিতে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই ১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা সারা দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তিন সপ্তাহ পরে তাঁর কাছ থেকে শাসনক্ষমতা কেড়ে নেন পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান আইয়ুব খান। এই সামরিক শাসনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পরিকল্পিত শাসন ও শোষণ আরো নিষ্ঠুর রূপ নেয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব নেতা কারারুদ্ধ হন; এর মধ্যে প্রথমেই গ্রেফতার হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আইয়ুব খানের শাসনের ব্যাপ্তি ছিল দীর্ঘ এক দশকের বেশি (১৯৫৮-১৯৬৯ সালের মার্চ)। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণ (কতিপয় সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি ব্যতিরেকে) পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক শাসন ও আমলাতন্ত্র আরোপিত এই ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে অনেক আগে থেকেই সংগঠিত হতে শুরু করেছিল; ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠন করা হয়েছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ।

১৯৪৭ থেকে ১৯৬৮ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নিষ্পেষণই দুঃসহ হয়নি, অর্থনৈতিক

শোষণও চরম রূপ নিয়েছিল। পাকিস্তানের বার্ষিক রফতানি আয়ের প্রায় ৬০ ভাগ, কোনো কোনো বছর প্রায় ৭০ ভাগ আয় করেছে পূর্ব পাকিস্তান, কিন্তু এই আয়ের ফলভোগী হয়নি বাংলাদেশ বা পূর্ব পাকিস্তান। তা পাচার হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানের বার্ষিক গড় আমদানি পাকিস্তানের গড় আমদানির ৩০ শতাংশে সীমিত থাকত। এই দুই দশকে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বহির্বিশ্বের বাণিজ্যে যে বিপুল ঘাটতি হতো, তা পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত দিয়েই মেটানো হতো। পূর্ব পাকিস্তানের এই বাণিজ্য উদ্বৃত্তের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানকে বিপুলভাবে শিল্পসমৃদ্ধ করা হয়েছিল; বিদ্যুৎ উৎপাদন ও রাস্তাঘাট বিনির্মাণের মাধ্যমে তার ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়।

স্মর্তব্য, ১৯৪৯-৫০ সালে যখন পাকিস্তান সৃষ্টি হয়, তখন পূর্ব পাকিস্তানের বার্ষিক উৎপাদন (জিডিপি) ছিল ১২৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানের ১২০৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, যা ১৯৬৯-৭০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ২২৭১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকায়, পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ৩১৫৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকায়। মাথাপিছু উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩২১ টাকা এবং ৫৪৬ টাকায়। বর্তমান মুদ্রার মূল্যমানে এই অর্থ সামান্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল বিরাট। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই বিরাট বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের আয় ও সম্পদ নানাভাবে, নানাপথে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করার মাধ্যমে। সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগেও ছিল বিশাল বৈষম্য। পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও প্রাক পরিকল্পনা ও তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্বে, অর্থাৎ ১৯৫০-৭০ এই ২০ বছরে পাকিস্তানে সরকারি-বেসরকারি খাতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছিল মাত্র ৪৩৪০ কোটি টাকা যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে তা ১১৫৩৪ কোটি টাকা।

পূর্ব পাকিস্তানবাসীর ওপর আরোপিত বঞ্চনা আরও স্পষ্ট হয়, যখন আমরা দেখি, পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রথম ২৩ বছরে যে-বিশাল প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা হয়, সেখানে বাঙালির বা পূর্ব পাকিস্তানবাসীর অবস্থান বা অস্তিত্ব ছিল অতি নগণ্য। পাকিস্তানের সব বাহিনীরই হেডকোয়ার্টার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীতে জেনারেল, লে. জেনারেল, মেজর জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার, কর্নেল, লে. কর্নেল, মেজর, ক্যাপ্টেন ইত্যাদি অফিসারদের প্রায় ৯৫ শতাংশই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। বাঙালি অফিসারদের মধ্যে ছিলেন মাত্র একজন ব্রিগেডিয়ার, একজন কর্নেল, একজন

লে. কর্নেল, সামান্য কয়েকজন মেজর ও ক্যাপ্টেন। একইভাবে বৈষম্যদুষ্ট ছিল নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীও। কেবলমাত্র সামরিক আমলাতন্ত্রই নয়, কেন্দ্রীয় বেসামরিক আমলাতন্ত্রও ছিল সম্পূর্ণভাবে বৈষম্যদুষ্ট।

পূর্ব পাকিস্তানের ওপর এই অমানবিক ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে ছয় দফা দাবি উপস্থাপন করেন। এই ছয় দফায় দুটি রাষ্ট্রের অবয়ব পরিস্ফুট হয়েছিল, দুটি পৃথক অর্থনীতির রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল। ঘোষণা করা হয়েছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক মুদ্রার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে দুটি পৃথক হিসাবের, যাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার বন্ধ করা যায়। প্রাদেশিক সরকারগুলোকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারও দেওয়া হয়। ব্যবস্থা রাখা হয় প্রাদেশিক মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের। কেন্দ্রের শাসন সীমাবদ্ধ করা হয় দেশরক্ষায় ও বৈদেশিক নীতিতে।

যেহেতু ছয় দফার মধ্যে, আগেই উল্লেখ করেছি, দুটি রাষ্ট্রের অবয়ব মূর্ত করা হয়েছিল তাই কোনো পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের পক্ষে এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত তারা তা মেনে নেয়ওনি। ছয় দফা দাবি উত্থাপনের পর আইয়ুব খান বলেছিলেন শেখ মুজিব যদি যুক্তির ভাষা না বোঝেন, অর্থাৎ ছয় দফা প্রত্যাহার না করেন তাহলে তাঁকে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করেই বোঝানো হবে।

বঙ্গবন্ধু যেহেতু বাঙালির বন্ধনমুক্তির অধিকার কোনো পর্যায়েই বিসর্জন দিতে রাজি হননি, এমনকি প্রধানমন্ত্রী পদের বিনিময়েও নয়, সেই কারণে পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও রাজনীতিবিদরা সামরিক অস্ত্রের ভাষাই প্রয়োগ করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে। ৯ মাস নিঃশেষে প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে স্বাধীনতার বেদিমূলে ৩০ লক্ষ প্রাণ উৎসর্গ করে বাঙালি এক মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনে তার হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথম 'প্রকৃত স্বাধীন রাষ্ট্র' যেই রাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো ঘোষণা করা হয় 'রাষ্ট্রের মালিক জনগণ'। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সাংবিধানিক এই ঘোষণার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুই বাংলা ভাষাভাষী বাঙালিকে তার হাজার বছরের ইতিহাসে তার প্রথম প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতায় অভিষিক্ত করেন।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন পাকিস্তানের কারান্তরাল থেকে। কিন্তু যে দেশ তিনি পেলেন, সে দেশ

ছিল সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত, লুণ্ঠিত ও রিক্ত। ঔপনিবেশিক বন্ধনমুক্ত দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করার জন্য বঙ্গবন্ধু অনেকগুলো ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে দুটি উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রথম ১০ মাসের মধ্যে দেশকে সুদৃঢ় রাজনৈতিক ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড় করানোর জন্য একটি অসাধারণ সংবিধান প্রণয়ন। দ্বিতীয় দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করার জন্য অবিলম্বে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন। ভুললে চলবে না, বঙ্গবন্ধু ঔপনিবেশিক শোষণরিক্ত যে বাংলাদেশ পেয়েছিলেন তার ৬০ শতাংশ জনগণ ছিল দারিদ্র্যসীমার নিচে। উপরন্তু দেশের কোনো শিল্পভিত্তি ছিল না, কেবলমাত্র পাটশিল্প ছাড়া। এছাড়া দেশের প্রধান জীবিকা কৃষি হলেও সেই কৃষিকে এমনভাবে অবহেলা করা হয়েছিল যে, পঞ্চাশের দশকের শেষে দেশের বার্ষিক খাদ্যঘাটতি দাঁড়িয়েছিল প্রায় ২০ লক্ষ টন। বঙ্গবন্ধু তাই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন কৃষিকে, যাতে দেশকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করা যায়। এর পরেই গুরুত্ব দিলেন শিল্প উৎপাদনকে, গুরুত্ব দিলেন শিক্ষাকে। তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল তা তাঁর শাসনামল সমাপ্তির সাত বছর পরেও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বঙ্গবন্ধুর আরম্ভ করা বিশাল অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞ আজও যেকোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিকে বিস্মিত করবে। এমনকি তিনি ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করার পথেও এগিয়েছিলেন, ছিটমহল বিনিময় চুক্তি ও সীমান্ত চুক্তি করেছিলেন। তাঁর শাসনামল বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট হয়, বাঙালির আজ যে উন্নয়নের পথে অভিযাত্রা তার ভিত্তিভূমি তিনিই প্রস্তুত করেছিলেন, যদিও সে সময়ের বিশ্ব ছিল অর্থনৈতিকভাবে এক বৈরী বিশ্ব। স্মর্তব্য, এই সময়ে ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের ফলে জ্বালানি তেলের দাম হয়েছিল গগণচুম্বী। এত সব বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের আলোক রেখাটি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন ১৯৭৫ সালের মধ্যভাগেই। তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদক্ষেপও নিয়েছিলেন। '৭৫ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরেই তাঁর উদ্যোগের ফলে কৃষিতে বাম্পার ফলন হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই পরাজিত পাকিস্তানি শত্রুর এজেন্টরা এক বিশাল চক্রান্তের মাধ্যমে তাঁকে সপরিবার নিহত করে দেশকে আবার কয়েক দশক পিছিয়ে নেয় সব ক্ষেত্রে।

প্রায় দীর্ঘ আড়াই দশক পরে তাঁর কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আসীন হয়ে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে, সর্বজনের আহার ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান করতে, তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ করতে যে প্রচেষ্টা শুরু করেছেন, তা গত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক অসাধারণ সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এই অর্থনৈতিক মুক্তির কথাই বঙ্গবন্ধু ১০ লক্ষ জনতার সামনে ৭ই মার্চের ভাষণে, বিশ্ব ইতিহাসের স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ ভাষণের শেষ বাক্যে ঘোষণা করেছিলেন–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

লেখক : শিক্ষাবিদ

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে একজন মহান পুরুষ

ঝর্না রহমান

চির মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃথিবীতে দেশে-দেশে জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধবিগ্রহ, লোভ, হানাহানি, হত্যা, জিঘাংসার উন্মত্ততা দেখে ব্যথিত কণ্ঠে বলেছিলেন, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব; / ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ! এই লোভ আর হিংসার নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব থেকে মানুষকে মানবিক ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি শুভচৈতন্যময় নতুন কোনো মহৎ প্রাণের আবির্ভাব কামনা করে বলেছেন, 'নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী/ কর ত্রাণ মহা প্রাণ, আন অমৃতবাণী,/ বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।' বাঙালির জাতীয় জীবনের অন্ধকার দূর করে, এ দেশের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য এমনি একজন মহাপ্রাণ ত্রাণকর্তার জন্ম হয়েছিল। তিনি এ দেশের দুঃখকাতর জনগণের ভাগ্যাকাশে এক চিরদেদীপ্যমান সূর্য। তিনি বাংলার স্বাধীনতার স্থপতি, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানব, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান; বাংলাদেশের মানুষের হাতে যিনি তুলে দিয়েছিলেন পদ্মা-মেঘনা-যমুনার ঠিকানার দলিল–স্বাধীনতা, যিনি এ দেশের মানুষকে আত্মপরিচয়ের শ্লাঘায় উদ্দীপ্ত করে লাল-সবুজের পতাকাতলে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন!

এই অর্জন একদিনে সম্ভব হয়নি। সুদীর্ঘকালের বিদেশি শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে দেশের মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলা এবং স্বভাষা, স্বসংস্কৃতি ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে ক্রমে তাদের স্বাধীনতাসংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করা খুব সহজ কাজ ছিল না। দুই শতাব্দীর ইংরেজ শাসন এ দেশের সাধারণ মানুষের মর্মমূলে গভীরভাবে ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তি প্রোথিত করে দিয়েছিল। ব্রিটিশ বেনিয়া শাসকদের কুটিল রাষ্ট্রচক্রের আবর্তে ঘুরপাক

খাওয়া এ দেশের জনগণ ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সব দিক থেকে অবহেলিত, বঞ্চিত, পাশাপাশি ছিল দিকভ্রান্তও। স্বাধিকার চিন্তা, মুক্তি চেতনা, স্বাতন্ত্র্যবোধ সব ছিল ধুলোর আস্তরণে ঢাকা। এই আবরণ সরিয়ে জনমানসে মুক্তির আলোকময় দিগন্ত উদ্ভাসিত করে দিতে এই অবিসংবাদিত নেতার উত্থান ঘটেছিল। বিশ্বকবি রচিত সেই কবিতার মতোই তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল মানব ত্রাণ, তাঁরও মুখে ছিল অমৃতবাণী। তাঁরও অঙ্গুলি শীর্ষে ছিল এক চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা, যে নির্দেশনায় ছিল জাতির উদয় দিগঙ্গন, জনতার শোষণমুক্ত জীবনের ঠিকানা। সাতচল্লিশের দেশ ভাগের পর থেকে পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক সর্বব্যাপী আন্দোলন। বাংলার জনগণের কাছে ক্রমে এই নেতা হয়ে উঠেছিলেন মুক্তির দূত। তিনিও একজন মহান কবির মতোই উচ্চারণ করেছিলেন অমর বাণী–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। শোষিত মানুষের সামনে তিনি তুলে ধরেছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত জীবনের ইশতেহার, তাদের হতাশাপূর্ণ চোখে এঁকে দিয়েছিলেন স্বাধীন দেশে নিজের মতো করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন, মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন সুন্দর জীবনের আশা। একাত্তরে তাঁর নেতৃত্ব তাই অনিবার্যভাবে জরুরি হয়ে উঠেছিল। দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে এমন গণজোয়ার সৃষ্টি করে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করা এবং শত্রুর কারাগারে বন্দি থেকেও হিমালয়প্রতিম দৃঢ় ব্যক্তিত্বশক্তি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে ৯ মাসের মধ্যেই দেশ স্বাধীন করার ইতিহাস বিশ্বে আর কোনো নেতা রচনা করতে পারেননি।

একাত্তরে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি, তার পেছনে যে দীর্ঘকালের আন্দোলন-সংগ্রাম আর লড়াইয়ের ইতিহাস রয়েছে, তিনি ছিলেন তার একেবারে শুরু থেকেই। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের জাতীয় চেতনার উৎস। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এই ভাষা আন্দোলনের এক অগ্রপথিক। ভাষার জন্য লড়াই করে জেল খেটেছেন, তাঁর প্রতি পদক্ষেপে ছিল শাসকের রক্তচক্ষুর নজরদারি। কিন্তু সেই রক্তচক্ষুর ভয়ে ভীত না থেকে তিনি দেশের মানুষের মুক্তির জন্য দিন-রাত কাজ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি তাঁর

ঐক্যশক্তিকে আবিষ্কার করতে পেরেছে। এই শক্তিই দেখাবে মুক্তির পথ। এ পথেই আসবে স্বাধীনতা। প্রতি পদক্ষেপে দুঃখ-কষ্টময় জীবনকে বরণ করে তিনি সেই পথ নির্মাণ করেছেন। একটি জাতির পুরো জনগোষ্ঠীকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে আসা সহজ কাজ নয়। নিজের জীবনের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, পারিবারিক জীবনের নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার দিনযাপন–সব কিছু বিসর্জন দিয়ে শুধু পরার্থে জীবন উৎসর্গ করতে সবাই পারেন না। যাঁরা পারেন, তাঁরাই মহামানব। যুগে যুগে তাঁরাই মানুষকে নানাভাবে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু সেই মহান মানুষের কাতারে এক স্বর্ণপ্রভ নাম।

বঙ্গবন্ধুর মানবতাবাদী হৃদয় তাঁকে তরুণ বয়সেই মানব কল্যাণের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। বাংলার মানুষের ভাগ্য ফেরানোর জন্য তাঁর জীবনের সমস্ত সুখ তিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন। মাত্র পঞ্চান্ন বছরের জীবনে তিনি প্রায় তেরো বছর জেল খেটেছেন। প্রতিবার তাঁকে জেলের নির্জন সেলে একাকী অবস্থায় দুঃসহ বন্দিজীবন কাটাতে হয়েছে। স্ত্রী-পুত্রপরিজনের সাথে আনন্দময় প্রশান্তিপূর্ণ গৃহী জীবন তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। কিন্তু তার জন্য তিনি কাতর ছিলেন না। অত্যাচার-নিপীড়ন বন্দিত্ব সবকিছুকেই তিনি দেশের মানুষের মুক্তির মূল্য হিসেবে দেখেছেন। হাসিমুখে সহ্য করেছেন সমস্ত নির্যাতন। জেলের নিঃসঙ্গ দিনগুলোতে অনেক কষ্টে সাধারণ এক্সারসাইজ বুক খাতার পাতায় সস্তা কলমে লেখা তাঁর রাজনৈতিক ও জেলজীবনের বয়ান, যা বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' নামে দুটি বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে দেখা যায় কত ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং সততার মধ্য দিয়ে কী গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে জাতির নেতৃত্ব দিতে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন! বছরের পর বছর জেলের অন্ধকার কক্ষে বন্দি থেকেও তিনি দেশের মানুষের কথাই ভেবেছেন। এমনকি জেলের বন্দিদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা ইত্যাদি অধিকার নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষের সাথে দেনদরবার-বাদানুবাদ করেছেন। কখনো নিজের সুবিধার কথা বলেননি। কারাগারের রোজনামচা বইয়ে দেখা যায়, লিখতে গিয়ে যখনই নিজের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে তখনই তিনি জোর করে কলম থামিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'আমার কথা থাক'। নিজের খাবার জেলখানার ফালতু, বাবুর্চি, পাহারা, মালিদের সাথে ভাগ করে খেয়েছেন। এমনকি সামান্য চা-মুড়িও ওদের না দিয়ে তিনি একা খাননি। কোনো সেলে পরিচিত কারো জামাকাপড় আর বিছানার কষ্ট শুনে নিজের

জামাকাপড় কম্বল পাঠিয়ে দিয়েছেন। এমন একজন মানবদরদি মানুষ বাংলার নেতা হয়েছিলেন বলেই তিনি শুধু রাজনৈতিকভাবে বাঙালি জাতির পিতা হননি, স্নেহমায়া-ভালোবাসার কারণেই তিনি ছিলেন প্রকৃত পিতা। বাংলার মানুষকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবেসেছিলেন। কোনো স্বার্থচিন্তা বা প্রলোভন তাঁকে টলাতে পারেনি। তাই ৭ই মার্চের ভাষণে যখন পুরো দেশ তাঁকে মানুষের ভাগ্যদেবতা বলে গ্রহণ করে নিয়েছে, তিনি বলতে পারেন, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমি বাংলার মানুষের অধিকার চাই!

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে হতভাগ্য বাঙালি আরও দুশো বছরেও স্বাধীনতা পেত কি না সন্দেহ। অথচ আমরা কত বড় অকৃতজ্ঞ জাতি, আমাদের এই মুক্তির দূতকে আমরা স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় সবংশে হত্যা করে ফেলি! ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি দিয়ে যে কর্ণধার আমাদের মুক্তির বন্দরে নিয়ে এলেন, নৌকা থেকে নেমেই আমরা তাঁকে গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা করে ফেলি! এ দেশের মানুষের অকৃতজ্ঞতা আর হঠকারিতার সীমা নেই। ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে এসেই দ্রুত হাতে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতির অরাজক বিশৃঙ্খলাকে পুনর্বিন্যাস করে দেশকে গুছিয়ে তোলার কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর এনে দেওয়া স্বাধীনতার সুফল ভোগ করে একদল স্বার্থপর লালসা লোলুপ অপমানুষ ছদ্মবেশে ভালো মানুষের মুখোশ এঁটে তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়ে ছুরি শাণাতে লাগল। বাংলার মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অগাধ বিশ্বাস, অবিচল আস্থা আর অন্ধ ভালোবাসা। তাই তিনি এসব চক্রান্ত দেখতে পান না, দেখেও মানতে চান না। তিনি ভাবতেও পারেন না, তাঁর শত্রু থাকতে পারে, তাঁর দেশপ্রেম, দেশ গড়ার কাজ, সমস্যা সংকট নিরসনের সংস্কার চিন্তাকে কেউ ভুল ভাবতে পারে! ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের ভোরের কালপ্রহরে যখন বঙ্গবন্ধুর বুক বরাবর তাঁর চেনা সেনাসদস্যরা বন্দুক তাক করেছিল, সদ্য ঘুম ভাঙা, হাতে পাইপ, বঙ্গবন্ধু চশমার ভেতর দিকে তাদের দিকে সেই অসীম বিশ্বাসের নেত্রপাত করে বিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন, 'তোরা কী চাস? কোথায় নিয়ে যাবি আমাকে?' কিন্তু ঘাতকেরা তাঁকে আর কিছু বলার সুযোগ দেয়নি। ব্রাশ ফায়ার করে

ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল তাঁর বুক। বত্রিশ নম্বর বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে তাঁর অসীম ভালোবাসা ভরা বুকের রক্তধারা নেমে এসেছিল রাজপথে। মিশে গিয়েছিল বঙ্গোপসাগরের জলে।

অতীতকাল থেকে বিশ্বে অনেক রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। আব্রাহাম লিংকন, জন এফ কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধীসহ অনেক নেতার কথা আমরা জানি, যাঁরা তাঁদের প্রগতিবাদী চেতনা ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য হিংস্র ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। মানুষের পৃথিবীতে কিছু অমানুষ সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বসবাস করে আসছে। মহামানবদের উদার নৈতিক কর্মকাণ্ড তাদের স্বার্থে আঘাত করে। তখন হত্যার মধ্য দিয়ে তারা তার প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু তার জন্য কখনও মহামানবের মহৎ কর্ম থেমে থাকে না। পরম মানবতাবাদী অহিংস অসাম্প্রদায়িক মহাত্মা গান্ধীকেও ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি উগ্র হিন্দু মৌলবাদীদের হিংসার বলি হয়ে প্রাণ দিতে হয়। হত্যাকারী নাথুরাম গডসের গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে তিনি অসীম বিস্ময়ে শুধু দুটি কথা উচ্চারণ করেছিলেন 'হে রাম!' স্বাধীন ভারতে তাঁকে কেউ হত্যা করতে পারে এ কথা যেন তিনি মৃত্যুর মুহূর্তেও বিশ্বাস করতে পারেননি! বঙ্গবন্ধুও ভাবতে পারেননি, স্বাধীন দেশের মাটিতে, তাঁকে সহচর সহকর্মীদের চক্রান্তের শিকার হয়ে তাঁরই অধীনস্ত সেনাসদস্যদের হাতে শিশুপুত্রসহ সপরিবারে প্রাণ দিতে হবে। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে সবসময় কিছু মানুষ থেকে যায়, যাদের হাতে থাকে লোভ ও স্বার্থের শাণ দেওয়া ভয়াল কুঠার। ছায়াদায়ী, মায়াদায়ী, হাওয়াদায়ী, জীবনদায়ী মহাবৃক্ষকে সমূলে বিনাশ করতে তাদের একমুহূর্ত বিলম্ব হয় না। এই সমস্ত হিংস্র পশুকে সমাজ থেকে নির্মূল করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

১৫ই আগস্টের কালপ্রহরে বাঙালি জাতির জীবনে বিধাতার এক চরম অভিশাপ নেমে এসেছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সে সময়ে জার্মানিতে অবস্থান করায় তা ছিল জাতির জন্য পরম আশীর্বাদ। পঁচাত্তরে মাতা-পিতা, ভাই-বোনসহ পরিবারের সব সদস্যকে হারিয়ে নিঃস্ব-রিক্ত তরুণী শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এসে শোকের মহাসমুদ্রকে বুকে বেঁধেও অসীম সাহসে পিতার অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব

কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি হয়েছেন দেশের কাণ্ডারি। স্বার্থলোলুপ হিংস্র ঘাতকেরা ইনডেমনিটি বিল পাস করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল। শেখ হাসিনা এর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করে গেছেন। শোককে শক্তিতে পরিণত করে দৃঢ় প্রত্যয়ে উচ্চারণ করেছেন, এই বাংলার মাটিতেই পঁচাত্তরের ঘাতকদের বিচার হবে। ফলস্বরূপ দীর্ঘ একুশ বছর পর ইনডেমনিটি বিল বাতিল হয়ে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়। অবশেষে বঙ্গবন্ধু হত্যার পঁয়ত্রিশ বছর পরে ২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি ৫ খুনির ফাঁসি কার্যকর করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের নৃশংসতম হত্যার বিচার সম্পন্ন করেন।

পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট যারা জাতির জনকের বুকে গুলি ছুড়ে হৃদপিণ্ড ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল, তারা ঝাঁঝরা করেছিল স্বাধীনতার পতাকারই বুক। তারা জানে না, বঙ্গবন্ধুর হৃৎপিণ্ডের প্রবল লাল রক্ত পতাকার কেন্দ্রমূলে জমাট বেঁধে থাকবে অনন্তকাল। জীবিত মুজিবের চেয়েও তাই নিহত মুজিব অনেক বেশি জীবন্ত। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থের দুই মলাটের নাম। একটি থাকলে আর একটিও অনিবার্যভাবেই থাকবে।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও শিশু সাহিত্যিক

বঙ্গবন্ধুর একটি অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার

নির্মলেন্দু গুণ

বঙ্গবন্ধু, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার
আশায় ২৫ মার্চের সন্ধ্যায় অনেকের মতো
আমিও আপনার বাড়িতে এসেছিলাম।
কিন্তু ঐ দিন দেশ-বিদেশের সাংবাদিক ও
দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য
আপনি ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেননি।
বাড়ির ভিতরের কোনো একটি কক্ষে
আপনি আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গোপন-আলোচনায় ব্যস্ত
ছিলেন। ফলে ঐ কালসন্ধ্যায় আমি
আপনার দর্শন পাইনি।

√

হ্যাঁ, ইয়াহিয়া সাহেব আমার সঙ্গে চলমান
আলোচনার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা
না করেই, আমাকে কিছু না জানিয়েই
গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেছিলেন।
আলোচনার মাঝপথে ইয়াহিয়া খানের ঐ
হঠাৎ চলে যাওয়াটা আমাদের জন্য ছিল
একটা অশনি সংকেত।
আমার ধারণা হয়েছিল–ইয়াহিয়া খান
এবং ভুট্টো সাহেবরা আর আমাদের সঙ্গে
উর্দু, পাঞ্জাবি বা ইংরেজি ভাষায় নয়,
বাংলায় তো নয়ই,–তারা এবার আমাদের
সঙ্গে অস্ত্রেও ভাষায় কথা বলবেন।
যে অস্ত্রের ভাষায় ছয় দফার বিরুদ্ধে কথা
বলতে শুরু করেছিলেন ইয়াহিয়া খানের
পূর্বসূরি ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান।

√

ঠিক তাই। আপনার বাড়ি থেকে বের হয়ে
যাবার কিছুক্ষণ পরই, রাত ১১টার দিকে
অপারেশন সার্চলাইটের সশস্ত্র আক্রমণ
শুরু হয়। আমি তখন আজিমপুরে ইডেন
কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম–
ছেলেরা গাছ কেটে রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি
করছিল। তখনই ঢাকার আকাশে শুরু হয়
গুলির বজ্রবৃষ্টি। শুরু হয় পাকবাহিনীর
নির্বিচার গণহত্যা। অপারেশন সার্চলাইট।
ওরা আক্রমণ চালায় পিলখানা ও
রাজারবাগে। জগন্নাথ হল ও সার্জেন্ট
জহুরুল হক হল থেকে ভেসে আসতে থাকে
এমন সব ভয়ংকর ও ভয়াবহ শব্দ, যা
আমরা পূর্বে কখনও শুনিনি।
টিএসসিতে তাঁবু খাটিয়ে ওরা নিকটবর্তী
রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হলেও
প্রবেশ করেছিল।

√

আমি জানতাম, আলোচনায়
আমাকে ছয় দফা থেকে চুল পরিমাণ টলাতে
ব্যর্থ হয়ে পাকিস্তানের মাথামোটা সামরিক
জান্তা ও তাদের সহযোগী ভুট্টো জাতীয়
সংসদ নির্বাচনে জয়ী আওয়ামী লীগের
কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে–
আমার নিরস্ত্র মানুষের ওপর হিংস্র হায়েনার মতো
ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি চাইছিলাম,
বিশ্ববাসী তা দেখুক, জানুক।
আর্মি ক্র্যাকডাউন শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের
মধ্যেই আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা
ঘোষণা করলাম।

আমার ঐ স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রচার
করার জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছিলাম
ইপিআরের একাধিক সদস্যকে। তারা
ট্রান্সমিটার নিয়ে আমার গ্রিন সিগন্যালের
অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল।
ঐ ঘোষণাপত্রে আমি বলেছিলাম–'আজ
হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন'।
আমি বলেছিলাম–'পাকিস্তানি দখলদার
বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি
হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত
বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও'।
তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকসেনারা
আমার বাড়ি ঘিরে ফেলে এবং আমাকে
গ্রেফতার করে।
আমি জানতাম ওরা সর্বক্ষণ আমাকে
গুলির মুখেই রেখেছিলো–। ওরা কিন্তু
আমাকে গ্রেফতার করতে চায়নি, ওরা
আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। ওরা
ভেবেছিল আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব এবং
পালানোর সময় বত্রিশ নম্বরের
আশপাশেই ওরা আমাকে গুলি করে হত্যা
করবে এবং বিশ্ববাসীকে বলবে আওয়ামী
লীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণেই শেখ
মুজিব উগ্রপন্থী আওয়ামী লীগারদের হাতে
নিহত হয়েছেন। তাতে বিশ্ববাসী বিভ্রান্ত
হতো। আমার জনগণও বিভ্রান্ত হতো।
আমি পাকিস্তানিদের এই পরিকল্পনাটি
বাস্তবায়িত হতে দেইনি।

আমি পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের
নেতা, পূর্ব বাংলার মানুষ আমাকে প্রাণের
মূল্যে ভালোবাসে। আমি কেন পালাব?

√

আমি আপনার ঐ বিচক্ষণ সিদ্ধান্তকে
সমর্থন করেছি।
নদীপথে পালাতে গিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা
ভগবান গোলায় ধরা পড়েছিলেন।
আপনার কি মনে পড়েছিল ঐ ঘটনাটির কথা?

√

আপনি কবি। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ।
আপনি ঠিকই ধরেছেন। হ্যাঁ, আমি
বাংলার শেষ নবাবের জীবনের ভুলগুলি
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম।

√

বঙ্গবন্ধু, তখনও আপনি বঙ্গবন্ধু হননি
যদিও, আপনাকে আমি বঙ্গবন্ধু বলে
সম্বোধন করতেই ভালোবাসি, আনন্দ বোধ করি।
১৯৬৬ সালে বাঙালির মুক্তিসনদ ছয় দফা
ঘোষণা করার পর, ১৯৬৭ সালে আমি
আপনাকে উৎসর্গ করে একটি দীর্ঘ কবিতা
(প্রচ্ছদের জন্য) লিখেছিলাম।

√

আপনি কি দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত
আপনার কবিতাটির কথা বলছেন?

√

হ্যাঁ, ১৯৬৭ সালের ১২ নভেম্বর ঐ কবিতাটি
দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সাময়িকীতে
প্রকাশিত হয়েছিল। আপনি তখন
বাঙালির মুক্তির সনদ 'আমাদের বাঁচার
দাবি ছয় দফা কর্মসূচি' প্রদান করার জন্য
ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন।
আপনিসহ আওয়ামী লীগের প্রায় তিরিশ
হাজার নেতাকর্মী তখন কারারুদ্ধ।

আপনার কাছে আমার কবিতাটি
পৌঁছেছিল বলে শুনেছি।
আপনি কি আমার ঐ কবিতাটি
সত্যিই পড়েছিলেন?

√

হ্যাঁ, আপনার ঐ কবিতাটি আমি
পড়েছিলাম। একাধিকবার পড়েছিলাম।
খুব কঠিন কবিতা ছিল ওটা। আমি খুবই
খুশি হয়েছিলাম। আমি বুঝেছিলাম আমার
দেওয়া ছয় দফার মধ্যে পূর্ব বাংলার মানুষের
স্বাধীনতার যে-স্বপ্নবীজ আমি বপন
করেছি–একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তরুণ
কবির চিত্তভূমিতে সেই স্বপ্নবীজ অংকুরিত
হয়েছে। আপনার কবিতার ছন্দটাও আমার
খুব ভালো লেগেছিল।

√

ধন্যবাদ বঙ্গবন্ধু।
আপনাকে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়ে
প্রথম কবিতাটি লিখতে পেরে আমি খুব
আনন্দিত ও গর্বিত বোধ করি।
আমার প্রশ্ন, আপনি কেমন করে
বুঝেছিলেন যে, ঐ ছয় দফাই অনিবার্যভাবে
একপর্যায়ে স্বাধীনতার এক দফায় পরিণত হবে?

√

আমি জানতাম। আমার ছয় দফা কর্মসূচিটি
ছিল এমন যে, পাকিস্তানি স্বৈরশাসকরা
এই ছয় দফা গিলতেও পারবে না, আবার
উগলে ফেলে দিতেও পারবে না। আমি
চতুর শিয়ালকে কলসিতে দুধ খেতে দিয়েছিলাম।
গিললে ছয় দফাভিত্তিক যে শাসনতন্ত্র তৈরি
হবে তাতে শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয়, পশ্চিম

পাকিস্তানের চারটি প্রদেশও পূর্ব বাংলার
মতো স্বায়ত্তশাসিত প্রায়-স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে।
এই ভয়েই পাকিস্তানিরা ছয় দফাভিত্তিক
শাসনতন্ত্র গিলতে পারবে না।
আমি জানতাম নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরও
তারা আমাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে
না। তারা অস্ত্রের ভাষায় কথা বলবে।
বলবেই।

২
তারা আমার দেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর
সশস্ত্র আক্রমণ চালাবে। তারা ছয় দফার কবর
রচনা করবে, আর আমরা পাকিস্তানের
কবরের ওপর সৃষ্টি করব আমাদের
'মুক্ত ভূমণ্ডল'–প্রোথিত করব সবুজের
মাঝে লাল সূর্যখচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা।
√
ধন্যবাদ প্রিয় বঙ্গবন্ধু, আপনার ছয় দফা
কর্মসূচি নিয়ে আমারও এ রকমই ধারণা
ছিল। ঐ কর্মসূচির মধ্যেই নিহিত ছিল
পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার বীজমন্ত্র।
১৯৭০-এর জাতীয় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা
পাওয়াটা খুবই জরুরি ছিল
আপনার দীর্ঘলালিত স্বপ্ন-পূরণের পথে
অগ্রসর হওয়ার জন্য।
আপনি কি বুঝেছিলেন ১৯৭০-এর জাতীয়
নির্বাচনে আপনি ১৬৭টি আসন পাবেন?
√
হ্যাঁ, বুঝেছিলাম। আমি ছয় দফার পক্ষে
প্রায় ৬০টি জনসভা করেছি দেশের বিভিন্ন
প্রান্তে। আমি তাদের বোঝাতে পেরেছিলাম,

ছয় দফাই হচ্ছে বাঙালির মুক্তিসনদ।
পূর্ব বাংলার বিপন্ন মানুষের সামনে এর চেয়ে
উত্তম কোনো বিকল্প রাজনৈতিক কর্মসূচি
অন্য কারও ছিল না।
তখন ভাসানী সাহেব বলেছিলেন, 'ভোটের
আগে ভাত চাই'।
আমি বলেছিলাম, 'ভাতের জন্যই ভোট চাই'।
বাংলার মানুষ আমার কথা মেনে নিয়ে,
নির্বাচনে ভোট দিয়ে আমাকে তাঁদের নেতা
বানিয়েছেন। আমার ছয় দফার পক্ষে
পূর্ব বাংলার জনগণ রায় দিয়েছে।
রেসকোর্স ময়দানে জাতীয় সংসদের
নির্বাচিত সদস্যদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে
আমি বলেছিলাম–'ছয় দফার প্রশ্নে যদি
কেউ আপস করে, সে আমি হলেও, এই
রেসকোর্স ময়দানে আপনারা তাদের জ্যান্ত কবর দেবেন।'
√
আমার মনে আছে বঙ্গবন্ধু। আমি ঐ
শপথানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম।
√
আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ
এনে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা আমার
গলায় যে ফাঁসিটি পরাতে চেয়েছিল, ঐ
ফাঁসির রজ্জুটাকে আমি বর্বর পাকিস্তানের
গলায় পরিয়ে দিয়েছি।

আজ আর কোনো কথা নয়, কবি। আমার
অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে।
আপনারা কবিরা জাতিকে স্বপ্ন দেখান।
সুন্দরের স্বপ্ন। স্বাধীনতার স্বপ্ন। আমরা
রাজনীতিবিদরা কবিদের সুন্দরের স্বপ্নকেই
বাস্তবে পরিণত করি। আমরা এখন

স্বাধীনতা পেয়েছি। এই স্বাধীনতার সুফল
বাংলার মানুষের ঘরে-ঘরে পৌঁছে দিতে না
পারলে, রক্তমূল্যে পাওয়া এই স্বাধীনতা
অর্থহীন হয়ে যাবে।

√

ধন্যবাদ বঙ্গবন্ধু। আপনি আমার মতো
একজন সামান্য কবিকে অনেক সময়
দিয়েছেন। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি গর্বিত।

√

না, না, এ রকম বলবেন না। আপনি বয়সে
ছোট হতে পারেন, কিন্তু সামান্য কবি আপনি
নন। কীটস বা সুকান্ত তো অল্প বয়সে মারা
গিয়েছেন–কিন্তু কবি হিসেবে তাঁরা তো গুরুত্বপূর্ণ।
তাঁদেরই সমগোত্রীয় কবি আপনি।
আপনি আপনার 'হুলিয়া' কবিতায়
আমার নেতৃত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ
করেছিলেন–'শেখ মুজিব কি ভুল করছেন?'
সামান্য কবি হলে আপনি না আমাকে
উৎসর্গ করে কবিতা লিখতে পারতেন, না
আমাকে নিয়ে এ রকম সংশয় প্রকাশ করতে
পারতেন আপনার কবিতায়।

√

আমাকে লজ্জা দেবেন না, বঙ্গবন্ধু। এখন
আর আপনাকে নিয়ে আমার মনে কোনো
সংশয় নেই।
আপনি এখন সকল সংশয়ের ঊর্ধ্বে।

√

বঙ্গবন্ধু হো হো করে হাসলেন। পাইপে
অগ্নিসংযোগ করে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন।
আমিও আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।
তাঁর করস্পর্শ লাভের আশায় আমি তাঁর

দিকে বাড়িয়ে দিলাম আমার হাত।
তিনি আমার হাত ধরে দরোজার দিকে
অগ্রসর হতে-হতে বললেন–

√

কবি, আমার জীবদ্দশায়, আমাকে নিয়ে
আপনিই প্রথম কবিতাটি
লিখেছিলেন। ঐ সময়ে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী'
শেখ মুজিবুর রহমানকে সমর্থন জানিয়ে
কবিতা লেখাটা আপনার জন্য বিপজ্জনক
হতে পারত। তার পরও আপনি লিখেছেন।
আমি আপনার পবিত্র সাহসের প্রশংসা করি।
আমার মৃত্যু কখন, কীভাবে হবে, আমি জানি না।
তবে আমার মৃত্যু যেভাবেই হোক, যখনই
হোক–আমি জানি, আমার মৃত্যুর পরও
আপনিই আমাকে নিয়ে প্রথম কবিতাটি লিখবেন।

স্বাধীনতার জন্মকথা

মহাদেব সাহা

আবার বলি পুরোনো সেই কথা
সাতই মার্চ মোদের স্বাধীনতা,
শেখ মুজিবের বজ্রকণ্ঠবাণী
স্বাধীনতার সেই ঘোষণাখানি,

হুকুম দিবার নাও যদি পারি,
সেই ছিল মুক্তিযুদ্ধের ডাক
রমনা মাঠে জয়ের ধ্বনি,
আকাশ নির্বাক।

প্রাণ দিল লক্ষ মানুষ
স্বাধীন হলো দেশ
বাংলা থেকে পাকিস্তান শেষ,
বীর বাঙালি সেদিন জাগে সব
স্বাধীনতার সেইতো জন্মোৎসব।

সেই আমাদের বাংলা ফিরে পাওয়া
সেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ
সেই আমাদের সোনার বাংলা গাওয়া।

রমনা মাঠে জয় বাংলা গেয়ে ওঠে পাখি
সেদিন থেকে বাংলাকে বাংলা নামে ডাকি,
মুজিবরের কণ্ঠে প্রথম উঠল স্বাধীনতা
সেই আমাদের স্বাধীনতার অমর জন্মকথা।

অনন্ত মুজিব জন্ম

মুহম্মদ নূরুল হুদা

মুহূর্তে মুহূর্তে তুমি জন্ম নাও তোমার ভিতর,
মুহূর্তে মুহূর্তে তুমি জন্ম নাও আমার ভিতর;
মুহূর্তে অনন্ত জন্ম, এই মাটি অমরা বাসর;
বাঙালি মুজিব জাতি, চিরবাংলা মুজিবের ঘর।

কে বলে তোমার জন্ম এই বঙ্গে শুধু শতবর্ষ আগে?
কে বলে তোমার জন্ম থেমে গেছে ঘাতক মুত্যুতে?
তুমি আছো স্বর্গে-মর্ত্যে উদয়াস্ত অভ্র অনুরাগে,
পলে পলে পল্লবিত, সর্বভূ-তে, সব ফলন্ত ঋতুতে।

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে-মুহূর্তে বিশ্ব-মন-মাটি
ত্রিভুবন ঘুরে এসে মিশে গেছে খড়ো বঙ্গনীড়ে,
গণবাঙালির সেই স্বর্গাদপি আদিমাটি, পরিপাটি,
ধারণ করেছে এক বিশ্ব-ভ্রূণ, এই মধু-গঙ্গা তীরে;

অনন্তর অন্তরঙ্গে বাঙালির স্বাধীনতা, সাম্য, সদাচার;
সর্ব-অঙ্গে সর্বপ্রাণে বাঙালি, মানুষ আর প্রাণী একাকার;
প্রমিত স্বরূপ তার প্রমূর্ত বিমূর্ততার, সর্বমানবিকতার;
মানুষ, বাঙালি আর জাতিমৈত্রী : উৎসে শুধু শুদ্ধাচার।

অনন্তর জাতি বাঙালির বুকে মানবিক জনক উদগ্রীব,
অনন্তর অনন্ত জন্মের বুকে নৈয়ায়িক জনক মুজিব।

কোটি মানুষের অনুভবে

কামাল চৌধুরী

লাল পলাশের আকাশ দিয়েছ উড়িয়ে
পতাকা দিয়েছ কাদামাটি আর সবুজে
ঠিকানা দিয়েছ, জন্মের জয়ধ্বনি
উন্নত শির, মহাকালে তুমি তূর্য।

ইতিহাসে দেখি প্রতিটি পাতায় তোমাকে
রোদ বৃষ্টিতে স্মৃতি সত্তায় দাঁড়িয়ে
মুজিব মিনারে, অতি উজ্জ্বল আলোতে
তারারা এসেছে তোমারই গল্প শোনাতে

সেখানে আমার কিশোরবেলার স্মৃতিরা
হাজার বছর পায়ে হেঁটে হেঁটে আসছে
পদতলে মাটি লাল হয়ে গেছে রক্তে
কত মৃত্যুর পরে মাথা উঁচু স্বপ্ন।

মানুষ আসছে, মিছিল আসছে পেছনে
মানুষ আসছে, মুজিবের ডাকে আসছে
স্বাধীনতা চাই, প্রতিরোধ গড়ে ঐক্য
তুমি জাগরণ, তুমি স্বজাতির বন্ধু।

তোমাকে দেখেছি মানবিক, দ্রোহী, সাহসী
তুমি বাংলার তর্জনী উঁচু মহিমা
তুমি ডাক দিলে দেশ হয়ে যায় জনতা
মানুষেরা জাগে, আঁধারবিনাশী যুদ্ধে।

শৃঙ্খল থেকে মুক্তির তুমি দিশারি
ভাটিয়ালি গানে হাওয়া লাগা পালে আগামী
মধুমতী থেকে পদ্মার জলে, ভাসানে
তুমি জেগে আছো নদীমাতৃক চরণে।

আমারও কবিতা নিবেদন করি তোমাকে
তোমার মৃত্যু কোথাও যে দেখি না আমরা
অশ্রু ও শোক, রক্তের স্রোত পেরিয়ে
কোটি মানুষের অনুভবে আছো জীবিত।

কবিদের কবি তুমি

মিনার মনসুর

কত কবি হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব আর
কত যে কবিতা তারা লেখে–কী বিচিত্র তার ভাষা ও সংকেত!
মাটির এমন গুণ এখানে সবাই কবি; যদি
বিশ্বাস না হয় তবে বৃক্ষকে শুধাও। এই দেশে
গাছেরা কবিতা লেখে বীজের ভাষায়; মাছ লেখে
জলকাব্য–ভাষা তার অন্যদের বোধের অতীত।
যে-নাঙ্গা সন্ন্যাসী আজও দীপ্র রয়েছেন বসে সম্রাট মোর্যের
দরবার আলো করে তিনিও মহান কবি এক এ-বঙ্গের।
আর বিক্রমপুরের ওই যে শ্রমণ ভিক্ষাপাত্র হাতে নগ্ন পায়ে যিনি
অবিরাম চলেছেন ছুটে কালের প্রাচীর ভেঙে
দুর্গম পাহাড়ও আজ জপ করে অবিনাশী পঙক্তিমালা তার।

পকেট গড়ের মাঠ দীর্ণ বুক–হাতে হাতে পরশপাথর
লালন হাছন রবি–নিমগ্ন থাকুন তাঁরা নিজস্ব মোকামে
জীবনানন্দ দুদণ্ড শান্তি পাক বীরবাহু নির্মলার ধূসর আশ্রমে!
ঋতুরাজ বসন্তকে দেখো কী চমৎকার লিখে যাচ্ছে কবিতা নিভৃতে
কী যে তার রূপছটা রঙের বাহার!
বৃক্ষদের পাখিদের ফুলেদের মুখে মুখে মুহূর্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে
তার অলৌকিক আভা! আর দেখো ধ্যানমগ্ন ভোরের আকাশ
বাতাসে বাতাসে গীত হচ্ছে তার কবিতার অপূর্ব সুঘ্রাণ
অথচ কোথাও কোনো কোলাহল নেই।

তেরশত নদ-নদী জন্মাবধি নিরন্তর লিখে যাচ্ছে অজস্র কবিতা;
তারাই তো আদি কবি এ বাংলার! শুনে তুমি হাসো–
হাসবেই তো! পঞ্চাশেই তুমি হট্টগোল বিশ্বজুড়ে–
শতবর্ষে কি-না জানি হয়! নদী তবু নির্বিকার
বাংলার বিস্তৃত শস্যখেতজুড়ে তার কবিতার খাতাখানি
ভরে আছে বহুবর্ণ কবিতা ফসলে। আর ঐ যে মানুষটি
তুমি যাকে গেঁয়ো চাষা বলে ডাকো–চর্যার চেয়েও

আদিতম তার কাব্যকীর্তি। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের দরবারে
যে-বস্ত্র বইয়ে দিত মহার্ঘ উল্লাস তারও নির্মাতা
বাংলার অখ্যাত কোনো কবি।

ছবি, হায়, শুধু ছবি! অপ্রাপ্তির দীর্ঘশ্বাসে ভরা
যত অধরা মাধুরী! জল-হাওয়া-মাটির এত যে সাধনা
হাজার বছর ধরে ব্যর্থ অপেক্ষার এত যে প্রহর গোনা
এত যে মায়ের অশ্রু এত বীরের শোণিতধারা
সবই কি বিফলে যাবে তবে?–ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ
শুধান সক্রোধে; ঠিক তখনই সমুদ্রের বিপুল গর্জনে
তখনই অলৌকিক এক অঙ্গুলি হেলনে
লেখা হয়ে যায় সেই অমর কবিতাখানি আর অন্তহীন
রাত্রির তপস্যা শেষে রবিকরোজ্জ্বল দিন সসম্ভ্রমে বলে :
কবিদের কবি তুমি–বঙ্গপিতা–তোমাকে প্রণাম।

আলোকচিত্রে মহামানবের মহাজীবন

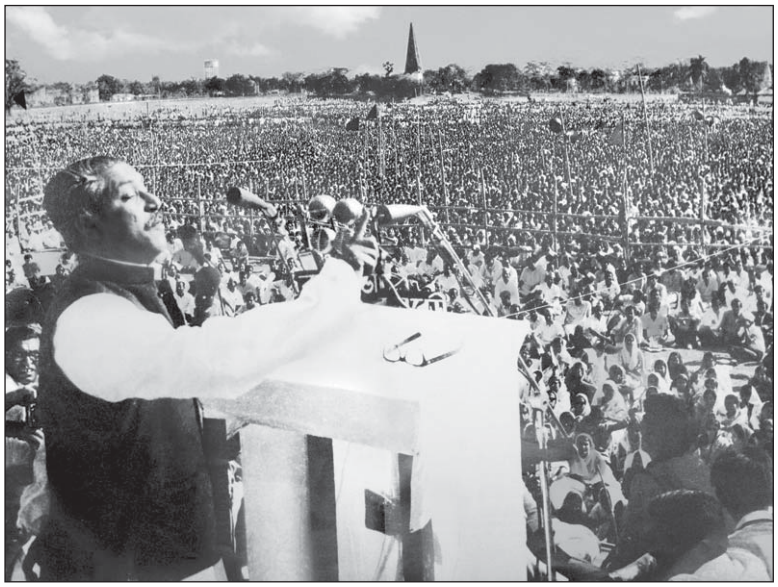

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

‘উন্নত মম শির’

ফটো সাংবাদিকদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মানিক মিয়া, তাজউদ্দীন আহমদ ও সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন

৮ জানুয়ারি ১৯৭২ : পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তির পর দেশে ফেরার পথে লন্ডনে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলছেন

২৩ মার্চ ১৯৭১ : সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু। পাশে তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ : প্রভাতফেরিতে শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৫৪ : রাজশাহী সফরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

১৯৬২ : পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের 'এবডো' (দি ইলেকটিভ বডিজ ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার) জারির প্রতিবাদে আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করছেন বঙ্গবন্ধু

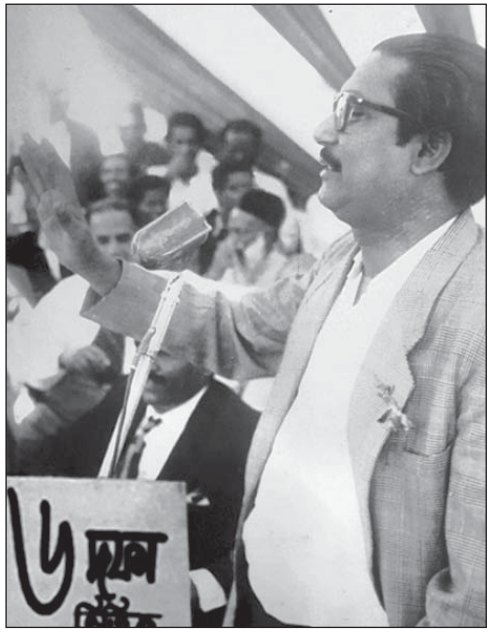

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ : লাহোরে ছয় দফার ঘোষণা দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জানুয়ারি ১৯৬৯ : জেলখানা থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইব্যুনালে নিয়ে যাওয়ার পথে

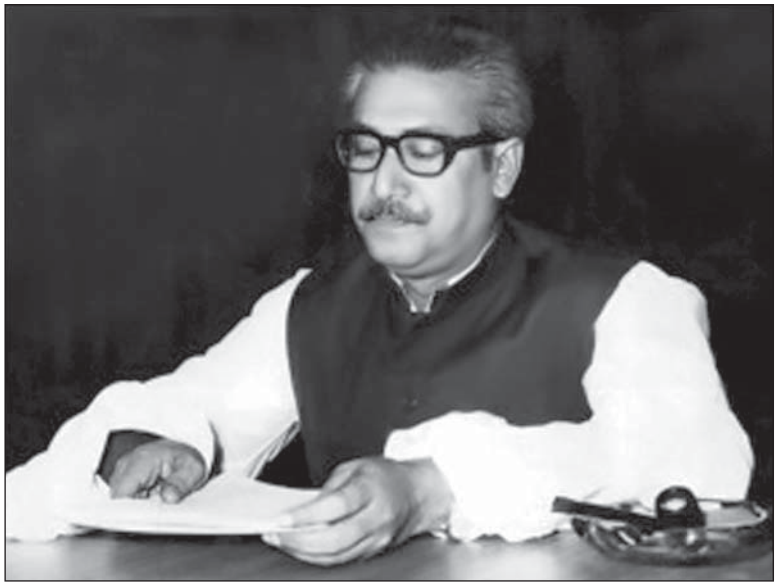

১৯৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু রেডিও ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন

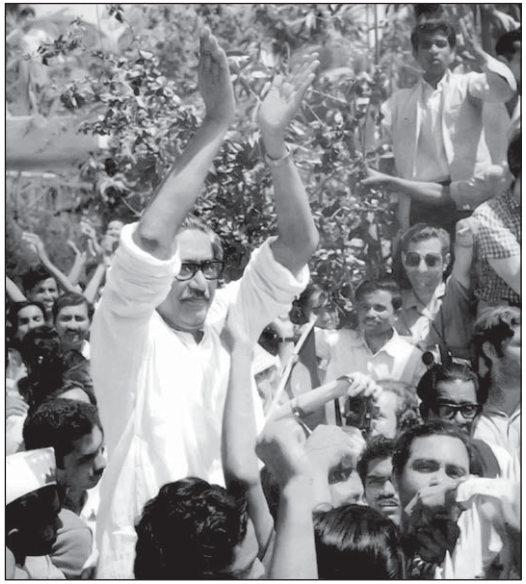

১৯৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনতার উদ্দেশে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে

নিজ পাঠাগারে অধ্যয়নরত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

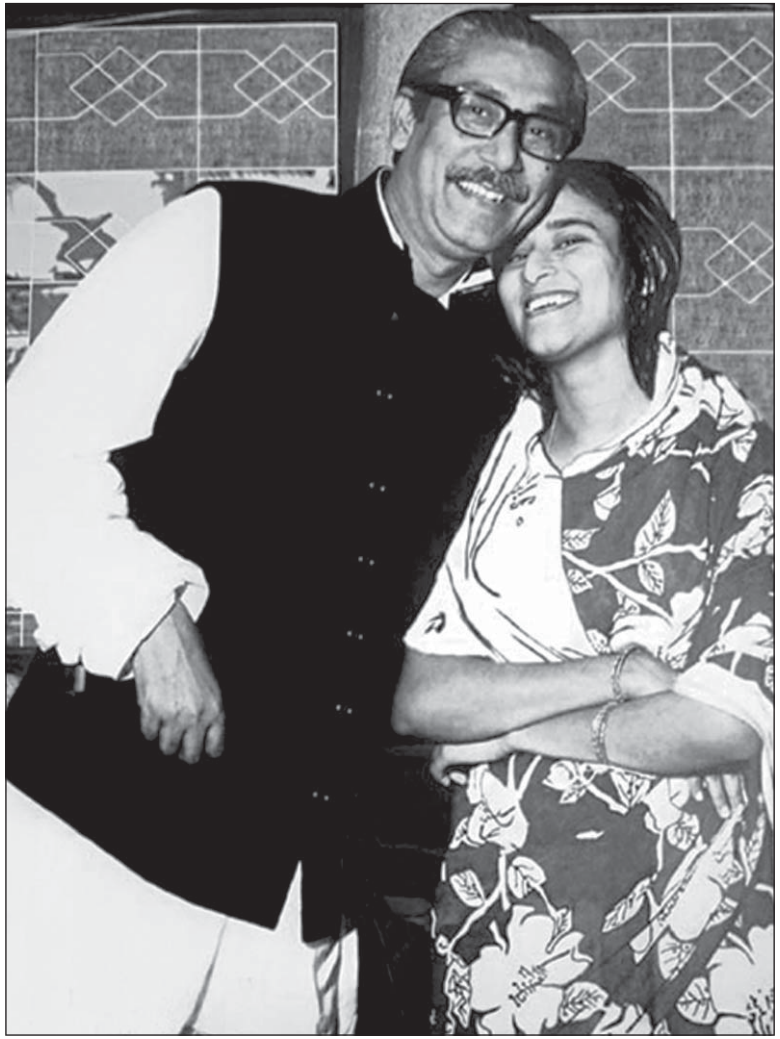

পিতা ও কন্যা : সোনার বাংলার সারথি

সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

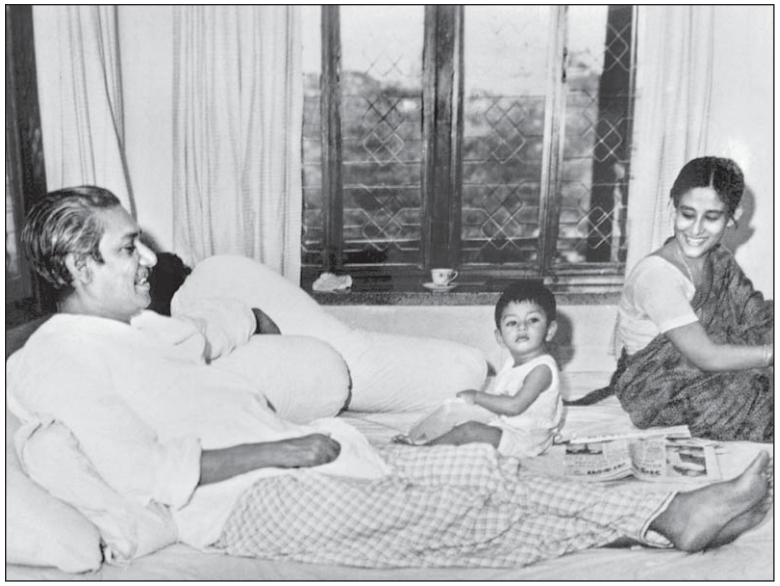

স্নিগ্ধতা : ধানমণ্ডির বাড়িতে বঙ্গবন্ধু সাহচর্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা ও নাতি সজীব ওয়াজেদ জয়

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ : স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাবর্তন

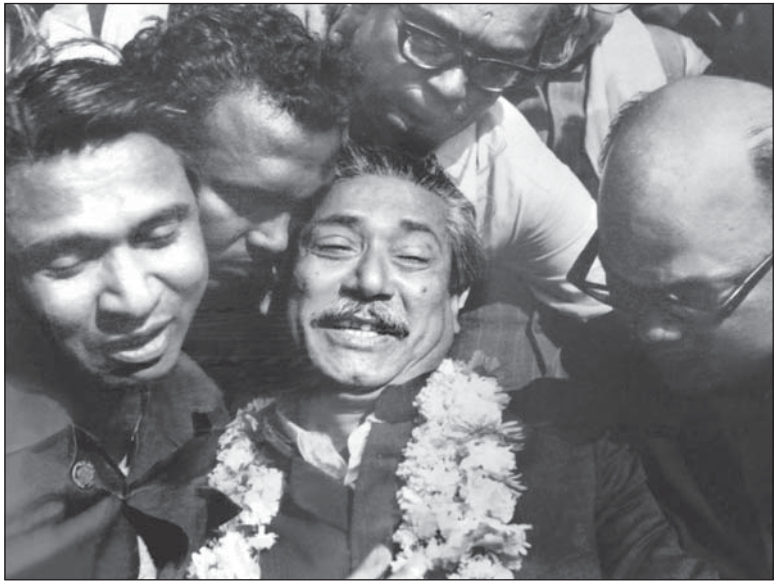

১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ : বন্দিদশা থেকে ফিরে জনতার মাঝে প্রিয় নেতা

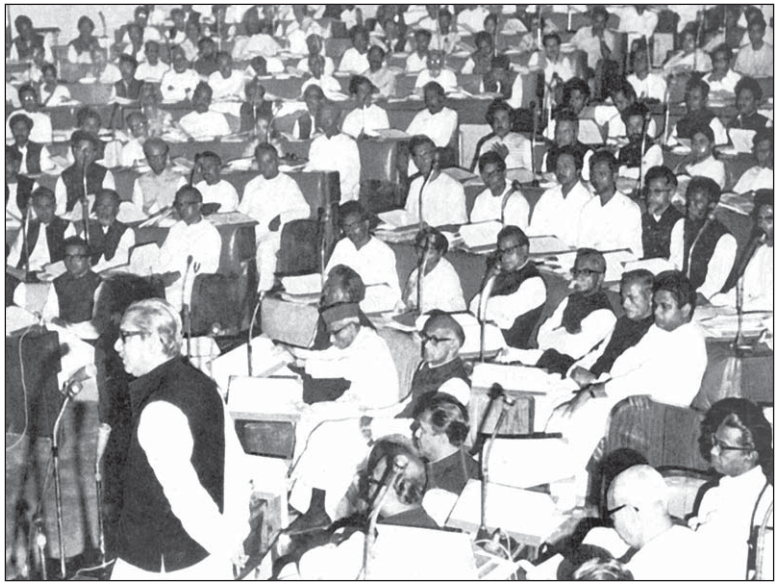

১৯৭৩ : জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ : নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু

১৭ মার্চ, ১৯৭৫ : জন্মদিনে বঙ্গবন্ধুকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

২৭ নভেম্বর, ১৯৭২ : জাতিসংঘ মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের সঙ্গে আলাপরত বঙ্গবন্ধু

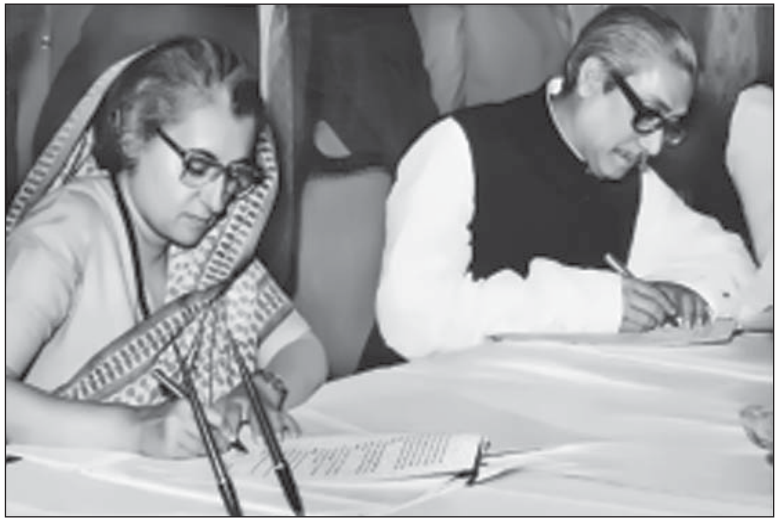

১৯ মার্চ ১৯৭২ : ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

৩ মার্চ, ১৯৭২ : মস্কো সফরকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ব্রেজনেভ বঙ্গবন্ধুকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ : চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই -এর ঢাকা সফরকালে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে স্বাগত বক্তব্য রাখছেন। পাশে রয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

২৩ মে ১৯৭৩ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জুলিও কুরি পদক পরিয়ে দিচ্ছেন বিশ্বশান্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রমেশ চন্দ্র

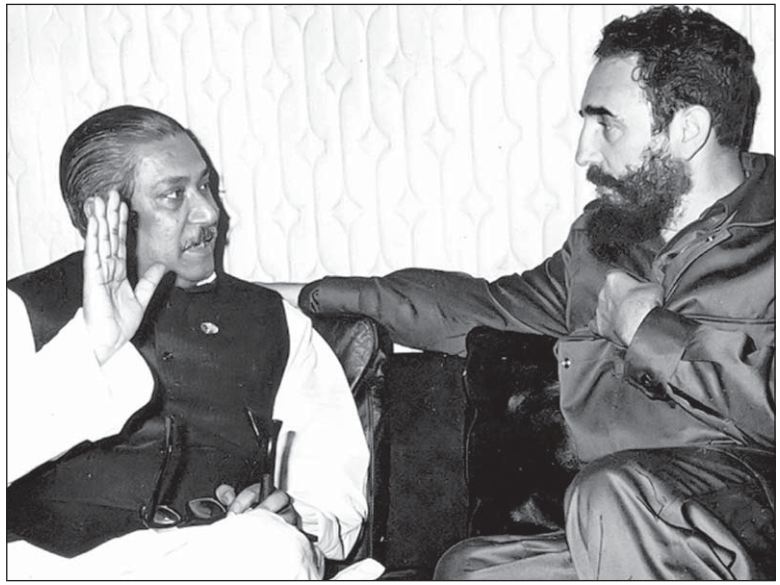

সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ : আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সাথে বঙ্গবন্ধু

১ অক্টোবর ১৯৭৪ : হোয়াইট হাউসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ : আলজেরিয়ায় জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে সৌদি বাদশাহ ফয়সালের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই সাক্ষাৎ থেকেই বাংলাদেশিদের পবিত্র হজ পালনের সুযোগ প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হয়